

সূরা ৫ : মায়িদাহ, মাদানী

৫ - سُورَةُ الْمَائِدَةِ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত : ১২০, রুকু' : ১৬)

(آيَاتُهَا : ١٢٠. رُكُوعَاتُهَا : ١٦)

সূরা মায়িদাহ নাখিল হওয়া এবং এর গুরুত্ব

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ সূরাগুলির মধ্যে সূরা ‘মায়িদাহ’ ও সূরা ‘আল-ফাতহ’ সর্বশেষ সূরা। (তিরমিযী ৮/৪৩৬) এরপর ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী এটি গারীব’ ও ‘হাসান’ হাদীস। তিনি ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে আরও বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা হল :

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। (সূরা নাসর, ১১০ : ১) (তিরমিযী ৮/৪৩৭)

হাকিম তাঁর ‘মুসতাদরাক’ গ্রন্থে তিরমিযীর (রহঃ) বর্ণনার ন্যায় আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাবের (রহঃ) সনদের মাধ্যমে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এটি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক আরোপিত শর্তানুযায়ী একটি সহীহ হাদীস। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) কেহই এ হাদীসটিকে তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩১১) হাকিম আরও বর্ণনা করেন যে, যুবাইর ইব্ন নুফাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : আমি একদা হাজ্জে গমন করি। এরপর আমি আযিশার (রাঃ) সাথে দেখা করি। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন : ‘হে যুবাইর! তুমি কি সূরা মায়িদাহ পড়?’ আমি উত্তরে বললাম : হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : ‘এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ শেষ সূরা। সুতরাং তোমরা এর মাধ্যমে যেসব বিষয় বৈধ হিসাবে পাও সেগুলিকে বৈধ হিসাবে গ্রহণ কর। আর যেগুলোকে অবৈধ হিসাবে পাও সেগুলোকে অবৈধ হিসাবে গ্রহণ কর।’ অতঃপর হাকিম এ হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এটি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক আরোপিত শর্তানুযায়ী একটি সহীহ হাদীস। কিন্তু হাদীসটিকে তারা তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩১১)

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ) আবদুর রাহমান ইব্ন মাহদীর (রহঃ) সনদের মাধ্যমে মুআবিয়া ইব্ন সালেহ (রহঃ) হতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং আরও কিছু বেশি অংশ যোগ করেন। ঐ বেশি অংশটুকু নিম্নরূপ :

যুবাইর ইব্ন নুফাইর (রাঃ) বলেন : ‘আমি আয়িশাকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল/আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি বলেন যে, পবিত্র কুরআনই তাঁর আচরণ।’ ইমাম নাসাঈও (রহঃ) এ হাদীসটিকে আবদুর রাহমান ইব্ন মাহদীর সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৬/১৮৮, নাসাঈ ১১১৩৮)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
১। হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের ওয়াদাগুলি পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। তবে যেগুলি হারাম হওয়া সম্পর্কে তোমাদের উপর পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলি এবং ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তোমাদের শিকার করা জন্তুগুলি হালাল নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হুকুম করে থাকেন।	۱. يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱللَّأْنَعَمِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَخِمَ مَا يُرِيدُ
২। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী, নিষিদ্ধ মাসগুলি, কুরবানীর পশুগুলির গলায় ব্যবহৃত চিহ্নগুলি এবং যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ পাবার জন্য সম্মানিত	۲. يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرِ ٱللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدَىٰ وَلَا ٱلْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِينَ

ঘরে যাবার ইচ্ছা করে তাদের অবমাননা করা বৈধ মনে করনা। আর তোমরা যখন ইহ্রাম থেকে মুক্ত হও তখন শিকার কর। যারা তোমাদেরকে পবিত্র মাসজিদে যেতে বাঁধা দিয়েছে সেই সম্প্রদায়ের দুশমনি যেন তোমাদেরকে সীমা ছাড়িয়ে যেতে উৎসাহিত না করে। সৎ কাজ করতে ও সংযমী হতে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর। তবে পাপ ও শত্রুতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করনা। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা।

الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) হতে বর্ণিত, একটি লোক আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) নিকট আগমন করেন এবং তাকে কিছু উপদেশ দিতে অনুরোধ করেন। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন : ‘যখন তুমি يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا কথাটি শ্রবণ কর তখন তার জন্য তোমার কানকে সতর্ক করে দিও। কারণ হয়তো তা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদেরকে কোন ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করছেন।’ আবার যুহরী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন আল্লাহ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে কোন কাজের নির্দেশ দেন তখন তোমরা ঐ কাজ কর। কারণ উক্ত সম্বোধনের মধ্যে যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও আছেন। আবার খাইসুমা (রহঃ) হতে

বর্ণিত আছে যে, পবিত্র কুরআনে যে অবস্থায় **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** বলে সম্বোধন করা হয়েছে সেই অবস্থায় পবিত্র তাওরাত গ্রন্থে **يَا أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ** ‘ওহে যাদের প্রয়োজন রয়েছে’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ তাফসীরকারক এ অংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন **عُقُودٌ** শব্দের দ্বারা অঙ্গীকার/চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪৫০) ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে **عُقُودٌ** এর অর্থের ব্যাপারে তাফসীরকারকগণ একমত। তিনি বলেন যে, কোন কিছুর ব্যাপারে পরস্পরের শপথ বা অঙ্গীকারকে **عُقُودٌ** বলা হয়ে থাকে। (তাবারী ৯/৪৪৯) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, **عُقُودٌ** এর দ্বারা **عُهُودٌ** বা অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা যেসব বিষয় বৈধ ও অবৈধ ঘোষণা করেছেন, যেসব বিষয় অবশ্যকরণীয় করেছেন এবং যেসব বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে **وَلَا تَفْوَزُوا وَلَا تَنْكُثُوا** বলে সাবধান করেছেন, **عُهُودٌ** দ্বারা সেসব বিষয়কে বুঝানো হয়েছে। এরপর আল্লাহ এ সম্পর্কে আরও কঠোর ভাষায় বলেন :

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত এবং আছে মন্দ আবাস। (সূরা রা‘দ, ১৩ : ২৫) (তাবারী ৯/৪৫২)

যাহহাক (রহঃ) **أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা যেসব বিষয় বৈধ ও অবৈধ করেছেন এবং তাঁর কিতাব ও নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের নিকট হতে তিনি

বৈধ ও অবৈধ সংক্রান্ত বিভিন্ন আবশ্যকীয় যে কাজগুলি করার ওয়াদা নিয়েছেন
عُقُودٌ দ্বারা সেগুলিকে বুঝায়।

হালাল ও হারাম জাতীয় পশুর বর্ণনা

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারক বলেন যে, চতুষ্পদ জন্তু বলতে এখানে উট, গরু ও বকরীকে বুঝানো হয়েছে। হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকের এটাই মত। (তাবারী ৯/৪৫৫) ইবন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আরাবদের ভাষা অনুযায়ী চতুষ্পদ জন্তু বলতে এটাই বুঝানো হয়। ইবন উমার (রাঃ), ইবন আব্বাস (রাঃ) এবং আরও অনেকে এ আয়াত হতে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, যবাহকৃত গাভীর পেটে যদি মৃত বাচ্চা পাওয়া যায় তাহলে ঐ মৃত বাচ্চার গোশত খাওয়া যাবে। (তাবারী ৯/৪৫৬) এ প্রসঙ্গে হাদীসের সুনান গ্রন্থসমূহে বহু হাদীস এসেছে। যেমন আবু দাউদ (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ) এবং ইবন মাজাহ (রহঃ) আবু সাঈদ (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম : আমরা উট, গাভী এবং বকরী যবাহ করি। ওগুলির পেটের মধ্যে কখনও কখনও বাচ্চা পাই। আমরা কি তা ফেলে দিব, নাকি আহার করব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

‘তোমরা ইচ্ছা করলে তা খেতে পার। কেননা তার মাকে যবাহ করাই হচ্ছে তাকেও যবাহ করা।’ (আবু দাউদ ৩/২৫২, তিরমিযী ৫/৪৮, ইবন মাজাহ ২/১০৬৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী এটি একটি ‘হাসান’ হাদীস।

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) যাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মাকে যবাহ করাই হচ্ছে বাচ্চাকেও যবাহ করা।’ এ হাদীসটিকে ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) একাই তার হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (আবু দাউদ ৩/২৫৩)

إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ এ আলী ইবন আবী তালহা ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে আলী ইবন আবী তালহা ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এর দ্বারা মৃত পশু, রক্ত এবং শূকরের মাংসকে বুঝানো হয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মৃত পশু এবং যে পশুকে যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহই এর সঠিক অর্থ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত। তবে প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, এর দ্বারা

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (৫ : ৩) এ আয়াতের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ‘তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত পশু, রক্ত, শূকরের মাংস। (তাবারী ৯/৪৫৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ ছাড়া রয়েছে আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু এবং মৃত পশু। (তাবারী ৯/৪৫৮) তবে আল্লাহ তা‘আলাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার মালিক।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ তোমাদের জন্য মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু, কঠরোধে মারা পশু, আঘাত লেগে মরে যাওয়া পশু, পতনের ফলে মৃত পশু, শৃংগাঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু হারাম করা হয়েছে। যদিও এগুলো চতুষ্পদ জন্তুর অন্তর্ভুক্ত তবুও উল্লিখিত কারণে সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। এ জন্য আল্লাহ বলেন : إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ তোমরা যেগুলিকে যবাহ দ্বারা পবিত্র করেছ সেগুলি হালাল এবং যেগুলোকে মূর্তিপূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়েছে সেগুলো হারাম।’ অর্থাৎ উক্ত পশুগুলোকে এজন্য হারাম করা হয়েছে যে, তাদেরকে আর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবেনা এবং হালাল পশুর সাথে আর যুক্ত করা যাবেনা। আর এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

أَحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুকে হালাল করা হয়েছে। তবে যেগুলো হারাম হওয়া সম্পর্কে তোমাদের উপর কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলো হারাম।

غَيْرِ مُحْلِيِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ কোন কোন জ্ঞানীজনের মতে ‘আন’আম’ বলতে উট, গরু, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু এবং হরিণ, গাভী, গাধা প্রভৃতি বন্য পশুকে বুঝানো হয়। আর গৃহপালিত হালাল পশুগুলির মধ্যে উক্ত পশুগুলিকে এবং বন্য হালাল পশুগুলির মধ্য হতে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা পশুগুলোকে হারাম বলে পৃথক করা হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে : আমি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুকে হালাল করেছি, তবে জন্তুগুলো হতে যেগুলোকে হারাম বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে সেগুলো হালাল নয়।

আর এ নির্দেশ ঐ ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য যে ইহরাম অবস্থায় শিকার করাকে হারাম বলে গ্রহণ করেছে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন :

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

কিন্তু যদি কোন লোক স্বাদ আশ্বাদন ও সীমা লংঘনের উদ্দেশ্যে ব্যতীত নিরুপায় হয়ে পড়ে (তার পক্ষে ওটাও খাওয়া বৈধ)। কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৪৫) অর্থাৎ উক্ত আয়াতের ন্যায় এখানেও আল্লাহ বলেন : আমি যেভাবে অন্যান্য সময়ের জন্য চতুষ্পদ জন্তুকে হালাল করেছি, ঠিক সেইভাবে ইহরাম অবস্থায় হালাল জন্তুকে শিকার করা হারাম মনে করবে। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই এ নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি যা করা বা না করার নির্দেশ দেন সেগুলির সবকিছুই হিকমাতে পরিপূর্ণ। এ জন্যই তিনি বলছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামত হুকুম করেন।

হারাম মাস ও হারাম এলাকার মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ
শব্দের দ্বারা হাজ্জের নিদর্শনাবলীকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪৬৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা সাফা, মারওয়া, কুরবানীর পশু ও উটকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪৬৩) কেহ কেহ বলেছেন যে, এর দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে সমস্ত বস্তুকে হারাম করেছেন সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ কর্তৃক হারাম ঘোষিত বিষয়গুলোকে অমান্য করনা। এ জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : 'নিষিদ্ধ মাসগুলিকেও তোমরা অবমাননা করনা।' وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ অর্থাৎ মাসগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং তোমরা এ মাসে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার মত নিষিদ্ধ কাজগুলো পরিহার কর। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু অন্যত্র বলেন :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ

তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল : ওর মধ্যে যুদ্ধ করা অতীব অন্যায়। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২১৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র আরও বলেন :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে মাস গণনায় বারটি। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৩৬) সহীহ বুখারীতে আবু বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেছিলেন : ‘আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার দিন আল্লাহ যামানাকে যে রূপ সৃষ্টি করেছিলেন এখন তা সেরূপে ফিরে এসেছে। ১২ মাসে একটি বছর হয়। এর মধ্যে ৪টি মাস নিষিদ্ধ। তার মধ্যে ৩টি মাস পরস্পর সংযুক্ত। যেমন যুলকাদা, যিলহাজ্জ এবং মুহাররাম। আর অন্যটি হল মুযার গোত্র কর্তৃক কথিত রজব মাস। এ মাসটি জমাদিউসসানী এবং শা‘বান মাসের মাঝে অবস্থিত।’ (ফাতহুল বারী ১০/১০) এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ মাসগুলির এ জাতীয় সম্মান কিয়ামাত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

পবিত্র কা‘বা ঘরে কুরবানীর পশু (হাদী) বহন করা

وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلَانِدَ অর্থাৎ তোমরা কা‘বা গৃহের দিকে কুরবানীর পশু পাঠানো হতে বিরত থেকনা। কারণ এতে আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রকাশ পায়। আর তোমরা কুরবানীর পশুর গলায় কালাদা (মালা) পরানো হতে বিরত থেকনা। কারণ এর দ্বারা এ পশুগুলোকে অন্যান্য পশু হতে পৃথক করা হয়। আর এর দ্বারা এটাও প্রকাশ পায় যে, পশুগুলো কুরবানীর উদ্দেশে কা‘বা গৃহে পাঠানো হয়েছে। ফলে মানুষ এ পশুগুলোর ক্ষতি করা হতে বিরত থাকে। আর পশুগুলোকে দেখে অন্যান্য লোকেরা এ জাতীয় পশু কুরবানীর জন্য পাঠাতে উদ্বুদ্ধ হবে। আর যে ব্যক্তি অন্যকে কুরবানী করার প্রতি উৎসাহ দান করে, তাকে তার অনুসরণকারীর অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হয়, অথচ অনুসরণকারীর পুরস্কার কোন অংশেই কম করা হয়না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিদায় হাজ্জের সময় যুলহুলাইফায় রাত্রি যাপন করেন। এ যুলহুলাইফাকে ওয়াদি আল-আকীকও বলা হয়। অতঃপর তিনি সকাল বেলা তাঁর ৯ জন স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেন। গোসল শেষে খোশবু ব্যবহার করেন ও দু‘রাকআত নফল সালাত আদায় করেন। অতঃপর কুরবানীর পশুগুলিকে মালা পরিধান করান। এরপর হাজ্জ এবং উমরার জন্য উচ্চৈঃস্বরে নিয়াত করেন। তাঁর কুরবানীর উটের সংখ্যা ছিল ষাটটির অধিক। তাদের গায়ের রং ও শারীরিক গঠন ছিল অতি উত্তম। যেমন আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন :

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ شَعِيرَةَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

এটাই আল্লাহর বিধান এবং কেহ (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩২)

মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন : وَلَا الْقَلَائِدَ দ্বারা জাহেলী যুগের লোকদের মত পবিত্রতা নষ্ট করনা বলা হয়েছে। কারণ জাহেলী যুগে হারামের বাইরে বসবাসকারী আরাবরা যখন নিষিদ্ধ মাস ব্যতীত অন্য মাসে তাদের গৃহ হতে বের হত তখন তাদের গলায় পশুর পশম বা চুলসহ চামড়ার মালা ব্যবহার করত। আর হারাম এলাকার মুশরিক অধিবাসীরা যখন তাদের গৃহ হতে বের হত তখন তারা তাদের গলায় হারাম এলাকার গাছের ছাল দিয়ে তৈরী করা মালা ব্যবহার করত। এর ফলে লোকেরা তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করত। এ বর্ণনাটি ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) সংগ্রহ করেছেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, সূরা মায়িদাহর দু'টি আয়াত মানসুখ হয়ে গেছে। একটি কালাদার আয়াত, আর অপরটি হচ্ছে فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ (৫ : ৪২) এ আয়াতটি। (তাবারী ১০/৩৩২)

পবিত্র কা'বা ঘর যিয়ারাত করতে ইচ্ছুকদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা

এ অংশের وَلَا آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرَضَوْنَا ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন যে, আল্লাহর ঘরের উদ্দেশে যারা রওয়ানা হয় তাদের সাথে যুদ্ধ করা হালাল মনে করনা। কারণ ঐ ঘরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করে সে শত্রু হতে নিরাপত্তা লাভ করে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে বের হয়, তোমরা তাকে বাধা দিওনা, বিরত রেখনা এবং ভয়-ভীতি প্রদর্শন করনা কিংবা কোন প্রকার কুৎসা রটনা করনা। মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, يَتَتَوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ এর অর্থ হচ্ছে ব্যবসা। কাতাদাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ) প্রমুখ মুফাস্সিরদের মতে আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণের অর্থ ব্যবসা করা। (তাবারী ৯/৪৮০, ৪৮১) পবিত্র কুরআনের পূর্ববর্তী আয়াত : لَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ (২ : ১৯৮) দ্বারাও ব্যবসাকে বুঝানো

হয়েছে। আর رِضْوَانًا শব্দের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হাজ্জে গমনকারী ব্যক্তিগণ হাজ্জের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে থাকেন। ইকরিমাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ), ইব্ন জারীর (রহঃ) প্রমুখ তাফসীরকারকগণ বলেন যে, এ আয়াতটি হুতাম ইব্ন হিন্দ আল বাকরীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। একদা সে মাদীনার একটি চারণভূমি লুণ্ঠন করে এবং পরবর্তী বছর সে বাইতুল্লাহ জিয়ারাতের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। এ সময় কোন কোন সাহাবী পথিমধ্যে তাকে বাধা দেয়ার মনস্থ করলে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। (তাবারী ৯/৪৭২, ৪৭৫)

ইহরাম ত্যাগ করার পর শিকার করা যাবে

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন যে,

যখন তোমরা তোমাদের ইহরাম খুলে ফেল এবং হালাল হয়ে যাও তখন তোমাদের জন্য পূর্বে ইহরাম অবস্থায় যা হারাম ছিল এখন তা হালাল করা হল। অর্থাৎ এখন শিকার করা হালাল। হালাল হওয়ার এ নির্দেশটি অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পর আবার বৈধ ঘোষিত হয়েছে। আর এ ব্যাপারে সঠিক মত এই যে, কোন কিছু অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পর বৈধ ঘোষিত হলে তা অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বাবস্থা (বৈধতা) ফিরে পাবে। সুতরাং পূর্বে যা ওয়াজিব ছিল পরে তা ওয়াজিব হবে, মুস্তাহাব মুস্তাহাব হবে এবং মুবাহ মুবাহ হবে। কারও মতে নির্দেশটি শুধু ওয়াজিবের জন্য এবং কারও মতে শুধু মুবাহ কাজের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এ উভয় মতেরই বিপক্ষে পবিত্র কুরআনে যথেষ্ট আয়াত রয়েছে। সুতরাং আমরা যা বর্ণনা করেছি সেটাই সঠিক মত। আর এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

সব সময়ের জন্য ন্যায় বিচার অপরিহার্য

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا

তাফসীরকারকগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : যে জাতি তোমাদেরকে হৃদয়বিয়ার বছর কা'বা গৃহে যেতে বাধা দিয়েছিল, তোমরা তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে আল্লাহর হুকুম লংঘন করনা, বরং

আল্লাহ তোমাদেরকে যেভাবে প্রত্যেকের সাথে ন্যায় বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন কর। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও এ অর্থ বহন করে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ اَلَّا تَعْدِلُوْا۟ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی

কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার করবেনা। তোমরা ন্যায় বিচার কর, এটা আল্লাহ-ভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৮) অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ের হিংসা-বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ন্যায় বিচার না করতে উৎসাহিত না করে। কারণ এই যে, ন্যায় বিচার করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব, ওটা যে কোন অবস্থায়ই প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ যখন মুশরিকদের দ্বারা কা'বাঘরে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হুদাইবিয়া প্রান্তরে কষ্টকর অবস্থায় কালাতিপাত করছিলেন তখন পূর্বাঞ্চলীয় একদল মুশরিক কা'বা ঘর জিয়ারাতের উদ্দেশে তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন : 'আমরা এ লোকগুলোকে কা'বা গৃহে যেতে বাধা দিব যেমন তাদের সাথীরা আমাদেরকে বাধা দিয়েছে।' তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। এখানে شَنَاٰن শব্দ দ্বারা শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪৭৮) এটাই ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যদের অভিমত।

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ এ আয়াতের দ্বারা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে উত্তম কাজে পরস্পরকে সাহায্য করতে এবং খারাপ কাজ পরিহার করে নৈকট্য ও পরহেয়গারী অর্জন করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি তাদেরকে শারীয়াত পরিপন্থী কাজ, পাপকাজ এবং অবৈধ কাজে পরস্পরকে সাহায্য করতে নিষেধ করছেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ যে কাজ করতে আদেশ করেছেন তা পরিহার করাকেই পাপকাজ বলা হয় এবং عُدْوَان বা সীমালংঘন করার দ্বারা ধৈর্যের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করা এবং নিজের ও অন্যের ব্যাপারে অবশ্য করণীয় কাজের সীমালংঘন করাকেই বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪৯০) ইমাম আহমাদ

ইব্ন হাম্বাল (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর যদিও সে অত্যাচারী বা অত্যাচারিত হয়।’ তখন কোন কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অত্যাচারিত ভাইকে সাহায্য করার অর্থ তো আমরা বুঝলাম, কিন্তু অত্যাচারী ভাইকে কি করে আমরা সাহায্য করব?’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

‘তুমি তাকে অত্যাচার করা হতে বাধা প্রদান কর ও নিষেধ কর। আর এটাই তাকে সাহায্য করা হবে।’ (আহমাদ ৩/৯৯) ইমাম বুখারীও (রহঃ) এ হাদীসটি হুসাইম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৫/১১৭) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (রহঃ) একজন সাহাবী হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ঈমানদার ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করে সেই ব্যক্তি ঐ ঈমানদার ব্যক্তি হতে অধিক প্রতিদান পাবে যে মানুষের সাথে মেলামেশা করেনা এবং তাদের দেয়া কষ্টও সহ্য করেনা। (আহমাদ ৫/৩৬৫)

একটি সহীহ হাদীসে আছে : ‘যে ব্যক্তি মানুষকে সৎপথে আহ্বান করে, তাকে কিয়ামাত পর্যন্ত ঐ সৎপথ যত ব্যক্তি অনুসরণ করবে তাদের সকলের প্রতিদানের অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হবে। অথচ এ ব্যাপারে সৎপথ অনুসরণকারীদের প্রতিদান কমানো হবেনা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষকে অসৎ পথে আহ্বান করে, তাকে কিয়ামাত পর্যন্ত ঐ অসৎ পথ যত লোক অনুসরণ করবে তাদের সকলের পাপের অনুরূপ পাপ প্রদান করা হবে। অথচ এ ব্যাপারে অসৎ পথ অনুসরণকারীদের পাপ কোন অংশে কমানো হবেনা।’ (মুসলিম ৪/২০৬০)

৩। তোমাদের জন্য মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু, কষ্টরোধে মারা পশু, আঘাত লেগে মরে যাওয়া পশু, পতনের ফলে মৃত পশু, শৃংগাঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু হারাম করা

۳. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَّ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْمَوْقُودَةُ

হয়েছে; তবে যা তোমরা যবাহ দ্বারা পবিত্র করেছ তা হালাল। আর যে সমস্ত পশুকে পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়েছে তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এসব কাজ পাপ। আজ কাফিরেরা তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করনা; শুধু আমাকেই ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম। তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় আহার করতে বাধ্য হলে সেগুলি খাওয়া তার জন্য হারাম হবেনা। কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

وَالنَّطِیْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ
إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فَسُقُ الْیَوْمَ
یَیْسَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ
دِینِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَآخْشَوْنَ الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دِینًا فَمَنْ أَضْطَرَّ فِی
مَخْصَصَةٍ غَیْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

যে সমস্ত প্রাণী খাদ্য হিসাবে নিষিদ্ধ

আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে যে সমস্ত বস্তু খাওয়া অবৈধ করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। মৃত ঐ জানোয়ারকে বলা হয়, যে জানোয়ার যবাহ অথবা শিকার ব্যতীত নিজেই মৃত্যুবরণ করে। মৃত পশু খাওয়া

এ জন্যই নিষিদ্ধ যে, মৃত প্রাণীর রক্ত শিরার ভিতর জমাট বেঁধে থাকার কারণে এটি স্বাস্থ্যগত কারণে খাওয়ার যোগ্য থাকেনা। তবে মৃত মাছ খাওয়া হালাল। কারণ মুয়াত্তা মালিক, মুসনাদ শাফিঈ, মুসনাদ আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজাহ, ইব্ন খুযাইমা এবং ইব্ন হিব্বানে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন তিনি বলেন যে, ওর পানি পবিত্র এবং ওর মধ্যের মৃত হালাল। (আবু দাউদ ১/৬৪, তিরমিযী ১/২২৪, নাসাঈ ১/৫০, ইব্ন মাজাহ ১/১৩৬, ইব্ন খুযাইমাহ ১/৫৯, ইব্ন হিব্বান ২/২৭২)

الْدَّم শব্দ দ্বারা প্রবাহিত রক্তকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্যত্র বলেন :

أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا

এবং প্রবাহিত রক্ত। (সূরা আন‘আম, ৬ : ১৪৫) এর দ্বারাও প্রবাহিত রক্তকে বুঝানো হয়েছে। এটাই ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও সাঈদ ইব্ন যুবাইরের (রহঃ) মত। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) প্লীহা ও কলিজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন : ‘তোমরা তা খাও।’ তখন লোকেরা বলল : ‘ওটা তো রক্ত।’ তিনি বললেন : ‘তোমাদের উপর শুধুমাত্র ঐ প্রবাহিত রক্তকেই হারাম করা হয়েছে যা ভিতরে রয়ে গেছে।’ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘শুধু প্রবাহিত রক্তকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।’ আবু আবদুল্লাহ ইব্ন ইদরীস আশ-শাফিঈ (রহঃ) ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘আমাদের জন্য দু’টি মৃত জন্তু ও দু’প্রকারের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জন্তু দু’টি হল মাছ ও ফড়িং এবং দু’প্রকার রক্ত হল কলিজা ও প্লীহা।’ (আহমাদ ২/৯৭) এ হাদীসটি মুসনাদ আহমাদ ছাড়াও দারাকুতনী এবং বাইহাকীতেও বর্ণনাকারী আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামের (রহঃ) মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ আবদুর রাহমান একজন দুর্বল রাবী। (হাদীস নং ৪/২৭২, ১/২৫৪)

وَلَحْمُ الْخَنَزِيرِ তাফসীরকারকগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, গৃহপালিত এবং বন্য শূকর উভয়ই হারাম। শূকরের মাংস বলতে চর্বি এবং ওর অন্যান্য অংশকে বুঝায়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, لَحْم শব্দের দ্বারা মাংসকে বুঝানো হয়।

সহীহ মুসলিমে বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি ‘নারদাছীর’ খেলায় (যে খেলায় গুটি ব্যবহার করা হয় এবং লেনদেনের বিষয় যুক্ত থাকে) অংশগ্রহণ করে সে যেন তার হস্তকে শূকরের গোশত ও তার রক্তে রঞ্জিত করল।’ (মুসলিম ৪/১৭৭০)

শূকরের মাংস কিংবা রক্ত স্পর্শ করাই যদি এতখানি ঘৃণিত হয় তাহলে উহা খাওয়া এবং অন্যকে খাওয়ানো আল্লাহর নিকট কতখানি ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় তা সহজেই অনুমেয়। এ হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে ‘লাহম’ অর্থ হল পশুর চর্বিসহ সমস্ত শরীর। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আরও উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা মদ, মৃত প্রাণী, শূকর এবং মূর্তির ব্যবসাকে হারাম করেছেন।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয় : মৃতের চর্বি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? কারণ মানুষ তা দ্বারা নৌকায় প্রলেপ দেয়, চামড়ায় মালিশ করে এবং প্রদীপ জ্বালায়। তিনি উত্তরে বললেন : ‘ওগুলোও হারাম।’ (ফাতহুল বারী ৪/৪৯৫, মুসলিম ৩/১২০৭) সহীহ বুখারীতে আবু সুফিয়ান (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা রোম সম্রাট আবু সুফিয়ানের নিকট জানতে চেয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কোন্ কোন্ বিষয়ে নিষেধ করেছেন? তদুত্তরে আবু সুফিয়ান বলেছিলেন : ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে মৃত প্রাণী ও রক্ত খেতে নিষেধ করেছেন।’

وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন যে, এর দ্বারা যে প্রাণী আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে যবাহ করা হয় তাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ আল্লাহ তাঁর সৃষ্টজীবকে তাঁর মহান নামের উপর যবাহ করা ওয়াজিব করেছেন। অতএব যখন তাঁর নির্দেশকে লংঘন করে মূর্তি বা অন্য কোন সৃষ্টজীবের নামে যবাহ করা হয় তখন তা হারাম হবে। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত।

وَالْمُنْحَنَةُ এ শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে যে জন্তুকে গলাটিপে মারা হয় অথবা যে জন্তু আকস্মিকভাবে দম বন্ধ হয়ে মারা যায় তাকে ^{مُنْحَنَةً} বলা হয়। যেমন কোন পশুকে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলে ছুটাছুটি করার ফলে গলায় দড়ির ফাঁস লেগে যদি দম বন্ধ হয়ে মারা যায় তাহলে তা খাওয়া হারাম।

আর **الْمَوْفُودَةُ** শব্দের দ্বারা ঐ মৃত জন্তুকে বুঝানো হয়েছে যাকে ভারী কোন কিছু দ্বারা আঘাত করে মারা হয়েছে। যেমন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে জন্তুকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে মারা হয় তাকে **مَوْفُودَةٌ** বলা হয়। (তাবারী ৯/৪৯৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, জাহেলী যুগের লোকেরা লাঠি দ্বারা আঘাত করার পর মারা গেলে তা আহার করত। (তাবারী ৯/৪৯৬) সহীহ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, আদি ইব্ন হাতিম (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি এক পার্শ্বে ধারাল এবং অপর পার্শ্বে ধারহীন এ জাতীয় এক প্রকার প্রশস্ত অস্ত্র দ্বারা শিকার করি। এ শিকার খাওয়া কি জাযিয়?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : ‘যদি ওটা ধারাল পার্শ্ব দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহলে তা খাওয়া জাযিয়। আর যদি ওটা ধারহীন অংশ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মারা যায় তাহলে তা অপবিত্র এবং তা খাওয়া জাযিয় নয়।’ (ফাতহুল বারী ৯/৫১৮) এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারহীন অস্ত্র এবং ধারাল অস্ত্রের দ্বারা শিকার করা জন্তুর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি ধারাল অংশের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত জন্তুকে খাওয়া জাযিয় করেছেন এবং ধারহীন অংশ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মৃত জন্তুকে খাওয়া নাজাযিয় করেছেন। ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ ব্যাপারে একমত। তবে যদি ক্ষত না করে শুধু অস্ত্রের অত্যধিক ওয়নের কারণে কোন জন্তু নিহত হয় তাহলে তা হারাম।

وَالْمُتَرَدِّيَّةُ ঐ মৃত জন্তুকে বলা হয় যা পাহাড় বা কোন উঁচু স্থান হতে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। এ ধরনের জন্তু খাওয়া হালাল নয়। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, **مُتَرَدِّيَّةُ** ঐ জন্তুকে বলা হয়, যে পতনের ফলে অথবা পাহাড় থেকে পড়ে মারা যায়। (তাবারী ৯/৪৯৮) কাতাদাহর (রহঃ) মতে এটা ঐ ধরনের জন্তু যা কূপে পড়ে মারা যায়। (তাবারী ৯/৪৯৮) সুদী (রহঃ) বলেন যে, যে জন্তু পাহাড় হতে পড়ে অথবা কূপে পড়ে মারা যায় তাকেই **مُتَرَدِّيَّةُ** বলা হয়। (তাবারী ৯/৪৯৮)

النَّطِيحَةُ ঐ জন্তুকে বলা হয় যা অন্য জন্তুর শিংয়ের আঘাতে মারা যায়। যদি ওটা শিং দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং তা হতে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং ঐ আঘাত যদি যবাহ করার স্থানেও লাগে তবুও ঐ ধরনের জন্তু খাওয়া হারাম।

وَمَا أَكَلَ السَّيْغُ এ অংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন যে, সিংহ, নেকড়ে বাঘ, চিতা বাঘ বা কুকুর যে জন্তুকে আক্রমণ করে এবং ওর কিছু অংশ খেয়ে ফেলার কারণে ওটা মারা যায় তা খাওয়া হারাম। যদিও আঘাতের কারণে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং উক্ত আঘাত জন্তু যবাহ করার স্থানে লাগে তবুও আলেমদের ইজমা অনুযায়ী উক্ত জন্তু খাওয়া হালাল নয়। যদি হিংস্র জন্তু ছাগল, উট, গরু বা এ জাতীয় কোন জন্তুকে মেরে কিছু অংশ খেয়ে ফেলতো তবুও অজ্ঞতার যুগের লোকেরা উক্ত জন্তুর বাকী অংশ খেতো। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিনদের জন্য ওটা হারাম করে দেন।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) **إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ** আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মন্তব্য করেছেন **إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ** অর্থ হল দম আটকিয়ে পড়া, প্রহারে আহত, পতনে ও শিং-এর আঘাতে এবং জন্তুর আক্রমণে মৃতপ্রায় জন্তুকে যদি জীবিতাবস্থায় পাওয়া যায় ও তাকে যবাহ করা যায় তাহলে তা খাওয়া হালাল। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৯/৫০৪) ইব্ন জারীর (রহঃ) আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যদি তোমরা প্রহারে, পতনে বা শিংয়ের আঘাতে মৃতপ্রায় জন্তুকে হাত বা পা নড়া-চড়া অবস্থায় পাও তাহলে ওকে যবাহ করে খাও। (তাবারী ৯/৫০৩) তাউস (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), উবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকের মতে, যদি যবাহ করার পর জন্তু তার কোন অংশকে নাড়ে এবং যবাহ করার পরও বুঝা যায় যে, ওর প্রাণ আছে তাহলে তা খাওয়া হালাল। (তাবারী ৯/৫০৪)

সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থেই রাফে ইব্ন খুদাইজ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : আমরা আশংকা করি যে, আগামীকাল শত্রুর সম্মুখীন হতে পারি। এমতাবস্থায় আমাদের সাথে যদি কোন ছুরি না থাকে তাহলে বাঁশের ধারাল অংশ দ্বারা আমরা যবাহ করতে পারব কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

‘যদি রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয় তাহলে তোমরা ঐ জন্তু খাও। কিন্তু দাঁত বা নখ দ্বারা কোন জন্তু যবাহ করা যাবেনা। আর এর কারণ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে এই বলি যে, দাঁত হচ্ছে হাড় স্বরূপ, আর নখ হচ্ছে আবিসিনিয়ার অমুসলিমদের অস্ত্র। (ফাতহুল বারী ৯/৫৫৪, মুসলিম ৩/১৫৫৮)

مُجَاهِدٍ (রহঃ) এবং ইব্ন জুরাইয (রহঃ) বলেন

যে, কা'বা ঘরের এলাকায় অবস্থিত একটি পাথরকে 'نُصْبُ' বলা হয়। (তাবারী ৯/৫০৮) ইব্ন জুরাইয (রহঃ) আরও বলেন যে, সেখানে ৩৬০টি পূজার বেদী ছিল। জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা এ বেদীগুলোর নিকট পশু বলি দিত এবং তারা পবিত্র কা'বা গৃহের নিকটবর্তী বেদীগুলোতে বলি দেয়া পশুগুলোর উপর রক্ত ছিটিয়ে দিত। তারা উক্ত পশুগুলোর গোশত টুকরা টুকরা করে বেদীতে রেখে দিত। (তাবারী ৯/৫০৮) আরও অনেক তাফসীরকারকও এ বর্ণনা দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন এবং পূজার বেদীর বলি দেয়া পশুগুলোকে খাওয়া হারাম করে দেন। এমনকি পূজার বেদীর উপর বলিদানকৃত পশুগুলোকে হত্যা করার সময় আল্লাহর নাম নিলেও তা খাওয়া হারাম। কারণ এটা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জাতীয় শিরককে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। আর এটা হারাম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে যবাহ করা জন্তুর হারাম হওয়া সম্পর্কিত নির্দেশ ইতোপূর্বেই দেয়া হয়েছে।

তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় নিষেধাজ্ঞা

وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ হে মু'মিনগণ! তীরের সাহায্যে অংশ বণ্টন করাও

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। অজ্ঞতার যুগে আরাবরা তীরের সাহায্যে ভাগ্য নির্ধারণ করত। সেখানে তিনটি তীর থাকত। একটিতে লিখা থাকত 'কর'। দ্বিতীয়টিতে লিখা থাকত 'করনা'। আর তৃতীয়টিতে কিছুই লিখা থাকতনা। কারও কারও বর্ণনানুযায়ী প্রথমটিতে লিখা থাকত 'আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।' দ্বিতীয়টিতে লিখা থাকত 'আমার প্রভু আমাকে নিষেধ করেছেন।' আর তৃতীয়টিতে কিছুই লিখা থাকতনা। যখন তাদের কোন কাজে দ্বিধা-সংকোচ আসতো তখন তারা এ তীর নিক্ষেপ করত। যদি নির্দেশসূচক তীরটি উঠত তখন তারা ঐ কাজটি করত। নিষেধসূচক তীরটি উঠলে তারা ঐ কাজটি থেকে বিরত থাকত। আর শূন্য তীরটি উঠলে তারা পুনরায় তীর নিক্ষেপ করত। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 'أَزْلَامٌ' এমন ধরনের তীরকে বলা হত যদ্বারা তারা তাদের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। (তাবারী ৯/৫১৫)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক এবং অন্যান্যদের মতে কুরাইশদের সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মূর্তিটির নাম ছিল হুবল। ওটা পবিত্র কা'বা গৃহের ভিতর কূপের মধ্যে পৌঁতা ছিল। কা'বা ঘরের জন্য যে সমস্ত উপটৌকন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আসত তা উক্ত কূপে সংরক্ষিত রাখা হত। হুবলের নিকট সাতটি তীর রাখা হত, এ তীরগুলোতে কিছু লিখা থাকত। তাদের বিভিন্ন কাজে যখন দ্বিধা-সংকোচের সৃষ্টি হত তখন তারা এ তীরগুলো নিক্ষেপ করত এবং তীরের নির্দেশানুযায়ী কাজ করত। (তাবারী ৯/৫১৩) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কা'বা গৃহে প্রবেশ করেন তখন তিনি সেখানে ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈলের (আঃ) পূর্ণ মূর্তি দেখতে পান। তাদের দু'হাতে তীর রাখা ছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন : 'আল্লাহ তাদেরকে (অজ্ঞতা যুগের আরাবদেরকে) ধ্বংস করুন! কারণ তারা জানত যে, ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) কখনও ভাগ্য নির্ধারণে এ তীর ব্যবহার করতেননা।' (ফাতহুল বারী ৬/৪৪৬) মুজাহিদ (রহঃ) وَأَنَّ

مُجَاهِدٌ قَالَ : تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ এর ব্যাখ্যায় আরও বলেন যে, أَزْلَامٌ বলতে আরাবদের জুয়াখেলার তীর এবং পারস্য ও রোমবাসীদের كَعَاب কে জুয়া খেলার ঘুটিকে বুঝানো হত। (তাবারী ৯/৫১২) তাফসীরকারকগণ বলেন যে, মুজাহিদের (রহঃ) এ মত সম্পর্কে মন্তব্যের অবকাশ আছে। তবে এটা বলা যেতে পারে যে, আরাবরা তীর দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত এবং কখনো কখনো জুয়া খেলত। আল্লাহই এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন।

মহান আল্লাহ তীর এবং জুয়াখেলা এ দু'টিকে একই সাথে বর্ণনা করেছেন। যেমন এ সূরার শেষাংশে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوَقَعَ بَيْنَكُمْ الْاَعْدَاۗءَ وَالْبَغَضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنتَهُوْنَ

হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এ সব গর্হিত বিষয়, শাইতানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণ রূপে

দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়। শাইতান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহর স্মরণ হতে ও সালাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে। সুতরাং এখনও কি তোমরা নিবৃত্ত হবেনা? (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৯০-৯১) ঠিক এমনভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করা জঘন্যতা, ভ্রষ্টতা, মূর্খতা এবং একটি শিরকী কাজ। আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যখন তাদের কোন কাজে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় তখন যেন তারা আল্লাহর ইবাদাত করে, তাদের বাঞ্ছিত কাজের জন্য ইস্তেখারা করে এবং আল্লাহর কাছে তাদের কাজের জন্য মঙ্গল কামনা করে।

মুসনাদ আহমাদ, সহীহ বুখারী এবং সুনান গ্রন্থসমূহে যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে যাবতীয় কাজে পবিত্র কুরআনের সূরা শিখানোর মত করে ইস্তেখারা সালাত আদায় করা শিক্ষা দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কাছে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসে পড়বে তখন তোমরা দু'রাকআত নফল সালাত আদায় করে নিম্নের দু'আটি পড়বে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ (ويسمى حاجته) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي عَاجِلِهِ وَأَجَلِهِ، فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ (ويسمى حاجته) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، عَاجِلِهِ وَأَجَلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট অনুমতি চাই তোমার ইল্মের অসীলায়, আর তোমার কুদরাতী সাহায্য চাই তোমার কুদরাতের অসীলায়, আর তোমার নিকট চাই তোমার মহান ফায়লের অসীলায়। নিশ্চয়ই তুমি কর্মক্ষম, আর আমি অক্ষম। তুমি জ্ঞাত আছ, আর আমি জ্ঞাত নই। নিশ্চয়ই গায়িবের সমস্ত কিছু তুমি জ্ঞাত আছ। হে আল্লাহ! যদি তুমি মনে কর, এই কাজ (এখানে নিজের

প্রয়োজনের কথা স্মরণ করতে হবে) আমার জন্য উত্তম দীনের দিক দিয়ে, দুনিয়ার দিক দিয়ে এবং পরবর্তী জীবনের জন্য, তাহলে উহাকে আমার জন্য সহজ করে দাও। তারপর উক্ত কাজে আমাকে বারাকাত দান কর। আর যদি মনে কর, এই কাজ (এখানে নিজের প্রয়োজনের কথা স্মরণ করতে হবে) আমার জন্য ক্ষতিকর আমার দীন, দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য তাহলে উহাকে আমা হতে দূরে সরিয়ে রাখ এবং আমাকেও উহা হতে দূরে রাখ। আর যে কাজে আমার মঙ্গল রয়েছে আমাকে দিয়ে তা সম্পন্ন করাও। তারপর আমার উপর রাযী খুশি হয়ে যাও। (আহমাদ ৩/৩৪৪, ফাতহুল বারী ৩/৫৮, আবু দাউদ ২/১৮৭, তিরমিযী ২/৫৯১, নাসাঈ ৬/৮০, ইব্ন মাজাহ ১/৪৪০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ, গারীব বলেছেন।

শাইতান এবং কাফিরেরা কখনো বিশ্বাস করেনা যে, মুসলিমরা তাদের অনুসরণ করবে

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, কাফিরেরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে। (তাবারী ৯/৫১৬) অর্থাৎ তারা তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ব ধর্মে ফিরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ‘আতা ইব্ন আবী রাবাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ) ও মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) হতেও এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে। (তাবারী ৯/৫১৬) আয়াতের এ অর্থ বহনকারী একটি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আরাব উপদ্বীপের সালাত আদায়কারীগণ শাইতানের ইবাদাত করবে, শাইতান এটা থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে সে তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে দ্বিগুণ চেষ্টা করতে থাকবে।’ (মুসলিম ৪/২১৬৬)

উক্ত আয়াতটির অর্থ এটাও হতে পারে যে, শাইতান ও মাক্কার মুশরিকরা মুসলিমরাও তাদের মত একই রূপ ধারণ করবে এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কারণ ইসলামের গুণাবলী নির্দেশাবলী যেমন শিরুক না করা ইত্যাদি এ দু’টি সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। এ জন্যই আল্লাহ তাঁর মু’মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা ধৈর্য ধারণ করে, কাফিরদের বিরোধিতায় দৃঢ় থাকে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কেহকেও ভয় না করে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলেন : فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ‘কাফিরেরা তোমাদের

বিরোধিতা করলে তোমরা তাদেরকে ভয় করনা, বরং তোমরা আমাকে ভয় কর। আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব, তাদের উপর বিজয় দান করব এবং তোমাদেরকে হিফাযাত করব যেন তারা তোমাদের ক্ষতি করতে না পারে। আর সর্বোপরি দুনিয়া ও আখিরাতে আমি তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করব।’

ইসলাম মুসলিমকে পরিশীলিত করে

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

الإِسْلَامَ এটা উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার প্রতি রয়েছে আল্লাহর মহান দান। কারণ তিনি এ উম্মাতের জীবন বিধানকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন, যার ফলে তারা অন্য বিধানের মুখাপেক্ষী নয়। এমনভাবে তিনি তাদের নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ‘খাতামুননাবিয়ীন’ বা সর্বশেষ নাবী করেছেন এবং অন্য কোন নাবীর মুখাপেক্ষী করেননি। আর তাদের নাবীকে সমগ্র মানব জাতি ও বিশ্ববাসীর নাবী করে পাঠিয়েছেন। তিনি যা কিছু হালাল করেছেন সেটাই হালাল এবং যা কিছু হারাম করেছেন সেটাই হারাম। তিনি যে দীনকে প্রবর্তন করেছেন ওটাই একমাত্র দীন এবং তিনি যে সংবাদ প্রদান করেছেন ওটা ন্যায় ও সত্য তাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা বা বৈপরীত্য নেই। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্যত্র বলেন :

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ

তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ, তাঁর বাণী পরিবর্তনকারী কেহই নেই। (সূরা আন‘আম, ৬ : ১১৫) আল্লাহ এ উম্মাতের দীনকে পূর্ণতা দান করার মাধ্যমে তাঁর দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। আর এ জন্যই তিনি বলেছেন : ‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম।’ সুতরাং তোমরা ওটাকে তোমাদের নিজেদের জন্য গ্রহণ করে স্বেচ্ছা হও। কেননা ওটা সেই দীন যাকে আল্লাহ ভালবাসেন ও পছন্দ করেন। আর এ দীনসহ তিনি তাঁর সম্মানিত রাসূলদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। এ দীনসহ তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকে অবতীর্ণ করেছেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) হারুন ইব্ন আনতারাহর (রহঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে আরও বলেন যে, তার পিতা বলেছেন : উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দিনটি ছিল হাজ্জে আকবারের দিন (আরাফাহর দিন)। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর উমার (রাঃ)

কাঁদতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করেন। উমার (রাঃ) বলেন : ‘আমরা এ দীনে পূর্ণতা পেয়েছি, কিন্তু এ সম্পর্কে আরও কিছু আশা করছিলাম। কিন্তু এটা যখন পূর্ণতা লাভ করেছে, তখন সাধারণ নিয়মানুযায়ী এখন তা অবনতির দিকে যেতে পারে।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘আপনি সত্য কথাই বলেছেন।’ (তাবারী ৯/৫১৯) এ হাদীসের অর্থের স্বপক্ষে অন্য একটি সহীহ হাদীস এসেছে, হাদীসটি নিম্নরূপ :

‘ইসলাম স্বল্প সংখ্যক লোক নিয়ে শুরু হয়েছিল এবং অতিসত্বরই তা স্বল্প সংখ্যার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব ঐ স্বল্প সংখ্যক লোকের জন্য সুসংবাদ।’ (মুসলিম ১/১৩০) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ) তারিক ইব্ন শিহাব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একজন ইয়াহুদী উমার ইব্ন খাতাবের (রাঃ) নিকট এসে বলেন : ‘হে আমীরুল মু‘মিনীন! আপনাদের ধর্মীয় গ্রন্থে একটি আয়াত আছে, তা যদি ইয়াহুদীদের উপর অবতীর্ণ হত তাহলে আমরা ঐ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিনটিকে ঈদের দিন হিসাবে গণ্য করতাম।’ তখন উমার (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন : ‘আয়াতটি কি?’ উত্তরে ইয়াহুদী বলে : **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ**

دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا এ আয়াতটি। উমার (রাঃ) তখন বললেন : ‘আল্লাহর শপথ! যে দিন ও যে সময়ে উক্ত আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল আমি উক্ত দিন ও সময় সম্পর্কে অবগত আছি। ওটা ছিল আরাফাহর দিন শুক্রবার সন্ধ্যার সময়।’ (আহমাদ ১/৩৮) ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এ হাদীসটিকে তাঁদের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। (হাদীস নং ১/১২৯, ৪/২৩১৩, ৮/৪০৭ ও ৫/২৫১)

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থের কিতাবুত তাফসীরে এ হাদীসটি তারিক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, ইয়াহুদীরা উমারকে (রাঃ) বলল : ‘আপনারা আপনাদের পবিত্র কুরআনের এমন একটি আয়াত পাঠ করে থাকেন যে, যদি ঐ আয়াতটি আমাদের ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের উপর অবতীর্ণ হত তাহলে আমরা ঐ দিনকেই ঈদের দিন হিসাবে গ্রহণ করতাম।’ তখন উমার (রাঃ) বললেন : ‘আমি এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও স্থান সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন

কোথায় ছিলেন সেটাও জানি। উক্ত দিনটি ছিল আরাফাহর দিন এবং আল্লাহর শপথ! আমিও সে সময় আরাফাহয় ছিলাম।’ (ফাতহুল বারী ৮/১১৯)

সুফিয়ান (রহঃ) বলেন : ‘বর্ণনায় আরাফাহর দিনটি শুক্রবার ছিল’ কি-না এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে।’ ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন : সুফিয়ান যদি এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে থাকেন যে, শুক্রবারের কথাটি হাদীসের বর্ণনার মধ্যে রয়েছে কি-না, তাহলে এটা হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তাঁর অসতর্কতা। কারণ তিনি সন্দেহ করেছেন যে, তাঁর শিক্ষক তাঁকে শুক্রবারের কথা বলেছেন কি বলেননি। আর যদি তাঁর এ ব্যাপারে সন্দেহ হয়ে থাকে যে, বিদায় হাজ্জের বছর আরাফাহয় অবস্থান শুক্রবার দিন হয়েছিল কিনা, তা আমার ধারণায় এ সন্দেহ সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) কর্তৃক হতে পারেনা। কারণ এটা এমন একটি জানা ও প্রসিদ্ধ ঘটনা যাতে ‘সিয়াহ এর’ লেখক এবং ফকীহগণ একমত। এ ব্যাপারে এত অধিক সংখ্যক প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যাদের বর্ণনায় সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারেনা। উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি বহু সনদের মাধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে।

নিরুপায় অবস্থায় মৃত প্রাণী আহার করার অনুমতি

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন, প্রয়োজনের তাগিদে যদি কোন লোক গুণ্ডলো খেতে বাধ্য হয় তাহলে তা খেতে পারে। আল্লাহ এ ব্যাপারে তার প্রতি ক্ষমশীল ও দয়ালু। কেননা আল্লাহ জানেন যে, সে অপারগ ও অক্ষম হয়ে হারাম খাদ্যকে গ্রহণ করেছে। সুতরাং তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। ইব্ন হিব্বানের (রহঃ) সহীহ গ্রন্থে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে যে কাজ করার অনুমতি প্রদান করেছেন তা পালন করাকে তিনি ঐ রকম পছন্দ করেন যেমন তিনি তাঁর অবাধ্য না হওয়াকে পছন্দ করেন। (ইব্ন হিব্বান ৪/১৮২)

অধিকাংশ লোকের মধ্যে ধারণা প্রচলিত আছে যে, মৃত জন্তু হালাল হওয়ার জন্য তিন দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকা শর্ত। ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন যে, এ শর্ত ঠিক নয়, বরং যখনই কোন ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় মৃত প্রাণী খেতে বাধ্য ও মজবুর হয়ে পড়বে তখনই তার জন্য তা খাওয়া জাযিয়। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ) তাঁর সনদের মাধ্যমে আবু ওয়াকীদ আল লাইসী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একদা সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

জিজ্ঞেস করলেন : আমরা কখনও কখনও এমন স্থানে উপস্থিত হই সেখানে আমরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ি। তখন কোন্ কোন্ অবস্থায় আমাদের জন্য মৃত জন্তু খাওয়া হালাল হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : ‘যখন তোমরা দুপুরে ও রাতে কোন খাদ্য না পাও তখন তোমরা তা (মৃত জন্তু) খেতে পার।’ (আহমাদ ৫/২১৮) হাদীসে উল্লিখিত সনদটি ইমাম আহমাদ (রহঃ) একাই তাঁর গ্রন্থে এনেছেন। অবশ্য সনদটি সহীহ। কারণ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) সনদ সহীহ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত আরোপ করেছেন তা উক্ত শর্তগুলি পূরণ করে। এ হাদীসটি ইব্ন জারীরও (রহঃ) তাঁর সনদের মাধ্যমে ইমাম আওয়ামী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে লিপ্ত হয়না তার জন্যই এ প্রকারের হারাম খাদ্য ভক্ষণ করা বৈধ। ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন : মহান আল্লাহ সূরা মায়িদাহর এ আয়াতে শুধুমাত্র পাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য হারাম বস্তু ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু সীমা লংঘনকারীদের জন্যও যে তা ভক্ষণ করা হারাম তার কোন উল্লেখ নেই। যেমন সূরা বাকারাহর আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। আয়াতটি নিম্নরূপ :

فَمَنْ أَضْطَرُّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

বস্তুতঃ যে ব্যক্তি নিরুপায়, কিন্তু সীমা লংঘনকারী নয়, তার জন্য পাপ নেই; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৭৩) এ আয়াত হতে ফিকাহবিদগণের একটি দল প্রমাণ গ্রহণ করেন যে, যে ব্যক্তি সফরে নাফরমানীমূলক কাজে লিপ্ত থাকে, সে সফর সংক্রান্ত ব্যাপারে শারীয়াতের শিথিলতা পাওয়ার যোগ্য নয়। কেননা পাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য শিথিলতা প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে - তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? তুমি বল : পবিত্র জিনিসগুলি তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী তোমরা যে সমস্ত

٤. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ
قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا
عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ

পশু-পাখীকে শিকার করা শিক্ষা দিয়েছে; তারা যা শিকার করে আনে তা তোমরা খাও এবং ওগুলিকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

হালাল বস্তু (খাদ্য) সম্পর্কে বর্ণনা

মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী আয়াতে শরীর বা দীন অথবা উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর ও অপবিত্র বস্তুগুলোকে হারাম করেছেন। তবে প্রয়োজনবোধে আবার ঐগুলোকে হালাল করেছেন। যেমন আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলেন : ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য বিশদভাবে হারাম বস্তুগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। তবে যদি তোমরা অনন্যোপায় হয়ে পড় তাহলে ঐগুলো খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল।’ এরপর মহান আল্লাহ কোন্ কোন্ বস্তু হালাল সেই সম্পর্কে এ আয়াতে বর্ণনা করেন। যেমন সূরা আ’রাফে আল্লাহ তা’আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র বস্তুগুলিকে তাঁর উম্মাতের জন্য হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তুগুলো তাদের জন্য হারাম করেছেন। মুকাতিল (রহঃ) বলেন, তাইয়েবাহ হল যা মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তা’আলা হালাল করেছেন এবং লোকেরা বৈধভাবে রুখী হিসাবে অর্জন করেছে। একদা ইমাম যুহরীকে (রহঃ) ‘ওষুধ হিসাবে প্রস্রাব পান করা জাযিয় কি না’-এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন : ‘ওটা পবিত্র নয়?’ ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

শিকারী প্রাণী দ্বারা শিকার করা

كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ قُلُوبًا فَاعْلَمُوا কুকুর, চিতাবাঘ, বাজপাখী প্রভৃতি শিকারী জানোয়ার তোমাদের জন্য যা শিকার করে আনে সেটাও তোমাদের জন্য হালাল। অধিকাংশ সাহাবী, তাবঈ এবং ইমামের এটাই অভিমত। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, শিকারী পশু বলতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর, বাজপাখী এবং অন্যান্য পশুকে

বুঝানো হয়। (তাবারী ৯/৫৪৮) এ হাদীসটি ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেন যে, খায়সামা (রহঃ), তাউস (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মাকহুল (রহঃ) এবং ইয়াহুইয়া ইব্ন আবী কাসীর (রহঃ) হতেও এ ধরনের বর্ণনা এসেছে। (তাবারী ৯/৫৪৭) ইব্ন জারীর (রহঃ) ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, বাজ এবং অন্যান্য শিকারী পাখীর শিকার যদি জীবিতাবস্থায় পাওয়া যায় এবং শিকারী পশু যদি শিকার হতে না খেয়ে থাকে তাহলে তা যবাহ করে খাওয়া হালাল, অন্যথায় তা হালাল নয়। (তাবারী ৯/৫৪৯) ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন : অধিকাংশ আলেমের মতে শিকারী পাখীর শিকার শিকারী কুকুরের শিকারের ন্যায়। কারণ শিকারী কুকুর যেমন শিকারকে থাবা দ্বারা যথম করে, অনুরূপভাবে পাখীও শিকারকে থাবা দ্বারা যথম করে। সুতরাং পাখী এবং কুকুরের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এ মতকেই সমর্থন করেন। তাঁরা এ মতের স্বপক্ষে আদী ইব্ন হাতিমের (রাঃ) হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন। আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) বলেন : আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাজ পাখীর শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেন :

‘যদি সে তোমার জন্য শিকার করে নিয়ে আসে তাহলে তুমি তা খেতে পার।’ (তাবারী ৯/৫৫০) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বালের (রহঃ) মতে কাল কুকুর দ্বারা শিকার করা জায়েয নয়। তিনি প্রমাণ হিসাবে সহীহ মুসলিমে আবু বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেন। হাদীসটি নিম্নরূপ :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তিনটি জিনিস সালাত ভঙ্গ করে থাকে। গাধা, মহিলা ও কালো কুকুর।’

جَوَارِحُ শব্দটি جَرَحُ ধাতু হতে উদ্ভূত। جَرَحُ এর অর্থ হল অর্জন করা। যেহেতু শিকারী জন্তুগুলো মালিকের জন্য শিকারকে অর্জন করে (শিকার করে) নিয়ে আসে, সেহেতু এ জন্তুগুলোকে جَوَارِحُ বলা হয়ে থাকে। আর আরাবের অধিবাসীরা এ কথাটি ঐ সময় বলে যে সময় কোন ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনের জন্য ভাল কিছু অর্জন করে নিয়ে আসে। ঠিক এমনিভাবে তারা বলে থাকে فُلَانٌ لَّهْ جَرَحٌ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির কোন অর্জনকারী নেই। পবিত্র কুরআনেও جَرَحٌ শব্দটি অর্জন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ

আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম কর তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত।
(সূরা আন'আম, ৬ : ৬০)

مُكَلِّينَ এটা عَلَّمْتُمْ হতে حَال হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে শিকারের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। যে সমস্ত শিকারী পশুকে তোমরা শিকার করা শিক্ষা দিয়েছ, আর তারা তাদের থাবা এবং নখ দ্বারা শিকার করে, তাদের শিকার তোমরা খেতে পারবে। সুতরাং এ হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শিকারী জন্তু যদি তার আঘাতের দ্বারা শিকারকে হত্যা করে তাহলে তা খাওয়া জায়েয হবেনা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহর নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী তোমরা যে সমস্ত পশু-পক্ষীকে শিকার করা শিক্ষা দিয়েছ; তারা যা শিকার করে আনে তা তোমরা খাও। যখন শিকারী পশুকে শিকারের জন্য পাঠানো হয় তখন কিভাবে শিকার ধরবে, শিকারী পশুকে শিকার করার পর কিভাবে তার মালিক না আসা পর্যন্ত নিজে আহার না করে অক্ষত রাখবে ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হবে। আর আল্লাহ এ জন্যই বলেন :

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ শিকারী জন্তুগুলো তোমাদের জন্য যা রেখে দেয় তা তোমরা খাও এবং শিকারী পশুগুলোকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ কর। অর্থাৎ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তুকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময় যদি আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় তাহলে ওর শিকার খাওয়া হালাল, যদিও সে শিকার করার পর ওকে হত্যা করে ফেলে। এ ব্যাপারে সকল আলেমই একমত। এ আয়াত শিকার সম্পর্কে যে নির্দেশের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে, হাদীসেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবী ইব্ন হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে শিকারের জন্য পাঠাই এবং ঐ সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন :

‘তোমার কুকুর যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং ওকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময় যদি তুমি আল্লাহর নাম নিয়ে থাক তাহলে ওটা তোমার জন্য যা শিকার করে আনবে তা তুমি খেতে পার। আমি বললাম, যদি ইহা শিকারকে মেরে ফেলে তবুও কি? তিনি উত্তরে বললেন : যদিও শিকারী পশু শিকারকে মেরে

ফেলে যাকে তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে শিকারে পাঠিয়েছ, যদি ওর সাথে অন্য কোনো কুকুর অংশ না নেয়। কেননা তুমি তোমার কুকুরটিকে আল্লাহর নাম নিয়ে ছেড়েছ বটে, কিন্তু অন্য কুকুরটিকে তো বিস্মিল্লাহ বলে ছাড়া হয়নি।’

আমি বললাম, আমি ধারাল কাঠ দ্বারা শিকার করে থাকি। তিনি বললেন : ‘যদি ওটা তীক্ষ্ণ প্রান্ত দিয়ে আহত করে তাহলে তুমি খেতে পার। কিন্তু যদি ভোতা দিক দিয়ে আহত করে তাহলে খেওনা। কেননা ওকে ঝাপটা দিয়ে মারা হয়েছে।’ (ফাতহুল বারী ৯/৫২৭, মুসলিম ৩/১৫২৯) অন্য বর্ণনায় নিম্নরূপ শব্দ রয়েছে, যখন তুমি তোমার কুকুরটিকে ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। অতঃপর যদি ওটা শিকারকে ধরে রাখে এবং তোমার নিকট পৌঁছার সময় ঐ শিকার জীবিত থাকে তাহলে ওকে যবাহ করবে। আর যদি কুকুরটাই ওকে মেরে ফেলে এবং তার থেকে কিছুই ভক্ষণ না করে তাহলে ওটাও তুমি খেতে পার। কেননা কুকুরের ওটাকে শিকার করাই হচ্ছে ওকে যবাহ করা। (ফাতহুল বারী ৯/৫১৩, মুসলিম ৩/১৫৩০) আর এক বর্ণনায় নিম্নরূপ শব্দগুলিও রয়েছে : যদি শিকারী কুকুরটি ওকে ভক্ষণ করে তাহলে তুমি ওটা খেওনা। কেননা আমার আশংকা হচ্ছে যে, কুকুরটি শিকারটিকে নিজের জন্যই শিকার করেনিতো? (ফাতহুল বারী ৯/৫২৭, মুসলিম ৫/১৫২৯) এটাই বিজ্ঞজ্ঞানদের দলীল।

শিকারের জন্তুগুলি শিকার করার উদ্দেশে পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে পাঠাতে হবে

আল্লাহ তা‘আলা বললেন : فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

عَلَيْهِ তোমাদের জন্তুগুলো যে হালাল জন্তুগুলো শিকার করে আনে তা তোমরা খাও এবং ঐ শিকারী জন্তুগুলোকে শিকারের উদ্দেশে ছেড়ে দেয়ার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর, যেমনটি আদী (রাঃ) ও সা‘লাবা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরাতে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৯/৫২৭, মুসলিম ৩/১৫৩২) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : ‘শিকারী জন্তুকে শিকারের জন্য প্রেরণের সময় বিস্মিল্লাহ পড়ে নাও। তবে ভুলে গেলে কোন দোষ নেই।’ (তাবারী ৯/৫৭১) কেহ কেহ বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে খাওয়ার সময় বিস্মিল্লাহ বলা। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়া সাল্লাম একদা তাঁর এক স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর সন্তান উমার ইব্ন আবু সালমাকে (রাঃ) বলেছিলেন :

‘আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর, ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনের দিক থেকে খাও।’ (ফাতহুল বারী ৯/৪৩১, মুসলিম ৩/১৫৯৯) সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এমন লোকেরা আমাদের নিকট গোস্ত নিয়ে আসে যারা নও-মুসলিম, তারা (জম্বু যবাহ করার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কি করেনা তা আমাদের জানা নেই। আমরা সেই গোস্ত খেতে পারি কি? তিনি উত্তরে বললেন : ‘তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তা খেয়ে নাও।’ (ফাতহুল বারী ৯/৫৫০)

৫। আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুগুলি হালাল করা হল। আহলে কিতাবের যবাহকৃত জীবও তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের যবাহকৃত জীবও তাদের জন্য হালাল। আর সতী সাধ্বী মুসলিম নারীরাও এবং তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের মধ্যকার সতী-সাধ্বী নারীরাও (তোমাদের জন্য হালাল), যখন তোমরা তাদেরকে তাদের বিনিময় (মহর) প্রদান কর, এ রূপে যে, তোমরা (তাদেরকে) পত্নী রূপে গ্রহণ করে নাও, না প্রকাশ্যে ব্যভিচার কর, আর না গোপন প্রণয় কর; আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী

۝. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ
وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
غَيْرِ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
أَحْدَانٍ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ

মিশ্রিত করবে তার ‘আমল
নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং সে
আখিরাতে সম্পূর্ণ রূপে
ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

আহলে কিতাবীদের যবাহ করা প্রাণী হালাল

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ হালাল ও হারামের বর্ণনা দেয়ার পর এটাকে পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, সমুদয় পবিত্র বস্তু হালাল। তারপর তিনি ইয়াহুদ ও নাসারাদের যবাহকৃত জীবগুলোর বৈধতার বর্ণনা দিচ্ছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবু উমামাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), সুদী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বানও (রহঃ) এ কথাই বলেন যে, এখানে এর ভাবার্থ হচ্ছে তাদের স্বহস্তে যবাহকৃত পশু হালাল। (তাবারী ৯/৫৩৭-৫৭৭) এটা খাওয়া মুসলিমদের জন্য হালাল। কেননা তারাও গাইরুল্লাহর নামে যবাহ করাকে নাজাযিয় মনে করে এবং যবাহ করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম নেয়না। যদিও আল্লাহ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে অমূলক, যা থেকে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে। সহীহ হাদীসে আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, খাইবার যুদ্ধে আমি চর্বি ভর্তি একটি মশক প্রাপ্ত হই। আমি ওটাকে নিজের অধিকারে নিয়ে নিই এবং বলি, আজ আমি কেহকেও এর অংশ দিবনা। তারপর এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। হঠাৎ দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং মুচকি হাসছেন। (ফাতহুল বারী ৯/৫৫৩)

এ হাদীসটি দ্বারা এ দলীলও গ্রহণ করা হয়েছে সে, গানীমাতের মধ্য হতে পানাহারের কোন প্রয়োজনীয় জিনিস বন্টনের পূর্বেও ব্যবহার করা জাযিয়। এ দলীল এ হাদীসের দ্বারা পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। তিন মায়হাবে ফকীহগণ মালেকীদের সামনে এ সনদ পেশ করে বলেছেন : তোমরা যে বলে থাক, আহলে কিতাবের নিকট যে খাদ্য হালাল সেই খাদ্য আমাদের নিকটও হালাল— এটা ভুল। দেখ, ইয়াহুদীরা চর্বিকে তাদের জন্য হারাম মনে করে থাকে, অথচ মুসলিম ওটা গ্রহণ করছে। কিন্তু তাদের এ কথা বলা ঠিক নয়। কেননা ওটা ছিল একটি

ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর চেয়ে আরও বেশি প্রমাণযুক্ত ঐ দলীলটি যাতে রয়েছে যে, খাইবারবাসী সদ্য ভাজা একটি ছাগী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপঢৌকন দিয়েছিল যাতে তারা বিষ মিশ্রিত করেছিল। কেননা তাদের জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রানের গোশ্ত পছন্দ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ গোশ্ত মুখে দিয়ে দাঁত দ্বারা কাটা মাত্রই আল্লাহর নির্দেশক্রমে ঐ কাঁধ বলে উঠল : ‘আমাতে বিষ মিশ্রিত রয়েছে।’ তিনি তৎক্ষণাৎ ওটা থুথু করে ফেলে দিলেন। ওর ক্রিয়া তাঁর সামনের দাঁতে রয়েও গেল। আহারের সময় তাঁর সাথে বিশর ইব্ন বারা ইব্ন মাররও (রাঃ) ছিলেন। ঐ বিষক্রিয়ায়ই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। এর প্রতিশোধ হিসাবে বিষ মিশ্রিতকারিণী মহিলাটিকেও হত্যা করা হল, যার নাম ছিল যাইনাব। এটা প্রমাণরূপে স্বীকৃত হওয়ার কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং সঙ্গীগণসহ ঐ গোশ্ত আহারের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন এবং ইয়াহুদীরা যে চর্বিবে হারাম মনে করত তা তারা বের করে ফেলেছে কিনা সেটাও তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেননা। (ফাতহুল বারী ৭/৫৬৯)

এরপর বলা হচ্ছে, তোমাদের (মুসলিমদের) যবাহকৃত জীব তাদের (আহলে কিতাবদের) জন্য হালাল। অর্থাৎ হে মুসলিমরা! তোমরা আহলে কিতাবীদেরকে তোমাদের যবাহকৃত জীবের গোশ্ত খাওয়াতে পার। এটা এ অর্থের খবর নয় যে, তাদের ধর্মে তাদের জন্য তোমাদের যবাহকৃত প্রাণী হালাল। তবে হ্যাঁ, খুব বেশি বলা হলে এটুকুই বলা যেতে পারে : এটা এ কথারই খবর হবে যে, তাদেরকেও তাদের কিতাবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে জীবকে আল্লাহর নামে যবাহ করা হয়েছে তা তারা খেতে পারে। এ ব্যাপারে এটা সাধারণ কথা যে, যবাহকারী তাদের ধর্মের অনুসারীই হোক বা অন্য কেহ হোক। কিন্তু প্রথম উক্তিটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সুন্দর অর্থাৎ তোমাদের জন্য অনুমতি রয়েছে যে, তোমরা আহলে কিতাবীদেরকে তোমাদের যবাহকৃত জন্তুর গোশ্ত ভক্ষণ করাতে পার, যেমন তোমরা তাদের যবাহকৃত জন্তুর গোশ্ত খেতে পার। এটা যেন অদল বদলের হিসাবে বলা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুলকে নিজের বিশেষ জামা দ্বারা কাফন পরিয়েছিলেন। কোন কোন বিজ্ঞজন যার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আব্বাস (রাঃ) যখন মাদীনায় আগমন করেন তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই তাঁকে নিজের জামাটি প্রদান করেছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিনিময়ে তার

কাফনের জন্য স্বীয় জামাটি প্রদান করেছিলেন। তবে হ্যাঁ, একটি হাদীসে রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমরা মু’মিন ছাড়া আর কারও সাথে উঠা বসা ও বন্ধুত্ব করা এবং মুত্তাকীদের ছাড়া আর কেহকেও নিজেদের খাদ্য খেতে দিওনা।’ (আবু দাউদ ৫/১৬৭) এ হাদীসটিকে এ অদল বদলের বিপরীত মনে করা ঠিক হবেনা। কেননা হতে পারে যে, মুত্তাহাব হিসাবে এ হুকুম দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আহলে কিতাবীদের মধ্য থেকে সতী-সাক্ষী নারীদেরকে বিয়ে করা যাবে

ঘোষিত হচ্ছে, সতী সাক্ষী মুসলিম নারীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এখানে **مُحْصَنَاتٌ** এর ভাবার্থ হবে ঐ সব নারী যারা সতী সাক্ষী ও ব্যভিচার থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত। যেমন অন্য আয়াতে **مُحْصَنَاتٌ** এর সাথে **غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخَذَاتٍ أَخْدَانٍ** (৪ : ২৫) এ শব্দগুলি রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) খৃষ্টান নারীদেরকে বিয়ে করা নাজায়য মনে করতেন এবং বলতেন : তারা বলে যে, ঈসা (আঃ) হচ্ছেন তাদের প্রভু। এর চেয়ে বড় শিরক আর কি হতে পারে? আর তারা যখন মুশরিক রূপে পরিগণিত হল তখন কুরআনুল হাকীমের **وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمَنَّ** (এবং মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করনা) (সূরা বাকারাহ, ২ : ২২১) এ আয়াতটি তাদের উপর অবশ্যই প্রযোজ্য হবে।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মুশরিকদেরকে বিয়ে না করার হুকুম নাযিল হয় তখন সাহাবায়ে কিরাম তা থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর যখন আহলে কিতাবের সতী সাক্ষীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি যুক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন জনগণ তাদেরকে বিয়ে করেন। সাহাবীগণের একটি দল এ আয়াতটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে খৃষ্টান নারীদেরকে বিয়ে করেন এবং এটাকে কোন অপরাধমূলক কাজ মনে করেননি। তবে এটা সূরা বাকারায় নিষেধযুক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু পরে অন্য আয়াত দ্বারা একে বিশিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এটা ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যখন মেনে নেয়া হবে যে, নিষেধযুক্ত আয়াতের মধ্যে এটাও शामिल ছিল। নচেৎ এ

দু'টি আয়াতের মধ্যে কোনই বৈপরীত্য নেই। কেননা আরও বহু আয়াতে আহলে কিতাবীদেরকে মুশরিকদের হতে পৃথক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন :

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْيَقِينَةُ

কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল এবং মুশরিকরা আপন মতে অবিচল ছিল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত। (সূরা বাইয়্যিনাহ, ৯৮ : ১)

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ؕ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ أَهْتَدُوا

এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল : তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? অতঃপর যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২০) আয়াত দু'টিতে তাদেরকে মুশরিকদের হতে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে :

إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ তোমরা তাদেরকে তাদের নির্দিষ্ট মহর প্রদান কর।

অর্থাৎ যেহেতু তারা নিজেদেরকে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেহেতু তোমরা তাদেরকে তাদের ন্যায্য মহর সম্ভূষ্ট চিন্তে দিয়ে দাও। যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ), আমির আশ শা'বী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং হাসান বাসরীর (রহঃ) ফাতওয়া এই যে, যদি কোন লোক কোন নারীকে বিয়ে করে এবং সহবাসের পূর্বে তার স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে এবং স্বামী তার স্ত্রীকে যে মহর প্রদান করেছে তা তার নিকট থেকে ফিরিয়ে নিবে। (তাবারী ৯/৫৮৫, ৫৮৬) বলা হচ্ছে :

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ তোমরা তাদেরকে পত্নী রূপে

গ্রহণ করে নাও, না প্রকাশ্যে ব্যভিচার কর, আর না গোপন প্রণয় কর। সুতরাং নারীদের জন্য যেমন পবিত্রতা ও সতীত্বের শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তেমনই পুরুষদের জন্যও এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর সাথে সাথেই বলা হয়েছে যে, তারা যেন না প্রকাশ্যে ব্যভিচারী হয়, না এদিক ওদিক ঘুরাঘুরি করে এবং না বিশেষ সম্পর্কের কারণে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সূরা নিসায় এ রূপই নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আর তাঁর নিকট পুরুষদের ব্যাপারেও এ হুকুমই প্রযোজ্য যে, কোন

ব্যভিচারী পুরুষের সাথে কোন সতী সাধ্বী নারীর বিয়ে জায়িজ নয় যে পর্যন্ত না সে খাঁটি অন্তরে তাওবাহ করে এবং জঘন্য কাজ থেকে বিরত হয়।

৬। হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের উদ্দেশে দন্ডায়মান হও তখন (সালাতের পূর্বে) তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলি কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, আর মাথা মাসাহ কর এবং পা'গুলি টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল। যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহলে গোসল করে সমস্ত শরীর পবিত্র করে নাও। কিন্তু যদি রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ পায়খানা হতে ফিরে আস কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (স্ত্রী-সহবাস কর), অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, তখন তোমরা তা দ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসাহ কর, আল্লাহ তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা আনয়ন করতে চাননা, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে ও তোমাদের উপর স্বীয়

ۖ. يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

নি‘আমাত পূর্ণ করতে চান,
যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
কর।

وَلَيْتُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

উযু করার নির্দেশ

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, সালাত আদায় করার জন্য অবশ্যই উযু করতে হবে। পবিত্রতা অর্জন করার জন্য এটি অবশ্য করণীয় যা না করলে অপবিত্রতা দূর হবেনা। একটি দলের ধারণা এই যে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যেক সালাতের জন্য উযুর নির্দেশ ছিল, কিন্তু পরে তা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সালাতের জন্য নতুনভাবে উযু করতেন। মাক্কা বিজয়ের দিন তিনি উযু করে মোজার উপর মাসাহ করেছিলেন এবং ঐ একই উযুতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেছিলেন। এটা দেখে উমার (রাঃ) বলেছিলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আপনি এমন কাজ করলেন যা ইতোপূর্বে কখনও করেননি। তখন তিনি বললেন : ‘হ্যাঁ, আমি ভুলে এরূপ করেছি তা নয়, বরং জেনে শুনে ইচ্ছা করেই করেছি।’ (আহমাদ ৫/৩৫৮, মুসলিম ১/২৩২, আবু দাউদ ১/১২০, তিরমিযী ১/১৯৪, নাসাই ১/৮৬, ইব্ন মাজাহ ১/১৭০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

সুনান ইব্ন মাজাহয় রয়েছে যে, যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) এক উযুতে কয়েক ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন। তবে প্রস্রাব করলে বা উযু ভেঙ্গে গেলে নতুনভাবে উযু করতেন এবং উযুরই অবশিষ্ট পানি দ্বারা মোজার উপর মাসাহ করতেন। এটা দেখে ফযল ইব্ন মুবাহশীর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : এটা কি আপনি নিজের মতানুযায়ী করেন? তিনি উত্তরে বলেন : না, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। (তাবারী ১০/১১, ইব্ন মাজাহ ১/১৭০) ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমারকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল : আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) প্রতি ওয়াক্তের সালাতের জন্য উযু করেন, যদিও তিনি তখনও উযু অবস্থায় থাকেন? তখন তিনি উত্তরে বললেন : আসমা বিনতে যায়িদ ইব্নুল খাতাব (রহঃ) তাকে বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন

হানযালা ইব্ন আমির আল গাছিল (রহঃ) তাকে (আসমা) বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি ওয়াজ্ঞ সালাতের জন্য উযু করতে বলা হয়েছিল, তা উযু দরকার হোক অথবা না হোক। যখন ইহা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে গেল তখন তাকে প্রতি ওয়াজ্ঞে মিশওয়াব ব্যবহার করতে আদেশ করা হয় এবং প্রয়োজন বোধ করলে উযু করতে বলা হয়। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) মনে করেছিলেন যে, তিনি প্রতি ওয়াজ্ঞে উযু করতে সক্ষম হবেন এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত তাই করে গেছেন। (আহমাদ ৫/২২৫, আবু দাউদ ৪/৩৬) আবদুল্লাহ ইব্ন উমারের (রাঃ) এই অভ্যাস মানুষকে ভাল কাজের প্রেরণা যোগায়। কিন্তু প্রতি ওয়াজ্ঞ সালাতের জন্য উযু করা যরুরী নয় (যদি উযু ছুটে না যায়)। অধিকাংশ আলেমগণের এটাই অভিমত।

সুনান আবু দাউদে রয়েছে, বর্ণনাকারী বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানা হতে বের হন এবং তাঁর সামনে খাদ্য হাযির করা হয়। আমরা তাঁকে বললাম : আপনার নির্দেশ হলে উযুর পানি নিয়ে আসি। তখন তিনি বললেন : ‘যখন আমি সালাতের জন্য দাঁড়াই তখনই শুধু আমার প্রতি উযুর নির্দেশ রয়েছে।’ (আবু দাউদ ৪/৩৬, তিরমিযী ৫/৫৭৯, নাসাঈ ১/৮৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : আমরা একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি যখন প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিয়ে আবার ফিরে আসেন তখন তাঁর জন্য খাবার নিয়ে আসা হল। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল : হে আল্লাহ রাসূল! আপনি কি উযু করবেন? তিনি বললেন : কেন? আমি কি এখন সালাত আদায় করব যে, আমাকে উযু করতে হবে? (মুসলিম ১/২৮৩)

উযু করার নিয়াত এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করা

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াও তখন উযু করে নাও’ আয়াতের এ শব্দগুলি দ্বারা উলামায়ে কিরামের একটি দল দলীল গ্রহণ করেছেন যে, উযুতে নিয়াত ওয়াজিব। কালামুল্লাহর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা সালাতের জন্য উযু করে নাও। যেমন আরাবের লোকেরা বলে থাকে, যখন তোমরা আমীরকে দেখ তখন দাঁড়িয়ে যাও অর্থাৎ আমীরের জন্য দাঁড়িয়ে যাও। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে : ‘আমলের পরিণাম নিয়াতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক মানুষের জন্য শুধু ওটাই রয়েছে যার সে নিয়াত করেছে। (ফাতহুল বারী ১/১৫, মুসলিম ৩/১৫১৫)

উযূতে মুখমণ্ডল ধৌত করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা বাঞ্ছনীয়। কেননা একটি খুবই বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি উযূতে বিসমিল্লাহ বলল না তার উযূ হলনা।’ (আবু দাউদ ১/৭৫) এটাও স্মরণীয় বিষয় যে, উযূর পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করানোর পূর্বে হাত ধুয়ে নেয়া মুস্তাহাব। আর যখন কেহ ঘুম থেকে জেগে উঠবে তার জন্য তো এ ব্যাপারে খুবই তাগীদ রয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যখন তোমাদের কেহ ঘুম থেকে জেগে উঠবে তখন যেন সে তার হাত তিনবার ধুইয়ে নেয়ার পূর্বে পাত্রে প্রবেশ না করায়, কেননা তোমাদের কেহই জানেনা যে, রাতে তার হাতটি কোথায় ছিল।’ (ফাতহুল বারী ১/৩১৬, মুসলিম ১/২৩৩) মুখমণ্ডলের সীমা দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ মাথার চুল গজানোর জায়গা থেকে দাড়ির হাড় ও থুতনি পর্যন্ত এবং প্রস্থে এক কান থেকে অপর কান পর্যন্ত।

উযূ করার সময় দাড়ি খিলাল করতে হবে

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবু ওয়াইল (রহঃ) বলেছেন : আমি উসমানকে (রাঃ) উযূ করতে দেখেছি ... যখন তিনি তার মুখমণ্ডল ধৌত করেন তখন তার আঙ্গুল দিয়ে তিনবার দাড়ি খিলাল করেন। তিনি বলেন : তুমি আমাকে যা করতে দেখছ, আমিও অনুরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করতে দেখেছি। (জামি আল মাসানিদ ওয়াস সুনান ১৭/১৯৭, তিরমিযী ১/১৩৩, ইব্ন মাজাহ ১/১৪৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন।

কিভাবে উযূ করতে হবে

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) উযূ করলেন এবং হাতভর্তি পানি নিয়ে কুলি করলেন এবং নাক পরিস্কার করলেন। অতঃপর তিনি দুই হাতে পানি নিলেন এবং মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি হাতভর্তি পানি নিয়ে তার ডান হাত ধৌত করলেন, অতঃপর একইভাবে তিনি তার বাম হাত ধৌত করলেন। এরপর তিনি মাথা মাসাহ করলেন। এরপর তিনি হাতপূর্ণ পানি নিয়ে ডান পা ধুইলেন। অতঃপর একইভাবে তিনি বাম পা ধৌত করলেন। সর্বশেষে তিনি বললেন : এভাবেই আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উযূ করতে দেখেছি। (আহমাদ ১/২৬৮) ইমাম

বুখারীও (রহঃ) তার গ্রন্থে হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ১/২৯০)
আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَأَيَّدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ তোমাদের হাতসমূহ কনুইসহ ধৌত কর। আল্লাহ
তা‘আলা ‘ইলা’ শব্দটি অন্য এক আয়াতে যেমন বর্ণনা করেছেন :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

এবং তোমাদের ধন সম্পত্তির সাথে তাদের ধন সম্পত্তি মিশ্রিত করে ভোগ
করনা; নিশ্চয়ই এটা গুরুতর অপরাধ। (সূরা নিসা, ৪ : ২)

এ মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, উযু করতে গিয়ে হাত ধৌত করার সময় যেন
কনুইসহ উর্ধ্ব বাহুরও কিছু অংশ ধৌত করা হয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম
মুসলিম (রহঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কিয়ামাত দিবসে আমার উম্মাতদেরকে এই বলে
ডাকা হবে ‘আলোর বিচ্ছুরণে বিচ্ছুরিত অংগ প্রত্যংগের অধিকারী হে ঐ
লোকসকল!’ ইহা উযু করার কারণেই হবে। অতএব তোমরা যে চাও সে তার
শরীরে আলোর বিচ্ছুরণের অংশ বৃদ্ধি করে নাও। (ফাতহুল বারী ১/২৮৩, মুসলিম
১/২১৬) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি
বলেন, আমার বন্ধু (রাসূল সাঃ) বলেছেন : মু‘মিনদের শরীরের ঐ সমস্ত অংশ
আলোকিত হবে যেখানে যেখানে উযূর পানি পৌছে। (মুসলিম ১/২১৯) আল্লাহ
তা‘আলা বলেন :

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ মাথা মাসাহ কর। আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ ইব্ন
‘আসিম (রাঃ) নামক সাহাবীকে একটি লোক বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
ওয়া সাল্লাম কিভাবে উযু করেছেন তা কি আপনি উযু করে আমাদেরকে দেখিয়ে
দিবেন? তখন আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ (রাঃ) পানি চাইলেন এবং হাত দু’টি দু’বার
করে ধুইলেন। তারপর তিনবার কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। এরপর
মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করলেন। তারপর কনুই পর্যন্ত হাত দু’টি দু’বার
ধুইলেন। অতঃপর দু’হাত দিয়ে মাথা মাসাহ করলেন, মাথার প্রথম অংশ থেকে
শুরু করে গ্রীবা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তারপর সেখান থেকে আবার সম্মুখে ফিরিয়ে
আনেন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন। তারপর পা দু’টি ধৌত করলেন।
(ফাতহুল বারী ১/৩৪৭, মুসলিম ১/২১০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া
সাল্লামের উযূর নিয়ম আলী (রাঃ) হতেও আবদু খাইর (রাঃ) থেকে এ রকমই

বর্ণিত আছে। (আবু দাউদ ১/৮২) সুনান আবু দাউদে মু'আবিয়া (রাঃ) এবং মিকদাদ (রাঃ) হতেও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উযু সম্পর্কে এরূপই বর্ণিত রয়েছে। (আবু দাউদ ১/৮৮, ৮৯) এ হাদীসগুলি হচ্ছে সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফার্য হওয়ার দলীল।

আবদুর রায্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, হামরান ইব্ন আবান (রহঃ) বলেছেন : আমি উসমান ইব্ন আফফানকে (রাঃ) উযু করতে দেখেছি। উসমান ইব্ন আফফান (রাঃ) উযু করতে বসে দু'হাতের উপর তিনবার পানি ঢালেন ও হাত দু'টি তিনবার ধৌত করেন, তারপর কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। এরপর হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন, প্রথমে ডান হাত এবং পরে বাম হাত। তারপর মাথা মাসাহ করেন। এরপর তিনবার করে পা দু'টি ধৌত করেন। অতঃপর উসমান (রাঃ) বললেন : আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবে উযু করতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন : যদি কেহ আমার মত (এভাবে) উযু করে এবং এরপর দু'রাক আত সালাত আদায় করে এবং সালাত আদায় করার সময় অন্য কোন চিন্তা-ভাবনা না করে তাহলে তার পূর্বের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (আবদুর রায্যাক ১/৪৪, ফাতহুল বারী ১/৩১১, মুসলিম ১/২০৫) ইমাম আবু দাউদ একবার মাথা মাসাহ করার কথা বলেছেন। (আবু দাউদ ১/৮০, ৮২)

পা ধৌত করার প্রয়োজনীয়তা

وُجُوهَكُمْ كَمَا لَا أَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ অর্থ হচ্ছে পায়ের টাখনু পর্যন্ত। কে لَا অর্থ হচ্ছে পায়ের টাখনু পর্যন্ত। وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ এর উপর عَطْف করে نَصَب পড়া হয়েছে এবং এভাবে ধৌত করার দিকে ফিরোনো হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এরূপভাবেই পাঠ করতেন। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এটাই করতেন। উরওয়া (রহঃ), 'আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইবরাহীম (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং ইবরাহীম তাইমীও (রহঃ) অনুরূপ উক্তি করেছেন। (তাবারী ১০/৫৪-৫৭) আর সুস্পষ্ট কথা এটাই যে, পা ধুইতেই হবে। পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনেরও এটাই নির্দেশ যে, পা ধুইতেই হবে। এখান থেকেই সালাফগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সম্পূর্ণ পা'ই ধৌত করতে হবে, শুধু পায়ের উপরের অংশ মুছে নিলে হবেনা। একমাত্র ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি উযুতে তরতীব বা ক্রমান্বয়ে করাকে শর্ত মনে করতেননা। তার মতে : যদি কেহ প্রথমে পা ধুইয়ে

নেয়, এরপর মাথা মাসাহ করে, তারপর হাত ধৌত করে, অতঃপর মুখমণ্ডল ধৌত করে তবুও জাযিয় হবে।

পা ধৌত করার ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস

আমীরুল মু‘মিনীন উসমান ইব্ন আফ্ফান (রাঃ), আমীরুল মু‘মিনীন আলী ইব্ন আবী তালিব (রাঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুআবিয়া (রাঃ) এবং মিকদাদ ইব্ন মা‘দীকারবের (রাঃ) বর্ণনাগুলি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উযু করার সময় স্বীয় পদদ্বয় একবার, দু’বার বা তিনবার ধুয়েছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন। যখন তিনি আগমন করেন তখন আমরা তাড়াতাড়ি উযু করছিলাম। আমরা তাড়াহুড়া করে আমাদের পাগুলি স্পর্শ করা শুরু করে দেই। সেই সময় তিনি খুবই উচ্চৈঃস্বরে বললেন : ‘উযু পূরাপুরিভাবে সম্পন্ন কর। আগুন থেকে তোমাদের পায়ের গোড়ালিকে রক্ষা কর।’ (ফাতহুল বারী ১/৩১৯, ৩২১; মুসলিম ১/২১৪, ২১৫) অন্য একটি হাদীসে আছে : ‘আগুন থেকে তোমাদের পায়ের গোড়ালি ও পায়ের তলা রক্ষা কর।’ (বাইহাকী ১/৭০, হাকিম ১/১৬২) ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে উযু করতে দেখতে পান যার পায়ের নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছেনি, বরং শুষ্ক রয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : ‘তুমি ফিরে যাও এবং ভালভাবে উযু করে এসো।’ (মুসলিম ১/২১৫) ইমাম বায়হাকীও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ১/৭০)

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ) খালিদ ইব্ন মি‘দানের (রহঃ) মাধ্যমে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন একজন স্ত্রী হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একজন লোককে দেখতে পান যার পায়ের গোড়ালির উপরিভাগের এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা শুষ্ক রয়ে গিয়েছিল, সেখানে পানি পৌঁছেনি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পুনরায় উযু করার নির্দেশ দেন। (আহমাদ ৩/৪২৪, আবু দাউদ

১/১২১) কিন্তু তিনি صَلَوة বা সালাত শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। এ ইসনাদটি উত্তম, মযবুত ও বিশুদ্ধ। আল্লাহই ভাল জানেন।

আঙ্গুলের মধ্যস্থিত অংশগুলিও পরিষ্কার করা প্রয়োজন

উসমান (রাঃ) হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উযূর যে নিয়ম বর্ণিত হয়েছে তাতে এও রয়েছে যে, তিনি আঙ্গুলগুলি খিলালও করেছিলেন। (মাজমাওউয যাওয়ায়িদ ১/২৩৫) সুনান গ্রন্থসমূহে রয়েছে যে, সাবরা’ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উযূ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : ‘উযূ পূর্ণভাবে ও উত্তমরূপে কর, আঙ্গুলগুলির মধ্যে খিলাল কর এবং নাকে উত্তমরূপে পানি দাও। তবে যদি সিয়াম অবস্থায় থাক তাহলে অন্য কথা।’ (আবু দাউদ ১/৯৯, তিরমিযী ১/১৪৯, নাসাই ১/৭৯, ইব্ন মাজাহ ১/১৪২)

চামড়ার মোজার উপর মাসাহ করা একটি গৃহীত সুন্নাহ

মুসনাদ আহমাদে আউস ইব্ন আবী আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : ‘আমি দেখছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উযূ করেন এবং স্বীয় চামড়ার মোজার উপর মাসাহ করেন। তারপর সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হন।’ (আহমাদ ৪/৮) ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এ হাদীসটি আউস ইব্ন আবী আউস (রাঃ) মারফত বর্ণনা করেন : আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়ার পর তিনি উযূ করলেন এবং মোজা ও পায়ের উপর মাসাহ করলেন। (আবু দাউদ ১/১১৩)

মুসনাদ আহমাদে জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : ‘সূরা মায়িদাহ অবতীর্ণ হওয়ার পরই আমি মুসলিম হই। আমার ইসলাম গ্রহণের পরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মোজার উপর মাসাহ করতে দেখেছি।’ (আহমাদ ৪/৩৬৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হাম্মাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, জারীর (রাঃ) প্রস্তাব করেন, তারপর উযূ করেন এবং মোজার উপর মাসাহ করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল : আপনি কি এরূপই করে থাকেন? তিনি উত্তরে বললেন : ‘হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপই করতে দেখেছি।’ আমাশ (রহঃ) মন্তব্য করেন : হাদীসের বর্ণনাকারী ইবরাহীম (রহঃ) বলেন যে, জনগণের কাছে এ হাদীসটি খুবই ভাল লাগত। কেননা জারীরের ইসলাম গ্রহণ সূরা মায়িদাহ অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা ছিল।

(ফাতহুল বারী ১/৫৮৯, মুসলিম ১/২২৮) আহকামের বড় বড় কিতাবগুলিতে ধারাবাহিকতার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজের দ্বারা মোজার উপর মাসাহ সাব্যস্ত রয়েছে।

রোগগ্রস্ত অবস্থায় অথবা পানি পাওয়া না গেলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে হবে

এবার তায়াম্মুমের নিয়মের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ

وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ কিম্বা যদি রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ পায়খানা হতে ফিরে আস কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (স্ত্রী-সহবাস কর), অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, তখন তোমরা তা দ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসাহ কর।

এর পূর্ণ তাফসীর সূরা নিসায় হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আয়াতে তায়াম্মুমের শানে নযূলও সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কিম্বা হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে একটি বিশেষ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি নিম্নে দেয়া হল :

উম্মুল মু‘মিনীন আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার গলার হারটি ‘বাইদা’ নামক স্থানে পড়ে যায়। আমরা মাদীনায় প্রবেশকারী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সওয়ারীটি থামিয়ে দেন এবং আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। ইত্যবসরে আমার পিতা আবু বাকর (রাঃ) আমার নিকট আগমন করেন এবং আমাকে তিরস্কারের সুরে বলেন : ‘তুমি হার হারিয়ে ফেলে লোকদেরকে থামিয়ে দিয়েছ?’ এ কথা বলে তিনি আমাকে তার হাত দিয়ে আমার পাজরে আঘাত করেন যার ফলে আমার কষ্টবোধ হয়। কিম্বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে মনে করে আমি নড়াচড়া করা হতে বিরত থাকি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেগে ওঠেন এবং ইতোমধ্যে ফাজরের সালাতের সময় হয়ে যায়। সুতরাং তিনি পানির খোঁজ করেন। কিম্বা পানি পাওয়া গেলনা। সেই সময় এ পূর্ণ আয়াতটি

অবতীর্ণ হয়। তখন উসাইদ ইব্ন হুযাইর (রাঃ) বলে ওঠেন : ‘হে আবু বাকরের (রাঃ) বংশধর, আল্লাহ জনগণের জন্য তোমাদেরকে কল্যাণময় বানিয়ে দিয়েছেন। তোমরা তাদের জন্য পূরাপুরি কল্যাণময় হয়ে গেলে।’ (ফাতহুল বারী ৮/১২১) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
সংকীর্ণতা ও অসুবিধায় ফেলতে চাননা। এ জন্যই তিনি দীনকে সহজ ও হালকা করে দিয়েছেন, কঠিন ও মুশকিল করেননি। হুকুমতো ছিল এই যে, তোমরা পানি দ্বারা উযু করবে। কিন্তু যদি পানি পাওয়া না যায় কিংবা তোমরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড় তাহলে তোমাদেরকে তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া হল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তায়াম্মুম করার সময় শুধু একবারই মাত্র মাটিতে হাত মারতে হবে, এরপর মুখমন্ডল এবং উভয় হাত মাসাহ করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
বরং
আল্লাহ চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তোমাদের উপর স্বীয় নি‘আমাত পরিপূর্ণ করতে, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। অর্থাৎ তাঁর প্রশস্ত আহকাম, কোমলতা, দয়া, সহজকরণ এবং অবকাশ দানের প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

উযু করার পর আল্লাহর কাছে দু‘আ চাওয়া

উযুর পরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দু‘আ শিক্ষা দিয়েছেন, তা যেন এ আয়াতেরই আওতাভুক্ত রয়েছে। মুসনাদ আহমাদ, সুনান এবং সহীহ মুসলিমে উকবা ইব্ন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : আমরা পালাত্রমে উট চরাতাম। আমি আমার পালার দিন রাতে ইশার সময় আগমন করে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে জনগণকে কিছু বলতে রয়েছেন। আমি যখন পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে শুনতে পেলাম :

‘যে মুসলিম ভালভাবে উযু করে আন্তরিকতার সাথে দু‘রাকআত সালাত আদায় করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।’ এ কথা শুনে আমি বললাম, বাহ! বাহ! এটা তো খুবই ভাল কথা। আমার এ কথা শুনে আমার সামনে উপবিষ্ট একজন সাথী বললেন : ‘এর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কথাটি বলেছিলেন তা এর চেয়েও অধিক উত্তম।’ আমি খুব গভীরভাবে লক্ষ্য

করে বুঝলাম যে, তিনি হচ্ছেন উমার ফারুক (রাঃ)। আমাকে তিনি বললেন, তুমি তো এখনই এলে। তোমার আসার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করার পর বলে :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে যায়, সে যেটা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আহমাদ ৪/১৫৩, মুসলিম ১/২০৯, আবু দাউদ ১/১১৮, নাসাঈ ১/৯২, ইব্ন মাজাহ ১/১৫৯)

উযু করার গুরুত্ব

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যখন কোন মুসলিম বা মু'মিন উযু করতে বসে, অতঃপর তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন পানির সাথে সাথে বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে সাথে তার চক্ষুদ্বয়ের সমুদয় পাপ ঝরে পড়ে। অনুরূপভাবে হাত ধোয়ার সময় হাতের সমুদয় পাপ এবং এভাবেই পা ধোয়ার সময় পায়ের সমুদয় পাপ পানির সাথে সাথে বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে সাথে ঝরে পড়ে। অবশেষে সে পাপসমূহ থেকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র হয়ে যায়।’

তাফসীর ইবন জারীরে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তার কান হতে, চোখ হতে, হাত হতে এবং পা হতে সমস্ত পাপ ঝরে পড়ে।’ (মুআত্তা ১/৩২, মুসলিম ১/২১৫) সহীহ মুসলিমে আবু মালিক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘উযু হচ্ছে অর্ধেক ঈমান। ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলার কারণে সাওয়াবের পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ‘সুবহানাল্লাহ’ ও ‘আল্লাহু আকবার’ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করে ফেলে। সিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ, ধৈর্য হচ্ছে জ্যোতি স্বরূপ এবং সাদাকাহ হচ্ছে দলীল স্বরূপ। কুরআন তোমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। প্রত্যেক লোক সকালে উঠেই স্বীয় প্রাণকে ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। অতঃপর সে ওকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে।’ (মুসলিম ১/২০৩) সহীহ মুসলিমে ইবন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে,

তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘হারাম সম্পদের সাদাকাহ আল্লাহ কবুল করেননা এবং উযু ছাড়া সালাতও কবুল করেননা।’ (মুসলিম ১/২০৪)

৭। আর তোমরা তোমাদের প্রতি বর্ষিত আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর এবং তাঁর ঐ অঙ্গীকারকেও স্মরণ কর, যে অঙ্গীকার তিনি তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তোমরা বলেছিলে, আমরা গুনলাম ও মেনে নিলাম। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের কথাগুলিরও পূর্ণ খবর রাখেন।

۷. وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

৮। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে বিধানসমূহ পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠাকারী ও ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হয়ে যাও, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার করবেনা। তোমরা ন্যায় বিচার কর, এটা আল্লাহ-ভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

۸. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ ۭ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۚ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

<p>৯। যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে তাদেরকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্য ক্ষমা ও মহান পুরস্কার রয়েছে।</p>	<p>۹. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ</p>
<p>১০। পক্ষান্তরে যারা কুফরী করেছে এবং আমার বিধানসমূহকে মিথ্যা জেনেছে তারাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী।</p>	<p>۱۰. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ</p>
<p>১১। হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি যে আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে তা স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় এই চিন্তায় ছিল যে, তোমাদের দিকে তাদের হস্ত প্রসারিত করবে, কিন্তু আল্লাহ তাদের হাতকে তোমাদের দিক থেকে থামিয়ে দিয়েছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং মু'মিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।</p>	<p>۱۱. يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هُمْ قَوْمٌ اَن يَّبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ</p>

মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ যে ইহসান করেছেন

এ বিরাট ধর্ম এবং এ মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের উপর যে ইহসান করেছেন সেটাই তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। আর সেই অঙ্গীকারের উপর দৃঢ় থাকার জন্য তাদেরকে

হিদায়াত করছেন, যে অঙ্গীকার মুসলিমরা করেছিল, তারা আল্লাহর রাসূলের অনুগত হবে, তাঁকে সর্ব প্রকারের সাহায্য করবে, দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, নিজেরা তা কবুল করবে এবং অপরের নিকটও তা পৌঁছে দিবে। ইসলাম গ্রহণের সময় প্রতিটি মু'মিন স্বীয় বাইআতে উক্ত জিনিসগুলি স্বীকার করত। সাহাবায়ে কিরাম নিম্নলিখিত ভাষায় বলেছিলেন : 'আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাইআত গ্রহণ করছি যে, আমরা শুনতে থাকব, মানতে থাকব। আমাদের মনের চাহিদা হোক বা না-ই হোক অথবা অন্যদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য দেয়া হোক না কেন। কোন যোগ্য লোকের নিকট থেকে আমরা কোন কাজ ছিনিয়ে নিবনা।' আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ

مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহতে ঈমান আনছনা? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি আহ্বান করছে এবং আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, অবশ্য তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ৮) এটাও বলা হয়েছে যে, এ আয়াতে (৫ : ৭) ইয়াহুদীদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকারের কথা দিয়েছ, এরপরেও তাঁকে মান্য না করার কি কারণ থাকতে পারে? সর্বাবস্থায় মানুষের আল্লাহকে ভয় করা উচিত। তিনি অন্তরের গোপনীয় কথাও পূর্ণভাবে অবগত রয়েছেন।

ইনসাফ বা ন্যায বিচারের প্রয়োজনীয়তা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ

লোকদেরকে দেখানোর জন্য নয়, বরং আল্লাহর জন্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং ইনসাফের সাথে সঠিক সাক্ষী হয়ে যাও। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে নু'মান ইব্ন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার পিতা আমাকে একটি উপহার দিয়েছিলেন। তখন আমার মা উমরাহ বিনতে রাওয়াহা (রাঃ) বলেন : 'আমি এ পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারিনা যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এর উপর সাক্ষী বানানো হয়।' এ কথা শুনে আমার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা

করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেন : ‘তোমার অন্যান্য সন্তানদেরকেও কি এরূপ দান করেছ?’ আমার পিতা উত্তরে বললেন : ‘না।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন : ‘আল্লাহকে ভয় কর এবং স্বীয় সন্তানদেরকে সমান চোখে দেখ। আমি কোন অত্যাচারের উপর সাক্ষী হতে পারিনা।’ আমার পিতা তখন ঐ দান আমার নিকট হতে ফিরিয়ে নেন। (ফাতহুল বারী ৫/২৫০, মুসলিম ৩/১২৪২) ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ اَلَّا تَعْدِلُوْا

তোমাদেরকে আদল ও ইনসাফের পথ থেকে সরিয়ে না দেয়। বন্ধু হোক বা শত্রু হোক, তোমাদের ইনসাফের পক্ষ অবলম্বন করা উচিত। এটাই হচ্ছে তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। কুরআন মাজীদে এ ধরনের আরও অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন নিম্নের এ আয়াতটিতে রয়েছে :

اَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقْرًا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا

সেদিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৪) আর যেমন সাহাবীয়াগণের কেহ কেহ উমারকে (রাঃ) বললেন : اَنْتَ اَفْظُ وَاَغْلَظُّ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে আপনি অনেক বেশি কঠোর ও কঠিন হৃদয়ের। অর্থাৎ আপনি অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনই কঠোর ছিলেননা। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

তিনি তোমাদের আমল সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি ভাল ও মন্দের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। তিনি মু‘মিনদের পাপ ক্ষমা করে তাদেরকে মহান পুরস্কার অর্থাৎ জান্নাত দান করার অঙ্গীকার করেছেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা এ রাহমাত একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহের ফলেই লাভ করবে, কিন্তু এ রাহমাতের প্রতি মনোযোগ দেয়ার কারণ হবে তাদের আমল। অতএব, প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকারের প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ এবং সব কিছুই তাঁরই অনুগ্রহ ও দয়া মাত্র। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ আল্লাহ তা‘আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি ন্যায় বিচারক, বিচক্ষণ এবং ন্যায়ানুগ। তিনি কখনও ভুল করেননা। কারণ তিনি হলেন মহাজ্ঞানী, মহাপরাক্রমশালী।

মু‘মিনদের প্রতি আল্লাহর মদদ এই যে, তিনি কাফিরদেরকে মু‘মিনদের উপর সামগ্রিক বিজয় দান করেননা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَن يَسْطُرُوا إِلَيْكُمْ أَيَّدِيهِمْ فَكَفَّ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা নিজের আর একটি নি‘আমাতের কথা মু‘মিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :

যাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কোন এক সফরে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি মানষিলে অবতরণ করেন। জনগণ বৃক্ষরাজির ছায়ায় বিচ্ছিন্নভাবে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হাতিয়ার একটি গাছে ঝুলিয়ে রাখেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে তাঁর তরবারীটি হাতে টেনে নিয়ে বলে, আপনাকে এখন আমার হাত থেকে কে বাঁচাতে পারে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘মহামহিমাম্বিত আল্লাহ (আমাকে বাঁচাবেন)।’ সে দ্বিতীয়বার এ প্রশ্নই করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় এ উত্তরই দিলেন। বেদুঈন তৃতীয়বার বলল, ‘আপনাকে আমা থেকে রক্ষা করবে কে?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘আল্লাহ।’ বর্ণনাকারী বলেন যে, এ কথা শোনার পর বেদুঈন তার হাত থেকে তরবারীটি ফেলে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে ডাক দিলেন। তাঁরা এসে গেলে তিনি তাঁদের কাছে বেদুঈনের ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। সে তখন তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি তাকে কোন শাস্তি দিলেননা। কাতাদাহ (রহঃ) মাঝে মাঝে এটি বর্ণনা করে বলতেন : কতগুলো লোক প্রতারণা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং তারাই ঐ বেদুঈনকে গুপ্ত ঘাতক হিসাবে তাঁর নিকট পাঠিয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের পরিকল্পনা এভাবে ব্যর্থ করে দেন। (আবদুর রায্যাক ১/১৮৫) সহীহ বুখারী থেকে জানা যায় যে, ঐ বেদুঈনের নাম ছিল গাওরাস ইব্ন হারিস। (বুখারী ৪১৩৫, ৪১৩৬, ৪১৩৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত

আছে যে, ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণকে হত্যা করার উদ্দেশে খাদ্যে বিষ মিশিয়ে তাদেরকে দা‘ওয়াত করে। কিন্তু মহান আল্লাহ এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দেন। সুতরাং তারা বেঁচে যান। এ কথাও বলা হয়েছে যে, কা‘ব ইব্ন আশরাফ এবং তার ইয়াহুদী সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে কষ্ট দিতে চেয়েছিল। এটা ঐ সময়ের ঘটনা, যখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমেরী লোকদের দিয়াত গ্রহণের জন্য তাদের নিকট গিয়েছিলেন। ঐ সময় বানী নাযীর গোত্রের দুষ্ট লোকেরা আমর ইব্ন জাহাশ ইব্ন কা‘বকে উত্তেজিত করে বলেছিল : ‘আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নীচে দাঁড় করিয়ে রেখে আলোচনায় লিপ্ত রাখব, এ সুযোগে তুমি উপর থেকে তাঁর উপর পাথর ফেলে দিয়ে তাঁকে দুনিয়া হতে বিদায় করে দিবে।’ কিন্তু মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পশ্চিমধ্যেই তাদের দুষ্টামির কথা জানিয়ে দেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণসহ সেখান হতে ফিরে আসেন। এ আয়াতে ঐ ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ يُدْفِنُونَ ۖ وَمَنْ يُنْفِئْهُ اللَّهُ فَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ

১২। আর আল্লাহ বানী ইসরাঈলদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমি তাদের মধ্য হতে বারো জন দলপতি নিযুক্ত করেছিলাম; এবং আল্লাহ বলেছিলেন : আমি তোমাদের সাথে রয়েছি, যদি তোমরা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত দিতে থাক এবং

۱۲. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ

আমার রাসূলদের উপর ঈমান আন ও তাদেরকে সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তমরূপে কৰ্জ দিতে থাক; তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপগুলি তোমাদের থেকে মুছে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করব যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, অনন্তর যে ব্যক্তি এরপরও কুফরী করবে, নিশ্চয়ই সে সোজা পথ থেকে দূরে সরে পড়ল।

وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَءَامَنْتُمْ
بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ
اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا تُكْفِرَنَّ
عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَلَا دَخَلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ
بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ
ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

১৩। বস্তুতঃ শুধু তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণেই আমি তাদেরকে অভিশপ্ত করলাম এবং অন্তরকে কঠোর করে দিলাম। তারা কালামকে (তাওরাত) ওর স্থানসমূহ হতে পরিবর্তন করে দেয় এবং তাদেরকে যা কিছু উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তার মধ্য হতে এক বড় অংশকে বিস্মৃত হতে বসেছে, আর আগামীতেও (অবিরত) তাদের কোন না কোন খিয়ানাতের

۱۳. فِيمَا نَقَضْتُم مِّيثَاقَهُمْ
لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً
تُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ
مَوَاضِعِهِ ۖ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا
ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ

সংবাদ তোমার নিকট আসতে থাকবে, তাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত। অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাক এবং তাদেরকে মার্জনা করতে থাক; নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচারী লোকদেরকে ভালবাসেন।

عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا
مِّنْهُمْ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

১৪। আর যারা বলে : ‘আমরা নাসারাহ,’ আমি তাদের নিকট থেকেও ওয়াদা নিয়েছিলাম, অনন্তর তাদেরকেও যা কিছু উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার মধ্য হতে তারা নিজেদের এক বড় অংশ বিস্মৃত হয়েছে। সুতরাং আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা সঞ্চার করে দিলাম কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত এবং অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সংবাদ দিবেন।

١٤. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا
إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ
فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا
بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا
كَانُوا يَصْنَعُونَ

ওয়াদা ভঙ্গ করায় আহলে কিতাবীদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে

উপরের আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মু‘মিন বান্দাদেরকে অঙ্গীকার পূরা করা, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্য দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সাথে সাথে প্রকাশ্য ও গোপনীয় নি‘আমাতগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এখন এ আয়াতগুলিতে তাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের নিকট হতে গ্রহণকৃত অঙ্গীকারের হাকীকাত ও অবস্থা বর্ণনা করছেন। তারপর তারা যখন আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তখন তিনি তাদের অন্তরকে হিদায়াত লাভ

এবং সত্য ধর্ম বিষয়ে কোন কিছু শোনা থেকে তালাবদ্ধ করে দেন (মোহর মেরে দেন)। ফলে তারা উপকারী জ্ঞান এবং সঠিক আমল করা থেকে বঞ্চিত হয়।

তাদের বারোজন সর্দার যারা তাদের নিকট বাইআত গ্রহণ করত যে, তারা যেন আল্লাহর এবং রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করে। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (রহঃ) এবং ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, মূসা (আঃ) যখন প্রবল শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে (ফিলিস্তিনে) যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন তখন এ ঘটনাটি ঘটে এবং আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে দলনেতা নিযুক্ত করার আদেশ করেছিলেন। (তাবারী ১০/১১৩)

আকাবায় বাইয়াত নেয়া আনসার নেতাগণের বর্ণনা

এটা স্মরণীয় বিষয় যে, লাইলাতুল আকাবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আনসারগণের নিকট হতে বাইআত গ্রহণ করেন সেই সময় তাঁদের সর্দারও বারজনই ছিলেন। আউস গোত্রের ছিলেন তিনজন। তাঁরা হলেন : (১) উসাইদ ইব্ন হুযায়ের (রাঃ), (২) সা'দ ইব্ন খাইসামাহ (রাঃ) এবং (৩) রিফাআ ইব্ন আবদুল মুনযির (রাঃ)। অন্য বর্ণনায় আবদুল হাইসাম ইব্ন তাইহান (রাঃ)-এর নাম রয়েছে। বাকী নয়জন সর্দার ছিলেন খায়রাজ গোত্রের মধ্য হতে। তারা হচ্ছেন : (১) আবু উমামাহ আসআদ ইব্ন যারারাহ (রাঃ), (২) সা'দ ইব্ন রাবী' (রাঃ), (৩) আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহাহ (রাঃ), (৪) রাফি ইব্ন মালিক ইব্ন আজলান (রাঃ), (৫) বারা ইব্ন মারর (রাঃ), (৬) উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ), (৭) সা'দ ইব্ন উবাদাহ (রাঃ), (৮) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম (রাঃ) এবং (৯) মুনযির ইব্ন উমার ইব্ন খুনাইস (রাঃ)। ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন, কবি কা'ব ইব্ন মালিক তার কবিতায় এ আনসারগণের নাম উল্লেখ করেছেন। (ইব্ন হিসাম ২/৮৬-৮৭) এ সর্দারগণ নিজ নিজ কাওমের পক্ষ থেকে শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে শ্রবণ করার ও মান্য করার বাইআত গ্রহণ করেন।

এখন ঐ আহাদ ও অঙ্গীকারের আলোচনা করা হচ্ছে যা আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। সেই অঙ্গীকার এই যে, তারা সালাত আদায় করবে, যাকাত দিবে, আল্লাহর রাসূলদের সত্যতা স্বীকার করবে, তাদের সাহায্য সহযোগিতা করবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে নিজেদের সম্পদ খরচ

করবে। তারা যদি এ সব কিছু পালন করে তাহলে আল্লাহর সাহায্য সহায়তা তাদের সাথে থাকবে, তাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা হবে এবং তাদের ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে।

ইয়াহুদীদের ওয়াদা ভঙ্গ করার পরিণাম

আল্লাহ বলেন : **فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ** পক্ষান্তরে তারা যদি এ অঙ্গীকারের পরও তা থেকে ফিরে যায় এবং গুণ্ডলি পালন না করে তাহলে অবশ্যই তারা সত্য পথ থেকে দূরে সরে পড়বে এবং বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। সুতরাং হলও তাই। **فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ** তারা অঙ্গীকার ভেঙ্গে দিল এবং ওয়াদা খেলাফ করল। তখন তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হল, তারা হিদায়াত থেকে দূরে সরে পড়ল, **وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً** তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, তারা ওয়াজ-নাসীহাতে মোটেই উপকৃত হলনা, তাদের বিবেক-বুদ্ধি বিগড়ে গেল, **يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ** আল্লাহর কথাকে তারা হেরফের করতে লাগল এবং ভুল ও মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে লাগল। কালামুল্লাহর প্রকৃত ভাবার্থ যা হবে তা পরিবর্তন করে অন্য ভাবার্থ বুঝাতে ও বুঝাতে লাগল এবং আল্লাহর নাম নিয়ে ঐ সব মাসআলা বর্ণনা করতে লাগল যা আল্লাহ বলেননি। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হচ্ছে :

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ তুমি তাদের ক্ষমা ও মার্জনা করতে থাক। তাদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা উত্তম হবে। সালাফগণের কেহ কেহ বলেছেন : 'যে ব্যক্তি তোমার সাথে আল্লাহর নাফরমানীমূলক ব্যবহার করে, তুমি তাকে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান কর।' এতে যৌক্তিকতা ও পরিণামদর্শিতা এই রয়েছে যে, ফলে সে হয়তো ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং আল্লাহ তাকে হিদায়াত নসীব করবেন। ইরশাদ হচ্ছে :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। অর্থাৎ যারা অপরের দুর্ব্যবহারকে ক্ষমা করে তার সাথে সৎ ব্যবহার করে, এরূপ লোককে আল্লাহ খুবই ভালবাসেন। কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেন যে, দুর্ব্যবহারকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার হুকুম জিহাদের নিম্নের আয়াত দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং কিয়ামাত দিনের প্রতিও না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক। (সূরা তাওবাহ, (৯ : ২৯) (তাবারী ১০/১৩৪)

খৃষ্টানরাও আল্লাহর প্রতি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং তাদের এ আচরণের পরিণাম

ঘোষণা করা হচ্ছে : وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ নিকট থেকেও আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম যে, তারা আমার প্রেরিত রাসূলের উপর ঈমান আনবে, তাঁকে সাহায্য করবে এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে। কিন্তু ইয়াহুদীদের মত তারাও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। এর শাস্তি স্বরূপ আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দিয়েছি এবং তা কিয়ামাত পর্যন্ত জারী থাকবে। তারা আজ দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদল অপর দলকে কাফির ও অভিশপ্ত বলছে এবং নিজেদের উপাসনালয়েও আসতে দেয়না। মালিকিয়াহ দল ইয়াকুবিয়াহ দলকে খোলাখুলিভাবে কাফির বলছে। তাদের এক গোত্রের লোকেরা অন্য গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে দুনিয়ায় ও আখিরাতে অবিশ্বাস ও ধর্ম ত্যাগ করার ব্যাপারে নালিশ করতে থাকবে যখন তাদেরকে স্বাক্ষী দেয়ার জন্য ডাকা হবে। এরূপ সমস্ত দলই করতে রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের

কৃতকর্ম সম্বন্ধে সংবাদ দিবেন। এ কথা দ্বারা খৃষ্টানদেরকে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। তারা মহান আল্লাহর স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করেছে (নাউয়ুবিল্লাহি মিন যালিক)। আল্লাহ তো হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয়, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন। আর তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ কেহই নেই।

১৫। হে আহলে কিতাব!
তোমাদের কাছে আমার রাসূল
এসেছে, তোমরা কিতাবের যে
সব বিষয় গোপন কর তন্মধ্যে

۱۵. يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ

হতে বহু বিষয় সে তোমাদের সামনে পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করে, আর বহু বিষয় (প্রকাশ করা) বর্জন করে, তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে এক আলোকময় বস্তু এসেছে এবং তা একটি স্পষ্ট কিতাব (কুরআন)।

جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ
كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ
اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

১৬। তা দ্বারা আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে শান্তির পন্থাসমূহ বলে দেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং তিনি তাদেরকে নিজ তাওফীকে (ও করুণায়) কুফরীর অন্ধকার থেকে বের করে (ঈমানের) আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং তাদেরকে সরল (সঠিক) পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

١٦. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ
رِضْوَانَهُ ۚ سُبُلَ السَّلَامِ
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

রাসূল (সাঃ) এবং কুরআনের মাধ্যমে হক (সত্য) প্রচার

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তিনি স্বীয় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিদায়াত ও দীনে হকসহ আরাব-অনারাব, শিক্ষিত-মূর্খ সমস্ত মাখলুকের নিকট পাঠিয়েছেন। মু‘জিয়া ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি তাঁকে দান করেছেন। যে কথাগুলো ইয়াহুদ ও নাসারা বদলে দিয়েছিল, ভুল ব্যাখ্যা করে অন্য অর্থ বানিয়ে নিয়েছিল, আল্লাহর সত্তার উপর অপবাদ দিয়েছিল, কিতাবুল্লাহর যে অংশটি তাদের জীবনের প্রতিকূল ছিল তা তারা গোপন করে দিয়েছিল, ঐ সব কিছুই এ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকাশ করে

দেন। তবে যেগুলি বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন নেই সেগুলি তিনি বর্ণনা করেননা। মুসতাদরাক হাকিম এচ্ছে রয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ব্যতিচারীকে রজম বা পাথর মেরে হত্যা করার মাসআলাকে অস্বীকার করল সে অজ্ঞতা বশতঃ কুরআন কারীমকে অস্বীকার করল। কেননা **يَا أَهْلَ**

الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ (৫ : ১৫) এ আয়াতে ঐ রজমকেই গোপন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ কুরআন কারীম সম্পর্কে বলেন :

يُنِيبُ তিনিই তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তাঁর এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা সত্য সন্ধানীদেরকে শান্তির পথ দেখিয়ে দেয়, লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসে এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করে। এ কিতাবের কারণে আল্লাহর নি'আমাতসমূহ লাভ করা এবং তাঁর শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়া খুবই সহজ। এটা ভ্রান্তিকে বিদূরিতকারী এবং হিদায়াতকে প্রকাশকারী।

১৭। অবশ্যই তারা কাফির যারা বলে : নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বয়ং হচ্ছেন মসীহ (ঈসা) ইবনে মারইয়াম! তুমি বল : যদি আল্লাহ মসীহ (ঈসা) ইবনু মারইয়ামকে ও তার মাতাকে এবং ভূ-পৃষ্ঠে যারা আছে তাদের সবাইকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন তাহলে এরূপ কে আছে যে তাদেরকে আল্লাহ হতে এতটুকু রক্ষা করতে পারে? আল্লাহরই কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট রয়েছে আকাশসমূহে ও যমীনে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত যাবতীয়

১৭. **لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ**
قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ
مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ
اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ
يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ
وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ

<p>কিছুর উপর; তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন, আর আল্লাহ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।</p>	<p>وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا^ع تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ^ع وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ</p>
<p>১৮। ইয়াহুদী ও নাসারাহু বলে : আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র। তুমি তাদের বলে দাও, আচ্ছা তাহলে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে কেন শাস্তি প্রদান করবেন? বরং তোমরাও অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় সাধারণ মানুষ মাত্র, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন, আর আল্লাহর কর্তৃত্ব রয়েছে আকাশসমূহে ও যমীনে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুতেও; আর সবাইকে আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।</p>	<p>١٨. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُ^ع قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ^ط بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ^ع وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا^ط وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ</p>

কুফরী এবং খৃষ্টানদের অবিশ্বাস

আল্লাহ তা‘আলা খৃষ্টানদের কুফরের কথা বর্ণনা করছেন যে, তারা আল্লাহরই সৃষ্টিকে তাঁরই সমান মর্যাদা প্রদান করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, খৃষ্টানরাও অবিশ্বাসী। কারণ তারা মারইয়াম তনয় ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ বলে সাব্যস্ত করেছে, অথচ সে আল্লাহর দাস বা বান্দা এবং তাঁরই সৃষ্ট জীব। তারা যে বিষয়ে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে তা হতে আল্লাহ তা‘আলা সম্পূর্ণ পবিত্র। আল্লাহ শির্ক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। সমস্ত কিছুই তাঁর অনুগত এবং প্রত্যেক বস্তুর উপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। সবকিছুর উপরই তাঁর আধিপত্য রয়েছে। এমন কেহ নেই যে তাঁকে তাঁর ইচ্ছা থেকে বিরত রাখতে পারে। যদি তিনি মাসীহকে (আঃ), তাঁর

মাকে এবং ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত সৃষ্টজীবকে ধ্বংস করে দেয়ার ইচ্ছা করেন তবুও কারও শক্তি নেই যে, তাঁর সামনে এগিয়ে আসে এবং তাঁকে বাধা প্রদান করে।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

বস্তুর উদ্ভাবক ও সৃষ্টিকর্তা তিনিই। সকলের মালিক ও অধিকর্তাও তিনিই। তিনি যা চান তাই করেন। কোন জিনিসই তাঁর ক্ষমতার বাইরে নেই। কেহই তাঁর কাজের কোন হিসাব নিতে পারেনা। তাঁর রাজত্ব ও সাম্রাজ্য খুবই প্রশস্ত। তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব খুবই উচ্চ। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, তিনি মহাকারীগর। তিনি যেভাবে চান সেভাবেই ভাঙেন ও গড়েন। তাঁর শক্তির কোন সীমা নেই। কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।

আল্লাহর সন্তান দাবী করায় ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি তিরস্কার

খৃষ্টানদের দাবী খণ্ডনের পর এখন ইয়াহুদী ও খৃষ্টান উভয়েরই দাবীকে আল্লাহ খণ্ডন করছেন। তারা আল্লাহর উপর একটা মিথ্যা আরোপ এভাবে করেছে যে, তারা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক) ও প্রিয় পাত্র। তারা নাবীগণের পুত্র এবং আল্লাহর আদরের সন্তান। তারা নিজেদের সৃষ্ট কিতাব থেকে নকল করে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা ইসরাঈলকে (ইয়াকুব (আঃ)) বলেছিলেন : اَنْتَ

اَبْنِيْ بَكْرِي 'অতঃপর তারা এর ভুল ব্যাখ্যা করে ভাবার্থ বদলে দিয়ে বলে : তিনি যখন আল্লাহর পুত্র হলেন তখন আমরাও তাঁর পুত্র ও প্রিয়পাত্র হলাম। অথচ তাদেরই মধ্যে যারা জ্ঞানী ও বিবেচক ছিলেন তারা ইসলাম কবুল করেন এবং ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের মিথ্যা দাবী প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে বলেন যে, এ শব্দগুলি দ্বারা ইসরাঈলের (আঃ) শুধু মর্যাদা ও সম্মানই প্রমাণিত হচ্ছে মাত্র। এর দ্বারা তাঁর আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার বা রক্তের সম্পর্ক কোনক্রমেই প্রতিষ্ঠিত হয়না। বরং এ বর্ণনার অর্থ হচ্ছে ইয়াকুব (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয়দের একজন। সুতরাং এ শব্দ শুধুমাত্র সম্মান ও মর্যাদার জন্যই ছিল, অন্য কিছুর জন্য ছিলনা। এ জন্যই যখন তারা (ইয়াহুদী/খৃষ্টানরা) বলে যে, তারা আল্লাহর সন্তান এবং পছন্দনীয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এ দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন : فَلَمْ يَعْزِبْكُمْ بِذُنُوبِكُمْ যদি এটা ঠিকই হয় তাহলে তোমাদের কুফর ও মিথ্যা আরোপের কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি প্রদান করবেন কেন?

ইয়াহুদীদের কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন : **بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ**

অন্যান্য মানুষের মত তোমরাও মানুষই বটে। অন্যান্য লোকদের উপর তোমাদের কোনই প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপর মহাবিচারক এবং তিনিই হচ্ছেন তাদের মধ্যে সঠিক ফাইসালাকারী; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। তাঁর কোন হুকুমকেই কেহ প্রতিরোধ করতে পারেনা। তিনি অতি সত্ত্বরই বান্দাদের কৃতকর্মের হিসাব গ্রহণকারী। **وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا** যমীন, আসমান এবং এতদুভয়ের সমুদয় মাখলুক তাঁরই অধিকারে রয়েছে। সবকিছুরই প্রভু তিনিই। সমস্তই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনিই বান্দাদের ফাইসালা করবেন। তিনি অত্যাচারী নন, তিনি ন্যায় বিচারক। তিনি পুণ্যবানদেরকে শাস্তি এবং অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন।

১৯। হে আহলে কিতাব! রাসূলদের আগমন দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসেছে, যে তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে (আল্লাহর হুকুম) বলে দিচ্ছে, যেন তোমরা (কিয়ামাত দিনে) বলতে না পার যে, তোমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেনি। (এখন তো) তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী এসে গেছে, আর আল্লাহ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১৯. **يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে সম্বোধন করে বলছেন : আমি তোমাদের সকলের নিকট স্বীয় রাসূল পাঠিয়েছি যে শেষ নাবী, যার পরে

আর কোন নাবী বা রাসূল আসবেনা। দেখ, ঈসার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন রাসূলের আগমন ঘটেনি। এ সুদীর্ঘ সময়ের পরে এ নাবী আগমন করেছে। ঈসা (আঃ) এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সময়ের পার্থক্যের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। আবু উসমান আন নাহদী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই ব্যবধান হল ৬০০ বছর। (বাগাভী ২/২৩) ইমাম বুখারীও (রহঃ) সালমান ফারসী (রাঃ) হতে একই মতামত প্রকাশ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৭/৩২৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন যে, ঐ সময় ছিল ৫৬০ বছর। (বাগাভী ২/২৩) আর মা’মার (রহঃ) বলেছেন যে, ইহা ছিল ৫৪০ বছর। (আবদুর রায্যাক ১/১৮৬) আবার কেহ কেহ বলেছেন যে, ঐ সময় ছিল ৬২০ বছর। তবে বিভিন্ন বর্ণনার ভিতর যে সময়ের পার্থক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার ভিতর খুব একটা বৈপরীত্য নেই। যারা বলেছেন যে, তাদের মাঝে ব্যবধান ৬০০ বছর, তারা চান্দ্র মাসের হিসাবে বলেছেন। অপর দিকে অন্য মতামত প্রদানকারীগণ সূর্য মাসের হিসাব করে বলেছেন, যেহেতু প্রতি একশত বছরে চান্দ্র মাস ও সূর্য মাসের মধ্যে তিন বছরের পার্থক্য হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا

‘তারা তাদের গুহায় ছিল তিন শ’ বছর, আরও নয় বছর। (সূরা কাহফ, ১৮ : ২৫) সুতরাং সূর্য হিসাবে তাদের গর্তে অবস্থানের সময়কাল আহলে কিতাবের যা জানা ছিল তা ছিল তিনশ বছর। তার সাথে নয় বছর বাড়িয়ে দিয়ে চান্দ্র মাসের হিসাব পূর্ণ হয়ে গেল। এ আয়াতের দ্বারা জানা গেল যে, বানী ইসরাঈলের শেষ নাবী ঈসা (আঃ) হতে সাধারণভাবে বানী আদমের শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী সময়ে কোন নাবী আসেননি। সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘অন্যান্য লোকদের তুলনায় ঈসার (আঃ) সাথে আমার সম্পর্ক বেশি রয়েছে। কেননা আমার ও তাঁর মাঝে কোন নাবী নেই।’ (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) ঐ হাদীস দ্বারা আল-কুদাই এবং অন্যান্যদের ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে যারা মনে করে যে, এ দুই মর্যাদা সম্পন্ন নাবীর মাঝে আরও একজন নাবী ছিলেন, যার নাম খালিদ ইব্ন সিনান। শেষ নাবী আল্লাহর হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার বুকে ঐ সময় আগমন করেছেন যে সময় রাসূলগণের শিক্ষা লোপ পেয়েছিল, তাঁদের প্রদর্শিত পথ

নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছিল, দুনিয়া তাওহীদ বা একাত্মবাদকে ভুলে গিয়েছিল, স্থানে স্থানে মাখলূকের পূজা শুরু হয়েছিল, সূর্য, চন্দ্র ও মূর্তিপূজা চলছিল, আল্লাহর দীন বদলে গিয়েছিল, দীনের আলোর উপর কুফরীর অন্ধকার ছেয়ে গিয়েছিল, দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল, আদল ও ইনসাফ এমনকি মনুষ্যত্ব পর্যন্ত দুনিয়া হতে মুছে গিয়েছিল, মূর্থতা ও অজ্ঞতার শাসন চালু হয়েছিল এবং মুষ্টিমেয় ইয়াহুদী রাবী, খৃষ্টান পাদরী এবং সাবেষ্টেন সন্যাসী ছাড়া ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর নাম উচ্চারণকারী কেহ ছিলনা।

মুসনাদ আহমাদে আইয়ায ইব্ন হিম্মার আল মাজাশী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা খুৎবায় বলেন :

‘আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যা জাননা তা আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দেই। আল্লাহ আমাকে আজই জানিয়ে দিয়েছেন : আমি আমার বান্দাদেরকে যা কিছু দান করেছি তার সবই তাদের জন্য হালাল করেছি, আমি আমার সকল বান্দাকেই একাত্মবাদীরূপে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শাইতান তাদের কাছে এসে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে এবং আমার হালালকৃত বস্তু তাদের উপর হারাম করে দেয়। আর সে তাদেরকে বলে যে, তারা যেন কোন অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও আমার সাথে অংশীদার স্থাপন করে।’ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবীবাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন এবং সমস্ত আরাব ও আজমকে অপছন্দ করেছেন, শুধু বানী ইসরাঈলের কতক লোককে নয় যারা তাওহীদ বা একাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারপর তিনি আমাকে বলেছেন : আমি তোমাকে এজন্যই নাবী করে প্রেরণ করেছি যে, তোমাকে পরীক্ষা করব এবং তোমারই কারণে অন্যদেরকেও পরীক্ষা করে নিব। আমি তোমার উপর এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাকে পানিতে ধুইয়ে ফেলতে পারবেনা, যাকে তুমি ঘুমন্ত ও জাগ্রত সর্বাবস্থায় পাঠ করবে। অতঃপর আমার রাক্ব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন কুরাইশদের ধ্বংস করে ফেলি। আমি তখন বললাম : হে আল্লাহ! এরা তো আমার মাথায় আঘাত করে টুকরা টুকরা করে ফেলবে। তখন আমার রাক্ব আমাকে বলেন : আমি তাদেরকে বের করে দিব যেমন তারা তোমাকে বের করে দিয়েছে। তুমি তাদের সাথে যুদ্ধ কর, তোমাকে সাহায্য করা হবে। তুমি তাদের (সাহাবীগণের) জন্য খরচ কর, তোমার উপরও খরচ করা হবে। তুমি তাদের মুকাবিলায় সেনাবাহিনী প্রেরণ কর, আমি তার উপর আরও পাঁচগুণ সৈন্য প্রেরণ করব। তুমি অনুগতদেরকে নিয়ে অবাধ্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

জান্নাতী লোক তিন প্রকারের। (১) ন্যায্যপরায়ণ, সৎ ব্যবহারকারী ও দান খাইরাতকারী শাসক। (২) দয়ালু ব্যক্তি যিনি প্রত্যেক আত্মীয় ও মুসলিমের সাথে বিনয় ও নম্র ব্যবহার করে থাকেন। (৩) ঐ দরিদ্র দানশীল ব্যক্তি, যিনি দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও দান করেন, অথচ তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে রয়েছে। আর জাহান্নামী লোক পাঁচ প্রকারের। তারা হচ্ছে (১) ঐ সব দুর্বল লোক যাদের কোন ধর্ম নেই (২) তোমার মৃত্যুর পর তারা পারিবারিক কিংবা ধন-সম্পদের কারণে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হবেনা (৩) প্রবঞ্চক/প্রতারক, যারা কারও কাছে তা লুকানোরও চেষ্টা করবেনা, তারা সামান্য জিনিসের জন্যও তা করবে (৪) ঐ সমস্ত লোক যারা দিনে/রাতে মানুষকে, তোমাদের পরিবারকে এবং সম্পদের ব্যাপারে বাটপারী/ধাপ্লাবাজি করে (৫) এ ছাড়া তিনি কটাক্ষকারী, মিথ্যাবাদী এবং অশ্লীল ভাষীদের কথাও উল্লেখ করেছেন। (আহমাদ ৪/১৬২)

এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও সুনান নাসাঈতেও রয়েছে। এটা বলার উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের সময় ভূ-পৃষ্ঠে কোন সত্য ধর্ম বিদ্যমান ছিলনা। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে মানুষকে অন্ধকার ও ভ্রান্ত পথ থেকে বের করে আলো ও হিদায়াতের পথে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথে এনে দাঁড় করিয়ে দেন। তাদেরকে তিনি উজ্জ্বল ও স্পষ্ট শারীয়াত দান করেন :

يَا تَادِدُ الْوَقْتِ وَتَدْرِى الْمَوْتَ يَا تَادِدُ الْوَقْتِ وَتَدْرِى الْمَوْتَ يَا تَادِدُ الْوَقْتِ وَتَدْرِى الْمَوْتَ
কোন অবকাশ না থাকে এবং তারা এ কথা বলার সুযোগ না পায় যে, তাদের কাছে কোন নাবী-রাসূল আগমন করেননি এবং তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেননি ও জাহান্নাম হতে ভয় প্রদর্শন করেননি। ইমাম ইবন জারীর (রহঃ) وَاللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ এ আয়াতাতংশের অর্থ করেছেন, আল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হবে তাকেই আমি শান্তি দিতে সক্ষম, আর যারা আমাকে মেনে চলবে তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার। (তাবারী ১০/১৫৮)

২০। আর যখন মুসা স্বীয়
সম্প্রদায়কে বলল : হে
আমার সম্প্রদায়! তোমাদের
প্রতি আল্লাহর নি'আমাতকে
স্মরণ কর, যখন তিনি

٢٠. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
يَقَوْمِ أذكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

তোমাদের মধ্যে বহু নাবী সৃষ্টি করলেন, রাজ্যাধিপতি করলেন এবং তোমাদেরকে এমন বস্তুসমূহ দান করলেন যা বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেহকেও দান করেননি।

إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ
مُلُوكًا وَءَاتَاكُمْ مَّا لَمْ يُوْتِ
أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ

২১। হে আমার সম্প্রদায়! এই পুণ্য ভূমিতে প্রবেশ কর যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন, আর পিছনের দিকে ফিরে যেওনা, তাহলে তোমরা সম্পূর্ণ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

۲۱. يَنْقُومِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ
الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ
فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ

২২। তারা বলল : হে মুসা! সেখানে তো পরাক্রমশালী লোক রয়েছে। অতএব তারা যে পর্যন্ত সেখান হতে বের হয়ে না যায় সে পর্যন্ত আমরা সেখানে কখনো প্রবেশ করবনা। হ্যাঁ, যদি তারা সেখান হতে বেরিয়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা যেতে প্রস্তুত আছি।

۲۲. قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا
قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنْدْخُلُهَا
حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن
تَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ

২৩। সেই দুই ব্যক্তি (যারা আল্লাহকে ভয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন) বলল : তোমরা তাদের উপর

۲۳. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ
تَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا

২৪। তারা বলল : হে মুসা! নিশ্চয়ই আমরা কখনও সেখানে পা রাখবনা যে পর্যন্ত তারা সেখানে বিদ্যমান থাকে। অতএব আপনি ও আপনার রাব্ব (আল্লাহ) চলে যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব।	<p>۲۴. قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا ۖ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ</p>
২৫। মুসা বলল : হে আমার রাব্ব! আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর অধিকার রাখি, সুতরাং আপনি আমাদের উভয়ের এবং এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন।	<p>۲۵. قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۖ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ</p>
২৬। তিনি (আল্লাহ) বললেন : (তাহলে মীমাংসা এই যে) এই দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত এদের হস্তগত হবেনা, এ	<p>۲۶. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ۖ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي</p>

রূপেই তারা ভূ-পৃষ্ঠে উদভ্রান্ত
হয়ে ফিরবে, সুতরাং তুমি
অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য
(একটুও) বিষন্ন হয়োনা।

الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ

**মূসার (আঃ) অনুসারীদেরকে আল্লাহর নি‘আমাতসমূহ স্মরণ
করিয়ে দেয়া এবং পবিত্র ভূমিতে প্রবেশে ইয়াহুদীদের অস্বীকৃতি**

মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর নি‘আমাতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে
আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। এরই বর্ণনা দেয়া
হচ্ছে যে, মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেন :

يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ
সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ঐ নি‘আমাতের কথা স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদেরই
মধ্য হতে তোমাদের জন্য একের পর এক নাবী পাঠাতে রয়েছেন। বানী ইসরাঈল
হতে অনেক নাবী আগমন করেছেন যারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে দা‘ওয়াত
দিয়েছেন এবং তাঁর শাস্তির ব্যাপারে সাবধান করেছেন। তাদের মাঝের সর্বশেষ
নাবী ছিলেন ঈসা (আঃ)। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা ইসমাঈলের (আঃ) বংশ
থেকে মানব কল্যাণের জন্য নাবুওয়াতের ও রিসালাতের শেষ রত্ন হিসাবে
আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবী ও রাসূল
হিসাবে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন, যিনি হলেন সব সময়ের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

বলা হয়েছে, হে আমার কাওম! তোমরা আরও স্মরণ কর যে, মহান আল্লাহ
তোমাদেরকে বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে
বাদশাহ বানিয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাদেরকে খাদেম, স্ত্রী এবং ঘরবাড়ী
দান করেছেন। (আবদুর রায্যাক ১/১৮৭) তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, বানী
ইসরাঈলের মধ্যে কোন লোকের স্ত্রী, খাদেম ও ঘরবাড়ী থাকলেই তাকে বাদশাহ
বলা হত। (হাকিম ২/৩১২) কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি এই যে, বানী ইসরাঈলের
মধ্যেই প্রথম খাদেমদের প্রচলন হয়েছিল। (তাবারী ১০/১৬৩) একটি হাদীসে
আছে : ‘যে ব্যক্তির সকাল এমন অবস্থায় গুরু হল যে, তার শরীর সুস্থ, তার
প্রাণে শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে এবং সারাদিনের জন্য যথেষ্ট এমন পরিমাণ
খাবারও তার কাছে রয়েছে, সে যেন সারা দুনিয়ায় যা কিছু আছে তা সবই পেয়ে

গেছে।’ (তিরমিযী ৭/১১) সেই সময় যে গ্রীক, কিবতী ইত্যাদি ছিল তাদের চেয়ে এদেরকে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। আর আয়াতে রয়েছে : আমি বানী ইসরাঈলকে কিতাব, হিকমাত ও নাবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে সারা বিশ্বের উপর মর্যাদা দিয়েছিলাম। যখন বানী ইসরাঈল মুশরিকদের দেখাদেখি মূসাকে (আঃ) আল্লাহ বানাতে বলল তখন মূসা (আঃ) তাদেরকে উত্তরে বলেছিলেন :

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قَالَ أَعِزَّ اللَّهُ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ.

সে বলল : তোমরা একটি মূর্থ সম্প্রদায়। এই সব লোক যে কাজে লিপ্ত রয়েছে, তাতো ধ্বংস করা হবে, আর তারা যা করছে তা অমূলক ও বাতিল বিষয়। সে বলল : আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে তোমাদের জন্য অন্য মা'বুদের সন্ধান করব? অথচ তিনিই হলেন একমাত্র আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে বিশ্ব জগতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন! (সূরা আরাফ, ৭ : ১৩৮-১৪০) এর ভাবার্থ সব জায়গায় একই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বানী ইসরাঈলকে সেই যুগের সমস্ত মানুষের উপর ফাযীলাত দান করেছিলেন। কেননা এটাতো প্রমাণিত বিষয় যে, উম্মাতে মুহাম্মাদী তাদের অপেক্ষা সবদিক দিয়েই উত্তম। কেননা স্বয়ং কুরআন কারীমে ঘোষণা করা হচ্ছে :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

এভাবে আমি তোমাদেরকে আদর্শ জাতি করেছি, যেন তোমরা মানবগণের জন্য সাক্ষী হও। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৪৩) আল্লাহর কাছে অন্যান্য উম্মাতের তুলনায় উম্মাতে মুহাম্মাদীর কতখানি সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে তা সূরা আলে ইমরানের নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১০)

এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ ফাযীলাতে উম্মাতে মুহাম্মাদীকেও বানী ইসরাঈলদের মধ্যে शामिल করা হয়েছে। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, কোন

কোন ক্ষেত্রে যেমন ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ নামক খাদ্য অবতরণ করা, মেঘ দ্বারা ছায়া দান করা ইত্যাদি, যা ছিল সত্যিই অস্বাভাবিক ব্যাপার। তবে অধিকাংশ মুফাস্সিরের উক্তি ওটাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, তাদেরকে সেই সময়ের লোকদের উপর ফাযীলাত দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তাদের দাদা ইয়াকূবের (আঃ) যুগে বাইতুল মুকাদ্দাস প্রকৃতপক্ষে তাদেরই দখলে ছিল এবং যখন তারা সপরিবারে মিসরে ইউসুফের (আঃ) নিকট চলে গিয়েছিল তখন সেখানে আমালিকা জাতি তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন : ‘তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করবেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরায় তোমাদের দখলে এনে দিবেন।’ কিন্তু বানী ইসরাঈল ভীৰুতা প্রদর্শন করে মূসার (আঃ) কথা অমান্য করল। এরই শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে ‘তীহ’ মাইদানে উদ্ভিগ্ন অবস্থায় ৪০ বছর অবস্থান করতে হল।

‘যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন’ এর ভাবার্থ এই যে, বানী ইসরাঈলকে বলা হচ্ছে : তোমাদের পূর্বপুরুষ ইসরাঈলের (আঃ) সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ওয়াদা করেছিলেন যে, ঐ পুণ্যভূমি তিনি তাঁর পরবর্তী মু‘মিন সন্তানদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রদান করবেন। সুতরাং হে বানী ইসরাঈল! তোমরা যখন ওটাকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছ তখন তোমরা ধর্মত্যাগী হয়ে যেওনা। অর্থাৎ জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে থেকনা, তাহলে তোমরা ভীষণ ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবে। তারা তখন উত্তরে মূসাকে (আঃ) বলল :

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا

আপনি আমাদেরকে যে শহরে যেতে বলছেন এবং যে শহরবাসীদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন সেই সম্পর্কে আমাদের অভিমত এই যে, তারা যে খুব শক্তিশালী বীর পুরুষ তা আমাদের বেশ ভালভাবেই জানা আছে। সুতরাং আমরা তাদের সাথে মুকাবিলা করতে পারবনা। আর যে পর্যন্ত তারা ঐ শহরে বিদ্যমান থাকবে সে পর্যন্ত আমরা ওর মধ্যে প্রবেশ করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম থাকব। তবে তারা যদি সেখান থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে আমরা সেখানে প্রবেশ করব। এটা ছাড়া আপনার নির্দেশ পালন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

‘ইউশা’ এবং ‘কালিব’ এর সত্য ভাষণ

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أُنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا বানী ইসরাঈল যখন তাদের নাবী মূসাকে (আঃ) মানলনা বরং বেআদবী করল, তখন যে দু’ব্যক্তির উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ছিল তারা তাদেরকে বুঝাতে লাগলেন। তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় ছিল যে, বানী ইসরাঈলের শাইতানীর কারণে না জানি **يَحَابُونَ** শব্দের পরিবর্তে **يَخَافُونَ** শব্দ রয়েছে, যার ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, কাওমের মধ্যে ঐ দু’ব্যক্তির ইজ্জত ও সম্মান ছিল। একজনের নাম ছিল ইউশা’ ইব্ন নূন এবং অপরজনের নাম ছিল কালিব ইব্ন ইউফনা, যেমনটি ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আতিয়িয়াহ (রহঃ), সুদী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং সালাফগণ ও তাদের পরবর্তী বিজ্ঞজন বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১০/১৭৬-১৭৮)

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أُنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

সেই দুই ব্যক্তি বলল : তোমরা তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে (নগরের) দ্বারদেশ পর্যন্ত যাও, অনন্তর যখনই তোমরা দ্বারদেশে পা রাখবে তখনই জয় লাভ করবে; এবং তোমরা আল্লাহর উপরই নির্ভর কর, যদি তোমরা মু’মিন হও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ২৩) ঐ কাপুরুষের দল তখন তাদের প্রথম উত্তরকে আরও মযবুত করে বলল :

قَالُوا يَمْوَسَىٰ إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا ۖ فَادْهَبْ أَنتَ

وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

তারা বলল : হে মূসা! নিশ্চয়ই আমরা কখনও সেখানে পা রাখবনা যে পর্যন্ত তারা সেখানে বিদ্যমান থাকে। অতএব আপনি ও আপনার রাব্ব (আল্লাহ) চলে যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ২৪) মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) তাদের এই অবস্থা দেখে তাদেরকে অনেক বুঝালেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে বিনয়ও প্রকাশ করলেন। কিন্তু তারা কোনক্রমেই তাঁদের ডাকে সাড়া দিলনা।

সাহাবীগণের যথোপযুক্ত সাড়া প্রদান এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ

মুসার (আঃ) কাওম বানী ইসরাঈলের এই অবস্থাকে সামনে রেখে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কিরামের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। মাক্কার ৯০০ বা ১০০০ কাফির যখন তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গমন করল, তখন সেই কাফেলা তো অন্য পথ ধরে মাক্কার পথে রওয়ানা হয়ে গেল। কিন্তু তাদেরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গমনকারী কাফিরেরা (আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে) নিজেদের শক্তির দাপটের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষতি সাধন ব্যতীত মাক্কা ফিরে যাওয়া অপমানজনক মনে করে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে পদতলে পিষ্ট করার ইচ্ছায় আবু সুফিয়ানের বাহিনী মাদীনা অভিমুখে রওয়ানা হল। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এই অবস্থা অবগত হলেন তখন তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে সাহাবীগণের নিকট পরামর্শ চাইলেন। তারা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে নিজেদের জান, মাল এবং স্ত্রী-ছেলে-মেয়েকে রেখে দিয়ে বললেন : ‘আপনিই এসবের মালিক। আমরা সংখ্যাও দেখতে চাইনা, বিজয়ও দেখতে চাইনা, বরং আমরা চাই শুধু আপনার নির্দেশের প্রতি নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে।’ সর্বপ্রথম আবু বাকর (রাঃ) এ ধরনের বক্তব্য পেশ করলেন। তারপর মুহাজির সাহাবীগণের মধ্য থেকেও কয়েকজন এ প্রকারের ভাষণ দিলেন। এর পরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘হে মুসলিমগণ! আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন।’ এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল আনসারগণের আন্তরিক বাসনা অবগত হওয়া। তখন সা’দ ইব্ন মুআয (রাঃ) নামক আনসারী দাঁড়িয়ে বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মনে হয় আপনি আমাদের (আনসারগণের) মনের ইচ্ছা জানতে চাচ্ছেন। তাহলে শুনুন! যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন তাহলে আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আপনি দেখবেন যে, আমাদের মধ্যে একজনও এমন থাকবেনা যে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকবে। আপনি আত্মহের সাথে আমাদেরকে শত্রুর মুকাবিলার জন্য নিয়ে চলুন, আমরা যে যুদ্ধক্ষেত্রে ধৈর্যের সাথে স্থির পদে টিকে থাকি তা আপনি দেখতে পাবেন। আপনি জেনে নিবেন যে, আমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়াকে সত্য বলে জানি। আপনি আল্লাহর নাম নিয়ে

এগিয়ে চলুন। আমাদের বীরত্ব ও ধৈর্য দেখে ইনশাআল্লাহ আপনার চক্ষু ঠাণ্ডা হবে।' এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব খুশি হন এবং আনসারগণের এ কথা তাঁর কাছে খুবই ভাল মনে হয় (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)। (তাবারী ১৩/৩৯৯)

আবু বাকর ইবন মারদুয়াই (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে তাদের মতামত জানানোর ব্যাপারে মুসলিমদেরকে জিজ্ঞেস করেন। তখন উমার (রাঃ) যুদ্ধ শুরু করার ব্যাপারে তাদের সম্মতি ব্যক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার তাদের কাছ থেকে তাদের মতামত জানতে চান। তখন আনসারগণের একজন বললেন : ওহে আনসার ভাইয়েরা! রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কাছ থেকে মতামত জানতে চাচ্ছেন। তারা বললেন : বানী ইসরাঈলরা তাদের নাবী মূসাকে (আঃ) যেমনটি বলেছিল তেমনটি আমরা আপনাকে বলবনা যে, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا

فَاعِدُونِ অতএব আপনি ও আপনার রাক্ব (আল্লাহ) চলে যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব। যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আপনি যদি আমাদের উটসমূহকে সাথে নিয়ে আল-গিমাড (মাক্কার কাছে একটি জায়গা) গিয়ে যুদ্ধ করতে বলেন তাহলে আমরা তা'ই করব। ইমাম আহমাদ (রহঃ), নাসাঈ (রহঃ) এবং ইব্ন হিব্বান (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৩/১০৫, ৬/৩৩৪, ৭/১০৯)

মিকদাদ আনসারীও (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে এ কথাই বলেছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিকদাদের (রাঃ) এই কথায় খুবই খুশি হয়েছিলেন। (বুখারী ৪৬০৯)

আল্লাহর কাছে ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে মূসার (আঃ) অভিযোগ

মূসা (আঃ) বললেন : قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ

بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ হে আমার রাক্ব! আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর অধিকার রাখি, সুতরাং আপনি আমাদের উভয়ের এবং এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন। অর্থাৎ এ কথা শুনে মূসার (আঃ) তাঁর

উম্মাতের উপর ভীষণ রাগ হয় এবং তিনি অসম্ভব প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট এ প্রার্থনা জানান।

আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আমাদের ও তাদের মাঝে ফাইসালা করা। (তাবারী ১০/১৮৮) আলী ইব্ন আবী তালহাও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১০/১৮৯) যাহহাক (রহঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে বিচার করুন এবং আমাদের ও তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিন। (তাবারী ১০/১৮৯) অন্যান্য জ্ঞানীগণ মতামত প্রকাশ করেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তাদের ও আমাদের মাঝে পৃথক করে দিন।

ইয়াহুদীদেরকে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে

৪০ বছর পর্যন্ত আটকে রাখা হয়েছিল

মূসার (আঃ) সাথে একত্রে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করায় তিনি আল্লাহর কাছে বদ দু'আ করেন। মহান আল্লাহ তাঁর এ প্রার্থনা কবুল করলেন এবং বললেন :

فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ এরা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এখান থেকে বের হতে পারবেনা। তারা 'তীহ' মাইদানে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। কোনক্রমেই তারা এর সীমানার বাইরে যেতে পারবেনা। এখানে তারা কতগুলি বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক বিষয় অবলোকন করল। যেমন তাদের উপর মেঘ দ্বারা ছায়া দান, 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতরণ, তাদের কাছে বিদ্যমান একটি পাথর হতে পানি বের হওয়া ইত্যাদি। মূসা (আঃ) ঐ পাথরকে লাঠি দ্বারা আঘাত করা মাত্রই ওর মধ্য হতে বারোটি প্রস্রবণ বেরিয়ে পড়ল। প্রত্যেক গোত্রের দিকে একটি করে ঝরণা বয়ে যেতে লাগল। এ ছাড়াও বানী ইসরাঈল সেখানে আরও মু'জিযা দেখল। এখানে তাওরাত অবতীর্ণ হল, আল্লাহর আহকাম নাযিল হল ইত্যাদি। চল্লিশ বছর পর্যন্ত তারা উদ্ভিগ্নভাবে ঐ মাইদানেই ঘুরাফিরা করল এবং সেখান থেকে বের হবার কোন পথ পেলনা।

জেরুশালেম উদ্ধার

ঐ বছরগুলি অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইউশা ইব্ন নুন (আঃ) তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের সন্তানরাসহ বিভিন্ন পাহাড়ে যারা অবস্থান করছিল তাদেরকে নিয়ে কোন এক শুক্রবার জেরুশালেম শহর আক্রমণ করে এবং ঐ দিন বিকেলে তা দখল করেন।

কোন কোন মুফাসসির ‘সানাতান’ শব্দের উপর পূর্ণভাবে وَقَفَ করেন এবং আরাবায়ীনা সানাতান শব্দ দু’টিকে نَصَب এর অবস্থা মেনে থাকেন এবং বলেন যে, এর عامل হচ্ছে ইয়াতীহুনা ফিল আরদি শব্দগুলি। এ চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যে কয়জন বানী ইসরাঈল অবশিষ্ট ছিল তাদেরকে নিয়ে ইউশা (আঃ) বেরিয়ে পড়েন। অন্যান্য পাহাড় থেকেও বাকী বানী ইসরাঈল তাঁর সাথী হয়ে যায়। ইউশা (আঃ) বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ করেন। জুমু‘আর দিন আসরের পরে যখন বিজয়ের সময় উপস্থিত হয় তখন শত্রুদের পাগুলো অচল হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়। জুমু‘আর দিনের সূর্য ডুবে যাওয়ার পরে শাবাথ (শনিবার) শুরু হওয়ার ফলে ঐ দিন (শনিবার) আর যুদ্ধ করা যেতনা। এ জন্য আল্লাহর নাবী (ইউশা) বললেন : ‘হে সূর্য! তুমিও তো আল্লাহরই দাস। আর আমি তাঁরই অধীনস্থ দাস। হে আল্লাহ! একে আরও কিছুক্ষণ আটকে রাখুন।’ সুতরাং আল্লাহর নির্দেশক্রমে সূর্য থেমে গেল এবং তিনি যুদ্ধ করে বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করে নিলেন। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলার নির্দেশ হল : বানী ইসরাঈলকে বলে দাও যে, তারা যেন মাথা নত করে শহরের প্রবেশ দ্বার দিয়ে শহরে প্রবেশ করে এবং حِطَّة (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের পাপ ক্ষমা করুন!) বলে। কিন্তু তারা আল্লাহর এ হুকুমকে বদলে দিল এবং শরীরকে পিছনের দিক বাঁকা করে প্রবেশ করল আর মুখে فِي شِعْرَةٍ এ শব্দগুলি উচ্চারণ করতে থাকল। বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা বাকারায় বর্ণনা করা হয়েছে।

অপর এক বর্ণনায় এটুকু বেশি রয়েছে যে, বানী ইসরাঈল এ যুদ্ধে এত বেশি গানীমাতের মাল লাভ করেছিল যা তারা ইতোপূর্বে কখনও দেখেনি। আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশানুযায়ী ওগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য আগুনের পার্শ্বে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু ওগুলো আগুনে পুড়লনা। তখন ইউশা (আঃ) ১২ দলের ১২ জন নেতাকে ডেকে বললেন : ‘তোমাদের মধ্যে কেহ অবশ্যই এ সম্পদ থেকে কিছু চুরি করেছে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেক গোত্রের নেতা আমার নিকট এসে আমার হাতে হাত রাখ।’ তাই করা হল। একটি গোত্রের নেতার হাত নাবীর হাতের সাথে লেগে গেল। নাবী (ইউশা আঃ) বললেন : ‘এ খিয়ানাতের জিনিস তোমার নিকট রয়েছে, সুতরাং তুমি ওটা নিয়ে এসো।’ সে সোনার তৈরী গরুর একটি মাথা নিয়ে এলো যার চক্ষুগুলো ছিল ইয়াকুতের তৈরী এবং দাঁতগুলো ছিল

মুক্তার তৈরী। অন্য সম্পদের সাথে ওটিকেও যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হল তখন সমস্তই আগুনে পুড়ে গেল। ঐ যামানায় গানীমাতের মাল নিজেদের জন্য ব্যবহার করা জায়িয় ছিলনা।

মুসার প্রতি আল্লাহর সান্ত্বনা প্রদান

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন : **تَأْسَ عَلَى**

الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ তুমি তোমার অবাধ্য কাওম বানী ইসরাঈলের জন্য কোন দুঃখ করনা। তারা ঐ বিচারেরই যোগ্য।

সুতরাং এ ঘটনায় ইয়াহুদীদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং এতে তাদের বিরুদ্ধাচরণের ও দুষ্টামির বর্ণনা রয়েছে যে, আল্লাহর ঐ শত্রুরা বিপদের সময়ও তাঁর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকছেন। তারা রাসূলদের আনুগত্য স্বীকার করছেন। ও আল্লাহর পথে জিহাদ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। যে সম্মানিত রাসূলের সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ কথা বলেছিলেন তাঁর বিদ্যমানতায় তাঁর অঙ্গীকার ও আদেশের কোনই গুরুত্ব দিচ্ছেনা। দিন রাত তারা তাঁর মু'জিয়া দেখতে রয়েছে এবং ফির'আউনের ধ্বংস স্বচক্ষে দেখেছে, অথচ অল্প দিনও অতিবাহিত হয়নি এবং স্বয়ং সম্মানিত নাবী সঙ্গে রয়েছেন, তথাপি তারা ভীৰুতা ও কাপুরুষতাই প্রদর্শন করছে। তারা আল্লাহর নাবীর সাথে বে-আদবী করছে এবং স্পষ্টভাবে জবাব দিয়ে দিচ্ছে। তারা তো স্বচক্ষে দেখেছে যে, আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনের ন্যায় সাজ-সরঞ্জামপূর্ণ বাদশাহকেও তার সাজ-সরঞ্জাম, লোক-লস্কর ও প্রজাসহ ডুবিয়ে মেরেছেন! তথাপি তারা সেই আল্লাহর উপর ভরসা করে ঐ গ্রামবাসীর দিকে ধাবিত হচ্ছেনা এবং তাঁর হুকুম পালন করছেন। অথচ তারা তো ফির'আউনের দশ ভাগের একভাগও ছিলনা! ফলে তারা আল্লাহর ক্রোধে পতিত হচ্ছে। পৃথিবীর বুকে তাদের কাপুরুষতা প্রকাশ পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তাদের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা আরও বৃদ্ধি পাবে। তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র মনে করলেও তা ছিল প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহর রাহমাতের দৃষ্টি থেকে তারা বেরিয়ে পড়েছিল। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রকার শাস্তিতে তারা পতিত হয়েছিল। তাদেরকে শূকর ও বানরে পরিণত করা হয়েছিল। এখানে তারা চিরস্থায়ী অভিশাপে পতিত হয়ে পারলৌকিক স্থায়ী শাস্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। অতএব, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলাই হচ্ছে সমস্ত কল্যাণের চাবিকাঠি।

২৭। তুমি তাদেরকে (আহলে কিতাবীদেরকে) আদমের পুত্রদ্বয়ের (হাবীল ও কাবীলের) ঘটনা সঠিকভাবে পাঠ করে শুনিয়ে দাও; যখন তারা উভয়েই এক একটি কুরবানী উপস্থিত করল এবং তন্মধ্য হতে একজনের (হাবীলের) কুরবানী কবুল হল এবং অপরজনের কবুল হলনা। অপরজন বলতে লাগলো : আমি তোমাকে নিশ্চয়ই হত্যা করব; প্রথমজন বলল : আল্লাহ আল্লাহভীরুদের ‘আমলই কবুল করে থাকেন।

۲۷. وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

২৮। তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত প্রসারিত কর, তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে কখনও আমার হাত বাড়াবনা; আমি তো বিশ্ব জাহানের রাব্ব আল্লাহকে ভয় করি।

۲۸. لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ إِنَّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

২৯। আমি চাই যে, (আমার দ্বারা কোন পাপ না হোক) তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ সমস্তই নিজের মাথায় তুলে নাও; অনন্তর তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, অত্যাচারীদের শাস্তি এরূপই

۲۹. إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ

হাবীল ও কাবীল। বর্ণিত আছে, ঐ সময়টা ছিল দুনিয়ার প্রাথমিক অবস্থা। তাই সেই সময় একই উদরে দু’টি সন্তান জন্মগ্রহণ করত। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। তখন একটি গর্ভের ছেলের সাথে আর একটি গর্ভের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়া হত। হাবীলের যমজ বোন সুন্দরী ছিলনা, কিন্তু কাবীলের যমজ বোনটি সুন্দরী ছিল। সুতরাং কাবীল নিজের যমজ বোনকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল। আদম (আঃ) তাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন। শেষ পর্যন্ত ফাইসালা হল যে, তারা উভয়ে যেন আল্লাহর নামে কিছু কুরবানী করে। যার কুরবানী কবুল হবে, মেয়েটির সাথে তারই বিয়ে দেয়া হবে। হাবীলের কুরবানী কবুল হয়, যার বর্ণনা কুরআনুল হাকীমের এ আয়াতগুলিতে রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ‘আল্লাহ শুধু মুত্তাকীদের আমলই কবুল করে

থাকেন।’ ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন : আমি যদি নিশ্চিত হতাম যে, আল্লাহ তা’আলা অন্ততঃ আমার কোন ইবাদাত কবুল করেছেন তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে যা কিছু আছে তা থেকেও তা আমার জন্য উত্তম। কারণ আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা’আলা বলেন : আল্লাহ শুধু মুত্তাকীদের আমলই কবুল করে থাকেন। হাবীল বললেন :

لَنْ بَسَطَ إِلَيَّ يَدُكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي

لَنْ بَسَطَ إِلَيَّ يَدُكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত প্রসারিত কর তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে কখনও আমার হাত বাড়াবনা। আমি তো বিশ্বপ্রভু আল্লাহকে ভয় করি।’ আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন, শক্তিতে তো হাবিল তার ভাই অপেক্ষা উর্ধ্বে ছিলেন। তথাপি সততা, বিনয়, নম্রতা এবং তাকওয়ার কারণেই তিনি এ কথা বললেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘যখন দু’জন মুসলিম তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে (একে অপরকে হত্যা করার জন্য) তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী হবে।’ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা হত্যাকারীর ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু নিহত ব্যক্তি অপরাধী হবে কেন?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘কারণ এই যে, সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল।’ (ফাতহুল বারী ১৩/৩৫, মুসলিম ৪/২২১৪) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বাশার ইব্ন সাঈদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন বিদ্রোহীরা উসমানের

(রাঃ) বাড়ী অবরোধ করেছিল তখন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেছিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘অচিরেই হাদ্গামা লেগে যাবে, সেই সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে এবং চলমান ব্যক্তি দৌড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে।’ কোন একজন জিজ্ঞেস করলেন : ‘যদি কোন লোক আমার গৃহে প্রবেশ করে আমাকে হত্যা করতে ইচ্ছা করে (তাহলে আমি কি করব)?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘সে সময় তুমি আদমের পুত্রের মত হয়ে যাও।’ (আহমাদ ১/১৮৫) ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটিকে ‘হাসান’ আখ্যায়িত করেছেন। এ বিষয়ে আবু হুরাইরাহ (রাঃ), খাব্বাব ইবনুল আরাতি (রহঃ), আবু বাকর (রাঃ), ইবন মাসউদ (রাঃ) আবু ওয়াকিদ (রহঃ) এবং আবু মুসাও (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী ৬/৪৩৬)

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ আমি চাই যে, তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ সমস্তই নিজের ঘাড়ে তুলে নাও’ এ কথা হাবীল কাবীলকে বলেছিলেন। এর ভাবার্থ হচ্ছে, হে কাবীল! তুমি ইতোপূর্বে যে পাপ করেছ তা এবং এখন আমাকে হত্যা করার পাপ, এ সমস্তই নিয়ে তুমি কিয়ামাতের দিন উপস্থিত হবে এটাই আমি চাই। (তাবারী ১০/২১৫, ২১৬)

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ বাক্যের বিশুদ্ধতম অর্থ হচ্ছে, হে কাবীল! আমি চাই যে, তুমি নিজের পাপ এবং আমাকে হত্যা করার পাপ এ সমস্তই নিজের উপর নিয়ে নিবে। তোমার অন্যান্য পাপের সাথে এই একটি পাপও বেড়ে যাক। فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন : (এই উপদেশ সত্ত্বেও) তার প্রবৃত্তি তাকে স্বীয় ভ্রাতৃহত্যার প্রতি উদ্বুদ্ধ করল। সুতরাং সে তাকে হত্যা করেই ফেললো, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

কিভাবে হত্যা করা হয় কাবীলের তা জানা ছিলনা, তাই সে তাঁর গলা মোচড়াচ্ছিল। তখন শাইতান একটা জন্তুকে ধরে তার মাথাটি একটি পাথরের উপর রাখল। তারপর একটি পাথর সজোরে তার মাথায় মেরে দিল। তৎক্ষণাৎ জন্তুটি মারা গেল। এটা দেখে কাবীলও তার ভাইয়ের সাথে ঐরূপই করল। (তাবারী ৪/৫৩৬) আবদুল্লাহ ইব্ন ওআহাব (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা বলেছেন : হত্যা করার উদ্দেশ্যে কাবীল হাবীলকে ঝাপটে ধরল, ফলে সে মাটিতে পড়ে গেল এবং কাবীল

হাবীলের মাথা মোচড়াতে লাগল, কিন্তু সে জানতনা যে, কিভাবে তাকে হত্যা করা যেতে পারে। তখন অভিশপ্ত শাইতান তার কাছে এসে বলল : তুমি কি তাকে হত্যা করতে চাও? কাবীল বলল : হ্যাঁ। অভিশপ্ত ইবলীস তাকে বলল, ‘একটা পাথর নিয়ে এসো এবং তা দিয়ে তার মাথা খেতলে দাও।’ সে তাই করল। তখন সেই মালাউন দৌড়িয়ে হাওয়ার (আঃ) কাছে এসে বলল : ‘কাবীল হাবীলকে হত্যা করে ফেলেছে।’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ‘হত্যা কাকে বলে?’ সে উত্তরে বলল : ‘এখন সে না পানাহার করতে পারবে, না কথা বলতে পারবে এবং না নড়াচড়া করতে পারবে।’ তিনি তখন বললেন : ‘সম্ভবতঃ তার মৃত্যু হয়ে গেছে।’ সে বলল : ‘হ্যাঁ, এটাই মৃত্যু।’ তখন তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। ইতোমধ্যে আদম (আঃ) এসে পড়লেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : ‘ব্যাপার কি?’ কিন্তু শোকে-দুঃখে তার মুখে কোন কথা সরলনা। তিনি আরও দু’বার জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কোন উত্তর পেলেননা। তখন তিনি বললেন : ‘তাহলে তুমি তোমার কন্যাগণসহ হা-হুতাশ করতে থাক। আর আমি ও আমার পুত্রগণ এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।’ ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ কাবীল ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। সে দুনিয়া ও

আখিরাত দু’টিকেই নষ্ট করল। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয় তার খুনের বোঝা আদমের (আঃ) ঐ সন্তানের উপরই পতিত হয়। কেননা সে’ই সর্বপ্রথম ভূ-পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে রক্ত বইয়েছিল।’ (আহমাদ ১/৩৮৩) সহীহায়িন এবং সুনান গ্রন্থের লেখকদের মধ্যে আবু দাউদ (রহঃ) ছাড়া অন্যান্যরা এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ১২/১৯৮, মুসলিম ৩/১৩০৩, তিরমিযী ৭/৪৩৬, নাসাঈ ৬/৩৩৪, ইব্ন মাজাহ ২/৮৭৩) ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) প্রায়ই বলতেন : আদমের (আঃ) পুত্র কাবিল, যে তার ভাইকে হত্যা করেছিল সে হবে মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি শাস্তিপ্রাপ্ত। কাবিল তার ভাইকে হত্যা করার পূর্বে পৃথিবীতে কোন রক্তপাত ঘটেনি। কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত পৃথিবীতে যত রক্তপাত ঘটবে তার বোঝা তাকেও বহন করতে হবে। কারণ সে’ই প্রথম হত্যার সূচনা করেছিল। (তাবারী ১০/২১৯)

তাকে হত্যা করার পর কি করতে হবে, মৃতদেহ কিভাবে ঢাকতে হবে সে ব্যাপারে তার কিছুই জানা ছিলনা। তখন আল্লাহ তা‘আলা দু’টি কাক প্রেরণ করলেন যারা একে অপরের ভাই ছিল। তারা তার সামনে লড়তে লাগল। অবশেষে একে অপরকে মেরে ফেললো। তারপর জীবিত কাকটি একটি গর্ত খনন করল এবং মৃত কাকটিকে ওর মধ্যে রেখে দিয়ে মাটি চাপিয়ে দিল। অতঃপর কাকটিকে ঐরূপ করতে দেখে সে নিজেকে ভর্তসনা করে বলতে লাগল, **يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي** হায়! আমি এ কাকটির মত কাজও করতে পারলামনা।’ (তাবারী ১০/২২৫)

অতঃপর সে খুব লজ্জিত হল এবং অনুতাপ করতে থাকল! ওটা যেন শাস্তির উপরে শাস্তি ছিল।

অন্যায় হত্যাকারী এবং রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারীর জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি

হাদীসে এসেছে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যতগুলো পাপ এরই উপযুক্ত, আল্লাহ তা‘আলা তাকে দুনিয়ায়ও শাস্তি প্রদান করবেন এবং পরকালেও তার জন্য ভীষণ শাস্তি জমা রাখবেন; ওগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে আইন অমান্য করা এবং রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা।’ (আবু দাউদ ৫/২০৮) কাবীলের মধ্যে এ দু’টো পাপই জমা হয়েছিল।

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৫৬)

৩২। এ কারণেই আমি বানী ইসরাঈলের প্রতি এই নির্দেশ দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত, কিংবা তার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে কোন ফিতনা-ফাসাদ বিস্তার ব্যতীত, তাহলে সে যেন

. ۳۲. مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي

সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল; আর যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করল, সে যেন সমস্ত মানুষকে রক্ষা করল; আর তাদের (বানী ইসরাঈলের) কাছে আমার বহু রাসূলও স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন করেছিল, তবু এর পরেও তন্মধ্য হতে অনেকেই ভূ-পৃষ্ঠে সীমা লংঘনকারী হয়ে গেছে।

الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ
كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

৩৩। যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, আর ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা গুলে চড়ান হবে, অথবা এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে; এটা তো দুনিয়ায় তাদের জন্য ভীষণ অপমান, আর আখিরাতেও তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে।

۳۳. إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ
تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ
خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ
ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

৩৪। কিন্তু হ্যাঁ, তোমরা তাদেরকে খেফতার করার পূর্বে যারা তাওবাহ করে তাহলে জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

۳۴. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : ... كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ আদমের এ ছেলের অন্যায়ভাবে তার ভাইকে হত্যা করার কারণে আমি বানী ইসরাঈলকে পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছি, তাদের কিতাবে লিখে দিয়েছি এবং তাদের শারঈ হুকুম করে দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কেহকে বিনা কারণে হত্যা করল, (না সেই নিহত ব্যক্তি কেহকে হত্যা করেছিল, আর না সে ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি ছড়িয়েছিল) তাহলে সে যেন দুনিয়ার সমস্ত লোককেই হত্যা করল। وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا

أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন নির্দোষ লোককে হত্যা করা থেকে বিরত থাকল, ওটাকে হারাম জানল, তাহলে সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ বাঁচাল। আমীরুল মু'মিনীন উসমানকে (রাঃ) যখন বিদ্রোহীরা ঘিরে ফেলে, তখন আবু হুরাইরাহ (রাঃ) তার কাছে গিয়ে বলেন : 'হে আমীরুল মু'মিনীন। আমি আপনার পক্ষ হয়ে আপনার বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছি। এ কথা শুনে উসমান (রাঃ) বলেন : 'তুমি কি সমস্ত লোককে হত্যা করার প্রতি উত্তেজিত হয়েছ যাদের মধ্যে আমিও একজন?' আবু হুরাইরাহ (রাঃ) উত্তরে বললেন : 'না, না।' তখন তিনি বললেন : 'জেনে রেখ যে, তুমি যদি একজন লোককেই হত্যা কর তাহলে যেন তুমি সমস্ত লোককেই হত্যা করলে। যাও, ফিরে যাও। আমি চাই যে, আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করুন, পাপকাজে লিপ্ত না করুন।' এ কথা শুনে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) ফিরে গেলেন, যুদ্ধ করলেননা। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ মনে করে সে সমস্ত

লোকের ঘাতক। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে সে যেন সমস্ত লোকেরই প্রাণ রক্ষা করে। (তাবারী ১০/২৩৬) আল-ফাউফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) **فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا** সম্পর্কে বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা যে প্রাণ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন তা যদি কেহ হত্যা করে তাহলে সে যেন সমগ্র মানব জাতিকেই হত্যা করল। (তাবারী ১০/২৩৩) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের রক্তপাতে সাহায্য করল সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে রক্তপাত করার কাজে সহযোগিতা করল। আর যে কোন মুসলিমের রক্তপাত ঘটানো থেকে বাধা দিল সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে রক্তপাত ঘটানো থেকে বাধা দিল।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, কেহ কেহকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলেই সে জাহান্নামী হয়ে যায়। সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, কোন মু'মিনকে কোন শারঈ কারণ ছাড়াই হত্যাকারী জাহান্নামী, আল্লাহর দুশমন, অভিশপ্ত এবং শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। সুতরাং সে যদি সমস্ত লোককেও হত্যা করত তাহলে এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কি হত? যে ব্যক্তি হত্যা করা থেকে বিরত থাকল, তার পক্ষ থেকে যেন সবারই জীবন রক্ষা পেল। (তাবারী ১০/২৩৫)

যুল্মকারীদের প্রতি আল্লাহর সতর্কীকরণ

মহান আল্লাহ বলেন : **ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ** বানী ইসরাঈলের কাছে আমার বহু রাসূলও স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন করেছিল, তথাপিও তাদের মধ্য হতে অনেকেই ভূ-পৃষ্ঠে সীমালংঘনকারী হয়ে গেছে। যেমন ইয়াহুদী বানু কুরাইযা ও বানু নাযীর আউস ও খায়রাজ গোত্রদ্বয়ের সাথে মিলিত হয়ে একে অপরের সাথে যুদ্ধ করত। ঐ যুদ্ধের অবসান হওয়ার পর যে সমস্ত ইয়াহুদী বন্দী হত তাদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিত এবং যারা নিহত হত তাদের জন্য দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করা হত। তাদেরকে বুঝানোর উদ্দেশে আয়াত নাযিল করা হয় :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَحْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِينِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ

وَنُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيرِهِمْ تَبْطَهُرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتِوكُمُ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

এবং আমি যখন তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম যে, পরস্পর শোণিতপাত করবেনা এবং স্বীয় বাসস্থান হতে আপন ব্যক্তিদেরকে বহিস্কার করবেনা; অতঃপর তোমরা স্বীকৃত হয়েছিলে এবং তোমরাই ওর সাক্ষী ছিলে। অতঃপর সেই তোমরাই পরস্পর খুনাখুনি করছ এবং তোমরা তোমাদের মধ্য হতে এক দলকে তাদের গৃহ হতে বহিস্কার করে দিচ্ছ, তাদের বিরুদ্ধে (শত্রুতা বশতঃ) পাপ ও অন্যায় কাজে সাহায্য করছ এবং তারা বন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আনীত হলে তোমরা তাদেরকে বিনিময় প্রদান করছ, অথচ তাদেরকে বহিস্কার করা তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল, তাহলে কি তোমরা গ্রহের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের পার্থিব জীবনে দুর্গতি ব্যতীত কিছুই নেই এবং উত্থান দিবসে তারা কঠোর শাস্তির দিকে নিষ্ক্ষিপ্ত হবে এবং তোমরা যা করছ, তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন। (সূরা বাকারাহ, ২ : ৮৪-৮৫)

পৃথিবীতে অন্যায় সৃষ্টিকারীদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

এ আয়াতে مُحَارِبَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিরুদ্ধাচরণ করা এবং হুকুমের বিপরীত করা। এর ভাবার্থ হচ্ছে কুফরী করা, ডাকাতি করা, ব্যভিচার করা এবং ভূ-পৃষ্ঠে

বিভিন্ন প্রকারের অশান্তি সৃষ্টি করা। এমনকি পূর্ববর্তী অনেক মনীষী, যাদের মধ্যে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াবও (রহঃ) রয়েছেন, বলেন যে, রৌপ্যমুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রা অধিকার করে নেয়াও হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টি করার শামিল। এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। কেননা এতে এটাও আছে যে, কোন লোক যদি এ কাজগুলো করার পর মুসলিমদের হাতে ধ্রুফতার হওয়ার পূর্বেই তাওবাহ করে তাহলে তার কোন জবাবদিহি নেই। পক্ষান্তরে যদি কোন মুসলিম এমন কাজ করে এবং পলায়ন করে কাফিরদের নিকট চলে যায় তাহলে সে শারঈ হদ থেকে মুক্ত হবেনা। (তাবারী ১০/২৪৪) ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) ইকরিমাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) **إِنَّمَا**

جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন : এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে কেহ যদি মুসলিমদের হাতে পড়ার পূর্বে তাওবাহ করে তাহলে তার কৃতকর্মের দরুণ যে হুকুম তার উপর সাব্যস্ত হয়ে গেছে তা টলতে পারেনা। (আবু দাউদ ৪/৫৩৬, নাসাঈ ৭/১০১)

সঠিক কথা এই যে, যে কেহই এ কাজ করবে তারই ব্যাপারে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ‘উকল’ গোত্রের কতগুলো লোক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে এবং তাঁর কাছে ইসলামের বাইআত গ্রহণ করে। অতঃপর মাদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হওয়ায় তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এর অভিযোগ পেশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন : ‘তোমরা চাইলে আমাদের রাখালের সাথে চলে যাও, সেখানে উটের প্রস্রাব ও দুধ পান করার মাধ্যমে তোমাদের চিকিৎসা করা হবে।’ তারা বলল : ‘হ্যাঁ (আমরা যেতে চাই)।’ সুতরাং তারা বেরিয়ে পড়ল। অতঃপর তাদের রোগ সেরে গেল। তখন তারা রাখালকে মেরে ফেললো এবং উটগুলি হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি সাহাবায়ে কিরামকে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে ধরে আনার নির্দেশ দেন। অতএব তাদেরকে পাকড়াও করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে

পেশ করা হয়। তখন তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হয় এবং চোখে গরম শলাকা ভরে দেয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে রোদে ফেলে রাখা হয়, ফলে তারা ছটফট করে মৃত্যুবরণ করে। সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, ঐ লোকগুলো ছিল উকল গোত্রের কিংবা উরাইনা গোত্রের। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, ঐ লোকগুলোকে মাদীনার কাছে ‘হাররাহ’ নামক স্থানে রাখা হয়েছিল। পান করার জন্য পানি চাইলে তাদেরকে তা দেয়া হতনা। (ফাতহুল বারী ১২/১১৪, মুসলিম ৩/১২৯৬) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : মুসলিমদের দেশে যে লোক অস্ত্র ধারণ করে এবং চলার পথে লোকদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে, এমন লোককে ধৃত করার পর মুসলিম শাসকের অধিকার রয়েছে যে, হয় সে ঐ লোককে গদান কেটে হত্যা করবে অথবা শূলে চড়াবে অথবা তার হাত ও পা কেটে ফেলবে। (তাবারী ১০/২৬৩) সাদ ইব্নুল মুসাইয়িব (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন বলে ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১০/২৬২, ২৬৩) এ মতামত ব্যক্ত করার কারণ এই যে, আয়াতে ‘আও’ أَوْ শব্দটি ব্যবহার করে যে কোন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ تَحَكُّمٌ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَلِغَ

الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةً طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَٰلِكَ صِيَامًا

(অতঃপর নিরূপিত মূল্য দ্বারা) সেই বিনিময় গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু নেয়ায় স্বরূপ কা‘বা ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিবে, না হয় কাফফারা স্বরূপ (নিরূপিত মূল্যের খাদ্যদ্রব্য) মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে, অথবা এর সম পরিমাণ সিয়াম পালন করবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৯৫) তিনি আরও বলেন :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ

صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ

কিন্তু কেহ যদি তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয়, অথবা তার মস্তিষ্ক যন্ত্রনাগ্রস্ত হয় তাহলে সে সিয়াম কিংবা সাদাকাহ অথবা কুরবানী দ্বারা ওর বিনিময় করবে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৯৬)

فَكَفَّرْتُهُمْ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسَوْتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

সুতরাং ওর কাফফারা হচ্ছে দশজন অভাবগ্রস্তকে মধ্যম ধরণের খাদ্য প্রদান করা, যা তোমরা নিজ পরিবারের লোকদেরকে খাইয়ে থাক, কিংবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করা (মধ্যম ধরণের), কিংবা একজন গোলাম কিংবা বাঁদী মুক্ত করা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৮৯) এ সকল আয়াতে উপরের আয়াতটির মতই সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ অথবা ভূ-পৃষ্ঠ হতে বের করে দেয়া হবে। অর্থাৎ তাদেরকে অনুসন্ধান করে তাদের উপর হদ কায়েম করা হবে অথবা দারুল ইসলাম থেকে বের করে দেয়া হবে, যেন তারা অন্য কোথাযও চলে যায়। যেমনটি ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), যুহরী (রহঃ), লাইস ইব্ন সা'দ (রহঃ) এবং মালিক ইব্ন আনাস (রহঃ) থেকে ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। অন্যরা বলেন যে, তাদেরকে এক শহর থেকে অন্য কোন শহরে এবং সেই শহর থেকে আর এক শহরে পাঠিয়ে দেয়া হবে। অথবা ইসলামী রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণরূপেই বের করে দেয়া হবে। (তাবারী ১০/২৬৮-২৭০) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবু আশ শা'শাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যুহরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, তাকে শহর থেকে বের করে দেয়া হবে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বহিস্কার করা হবেনা। আল্লাহ বলেন :

ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ এটা তো দুনিয়ায় তাদের জন্য ভীষণ অপমান, আর আখিরাতেও তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে।' অর্থাৎ তাকে হত্যা করা অথবা শূলে চড়ানো কিংবা বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে ফেলা, দেশ থেকে বহিস্কার করা ইত্যাদি যে বিধান রয়েছে তাতো শুধু পৃথিবীতে মানবতার বিরুদ্ধে অন্যায় অপরাধ করার জন্য সাময়িক শাস্তি, পরকালে তার জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে আরও কঠোর আযাব।

আয়াতের এ অংশটি ঐ সব লোকের সমর্থন করছে যারা বলেন যে, এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলিমদের ব্যাপারে রয়েছে ঐ বিশুদ্ধ হাদীসটি যাতে বর্ণনাকারী উবাদা ইব্ন সামিত (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট থেকে ঐ অঙ্গীকারই গ্রহণ করেন যা তিনি মহিলাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তা হচ্ছে, আমরা যেন আল্লাহর সাথে শরীক না করি, চুরি না করি, ব্যভিচারে লিপ্ত না হই, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা না করি এবং একে অপরের প্রতি মিথ্যা আরোপ না করি। যারা এ অঙ্গীকার পূর্ণ করবে তাদের পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর দায়িত্বে। আর যারা এগুলোর মধ্যে কোন একটি পাপ কাজে লিপ্ত হবে এবং ওর শাস্তিও প্রাপ্ত হবে তাহলে সেটাই তার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহ সেটা গোপন করেন তাহলে তার সে বিষয়ের দায়িত্ব তাঁরই উপর থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন এবং ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন। (মুসলিম ৩/১৩৩৩) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘যে ব্যক্তি কোন পাপকাজ করল, অতঃপর তাকে শাস্তি দেয়া হল, তাহলে আল্লাহ যে তাকে পুনরায় শাস্তি দিবেন এ থেকে তাঁর আদল ও ইনসাফ বহু উর্ধ্বে। আর যে ব্যক্তি কোন পাপ করল, অতঃপর আল্লাহ তা গোপন করলেন এবং ক্ষমা করে দিলেন, তাহলে আল্লাহর করুণা এর বহু উর্ধ্বে যে, তিনি তাঁর বান্দার কোন পাপ ক্ষমা করে দেয়ার পর আবার ওর শাস্তি ফিরিয়ে আনবেন। (আহমাদ ১/১৫৯, তিরমিযী ৭/৩৭৭, ইব্ন মাজাহ ২/৮৬৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। হাফিয দারাকুতনীকে (রহঃ) এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, কয়েকটি বর্ণনার মাধ্যমে হাদীসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যোগসূত্র পাওয়া যায় এবং সাহাবীগণের মাধ্যমেও এ বর্ণনা পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যোগসূত্রে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা সহীহ। (দারাকুতনী ৩/২১৫)

**যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকেও
ক্ষমা করা হবে, যদি তারা তাওবাহ করে**

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ** এ আয়াতের ভাবার্থ ইহা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে **فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ**

যে, এটি কাফিরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কিন্তু যে মুসলিম বিদ্রোহী হবে এবং সে অধিকারে আসার পূর্বেই যদি তাওবাহ করে তাহলে তার উপর হত্যা, শূল এবং পা কেটে নেয়া তো প্রযোজ্য হবেইনা, এমনকি তার হাতও কাটা যাবে কি না এ ব্যাপারে আলেমদের দু'টি উক্তি রয়েছে। আয়াতের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা এটা জানা যাচ্ছে যে, সমস্ত শাস্তিই তার উপর থেকে উঠে যাবে। সাহাবীগণের আমলও এরই উপর রয়েছে। যেমন হারিশা ইব্ন বদর তামিমী বসরায় বসবাস করত এবং যমীনে ফাসাদ বা হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছিল। এ ব্যাপারে কয়েকজন কুরাইশী আলীর (রাঃ) নিকট তার ব্যাপারে সুপারিশ করেন, যাঁদের মধ্যে হাসান ইব্ন আলী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফরও (রাঃ) ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে নিরাপত্তা দান করতে অস্বীকার করেন। হারিশা ইব্ন বদর তখন সাঈদ ইব্ন কায়েস আল হামাদানীর (রাঃ) নিকট গমন করে। তিনি তাকে নিজের বাড়ীতে রেখে আলীর (রাঃ) নিকট গমন করেন এবং তাঁকে বলেন : আচ্ছা বলুন তো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করে, অতঃপর তিনি এ আয়াতগুলি **مَنْ قَبْلُ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ** পর্যন্ত পাঠ করেন। তখন আলী (রাঃ) বলেন : 'এরূপ ব্যক্তির জন্য তো আমি নিরাপত্তা দান করব।' সাঈদ (রাঃ) তখন বলেন : 'সে হচ্ছে হারিশা ইব্ন বদর।' (তাবারী ১০/২৮০)

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মুরাদ গোত্রের একটি লোক কুফার মাসজিদে কোন এক ফারয সালাতের পরে আবু মূসা আশআরীর (রাঃ) নিকট আগমন করে। সে সময় তিনি কুফার শাসনকর্তা ছিলেন। লোকটি এসে তাঁকে বলে : 'হে আমীরে কুফা! আমি মুরাদ গোত্রের অমুকের পুত্র অমুক। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে লড়েছি এবং ভূ-পৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। কিন্তু আপনারা আমার উপর ক্ষমতা লাভ করার পূর্বেই তাওবাহ করেছি। আমি এখন আপনার আশ্রয়স্থলে দাঁড়িয়েছি।' এ কথা শুনে আবু মূসা আশআরী দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন : 'হে লোকসকল! এ তাওবাহর পরে তোমাদের কেহ যেন এর সাথে কোন প্রকারের দুর্ব্যবহার না করে। যদি সে তার তাওবাহয় সত্যবাদী হয় তাহলে তো ভাল কথা, আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার পাপই তাকে ধ্বংস করবে।' লোকটি কিছুকাল পর্যন্ত তো ঠিকভাবেই থাকল। তারপর সে পুনরায় মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলাও তাকে তার পাপের কারণে ধ্বংস করে দিলেন এবং তাকে হত্যা করা হল।

ইব্ন জারীর (রহঃ) আরও বর্ণনা করেছেন যে, আলী আসাদী নামক একটি লোক মানুষের পথকে বিপদজনক করে তোলে। সে মানুষকে হত্যা করে এবং তাদের মালধন লুণ্ঠপাট করতে থাকে। বাদশাহ, সেনাবাহিনী এবং জনসাধারণ সদা তাকে খেফতার করার চেষ্টায় থাকে, কিন্তু অকৃতকার্য হয়। একদা সে একটি লোককে কুরআন পাঠ করতে শুনলো। লোকটি সেই সময় নিম্নের আয়াতটি পাঠ করছিল।

يَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা; আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৩) এটা শুনে সে থমকে দাঁড়ালো এবং তাকে বলল : ‘হে আল্লাহর বান্দা! এ আয়াতটি পুনরায় আমাকে পাঠ করে শুন। লোকটি আবার তা পাঠ করল। তখন আলী স্বীয় তরবারটি খাপে রেখে দিল। তৎক্ষণাৎ সে বিশুদ্ধ মনে তাওবাহ করল এবং ফাজরের সালাতের পূর্বেই মাদীনায় পৌঁছে গেল। তার পর গোসল করল এবং মাসজিদে নাববীতে প্রবেশ করে জামাআতে ফাজরের সালাত আদায় করল। সালাত শেষে সে আবু হুরাইরাহর (রাঃ) পাশে বসে পড়ল। দিনের আলো প্রকাশ পেলে লোকেরা তাকে দেখে চিনে ফেললো এবং তাকে খেফতার করতে উদ্যত হল। সে বলল : ‘দেখুন, আমার উপর আপনাদের ক্ষমতা লাভ হওয়ার পূর্বেই আমি তাওবাহ করেছি এবং তাওবাহ করার পর আপনাদের নিকট হাযির হয়েছি। সুতরাং এখন আমার উপর আপনাদের বল প্রয়োগের কোন পথ নেই।’ তখন আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন : ‘লোকটি সত্য কথাই বলেছে।’ অতঃপর তিনি তার হাত ধরে মারওয়ান ইব্ন হাকামের নিকট নিয়ে গেলেন। সে সময় তিনি মুআবিয়ার (রাঃ) শাসনামলে থেকে মাদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁকে বললেন : ‘এ হচ্ছে আলী আসাদী, সে তাওবাহ করেছে, সুতরাং এর উপর আপনি কোন বল প্রয়োগ করতে পারেননা।’ ফলে কেহই তার সাথে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করলেননা। মুজাহিদের একটি দল যখন রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রওয়ানা হলেন, তাঁদের সাথে আলী আসাদীও যোগ দেন। তাদের নৌকা সমুদ্রে চলছিল। তাদের সামনে রোমকদের কতগুলো নৌকা এসে পড়লে তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য সে নিজেদের নৌকা থেকে লাফিয়ে তাদের নৌকায়

গিয়ে উঠল। তারা তার তরবারীর আঘাত থেকে বাঁচার জন্য নৌকার অপর পাশে গেলে নৌকার ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলে নৌকা ডুবে যায় এবং রোমকদের সবাই ডুবে মারা যায়। তাদের সাথে আলী আসাদীও (রাঃ) ডুবে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। (তাবারী ১০/২৮৪)

৩৫। হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর সান্নিধ্য অন্বেষণ কর ও আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাক। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে।

৩৫. يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

৩৬। নিশ্চয়ই যারা কাফির, যদি তাদের কাছে বিশ্বের সমস্ত সম্পদও থাকে এবং ওর সাথে তৎপরিমান আরও থাকে, এবং এগুলোর বিনিময়ে কিয়ামাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চায়, তবুও এই সম্পদ তাদের থেকে কবুল করা হবেনা, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৩৬. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ
أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ
عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ
مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

৩৭। নিশ্চয়ই তারা এটা কামনা করবে যে, জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যায়, অথচ তারা তা থেকে কখনও বের হতে পারবেনা, বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি।

৩৭. يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنَ
النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

তাকওয়া, সংযমশীলতা এবং জিহাদের নির্দেশ

এখানে তাকওয়া ও সংযমশীলতার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এবং সেটাও আবার আনুগত্যের সাথে মিশ্রিতভাবে। ভাবার্থ এই যে, মানুষ যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। 'ওয়াসীলা'র অর্থ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। (তাবারী ১০/২৯১) মুজাহিদ (রহঃ), আবু ওয়ায়েল (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন কাসীর (রহঃ), সুদী (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখ মুফাসসিরগণ হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আনুগত্য স্বীকার করে এবং তাঁর মর্জি মুতাবিক আমল করে তাঁর নৈকট্য লাভ করা। (তাবারী ১০/২৯১) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) নিম্নের আয়াতটিও পাঠ করেন :

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ

তরাই তো তাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৫৭) ওয়াসীলাহ-এর অর্থ ঐ জিনিস যার দ্বারা আকাংখিত বস্তু লাভ করা যায়। ওয়াসীলাহ জান্নাতের ঐ উচ্চ ও মনোরম জায়গার নাম যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে এবং সেটি আরশের অতি নিকটে। সহীহ বুখারীতে যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আযান শুনে... اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ এ দু'আটি পাঠ করে তার জন্য কিয়ামাতের দিন আমার শাফাআত হালাল হয়ে যাবে।' (ফাতহুল বারী ৮/২৫১) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যখন তোমরা আযান শুনে তখন মুআযযিন যা বলে তোমরাও তাই বল, তারপর আমার উপর দুরুদ পাঠ কর, এক দুরুদের বিনিময়ে তোমাদের উপর আল্লাহ দশটি রাহমাত নাযিল করবেন। এরপর আমার জন্য তোমরা আল্লাহর নিকট ওয়াসীলা যাঞ্চ কর। ওটা হচ্ছে জান্নাতের একটি মানযিল যা শুধু একজন বান্দা লাভ করবে। আশা করি যে, ঐ বান্দা আমিই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াসীলা প্রার্থনা করল তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে গেল।' (মুসলিম ১/২৮৮)

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ তাকওয়া অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয়গুলো হতে বিরত থাকা এবং আদিষ্ট বিষয়গুলি মেনে চলার নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর। মুশরিক, কাফির অর্থাৎ যারা তাঁর শত্রু, যারা তাঁর দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তাঁর সরল সঠিক পথ থেকে সরে পড়েছে, তোমরা তাদেরকে হত্যা কর। আর মুজাহিদরা হচ্ছে সফলকাম। কৃতকার্যতা, সৌভাগ্য এবং মর্যাদা তাদেরই। জান্নাতের উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা এবং আল্লাহর অসংখ্য নি'আমাত তাদেরই জন্য। তাদেরকে ঐ জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যেখানে মৃত্যু ও ধ্বংস নেই, যেখানে ঘাটতি ও লোকসান নেই, যেখানে রয়েছে চির যৌবন, অটুট স্বাস্থ্য এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তি।

কিয়ামাত দিবসে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাবার জন্য কাফিরদের কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা

স্বীয় প্রিয় পাত্রদের উত্তম পরিণাম বর্ণনা করার পর এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর শত্রুদের মন্দ পরিণামের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَنُوا بِهِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَنُوا بِهِ তাদেরকে এমন কঠিন ও জঘন্য শাস্তি দেয়া হবে যে, সেই সময় যদি তারা সারা বিশ্বের অধিপতি হয়ে যায় এমনকি আরও এরই সমান হয় এবং এমতাবস্থায় সেই কঠিনতম শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য বিনিময় হিসাবে এ সবগুলো দিতেও চায় তবুও তাদের থেকে সেগুলো গ্রহণ করা হবেনা। বরং যে শাস্তি তাদের উপর হবে তা হবে চিরস্থায়ী শাস্তি। তা হতে কোনক্রমেই রক্ষা পাওয়া যাবেনা। অন্য আয়াতে রয়েছে : জাহান্নামীরা যখন জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে তখন পুনরায় তাদেরকে ওরই মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ تَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا

যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ২২) জ্বলন্ত অগ্নিশিখার সাথে যখন তারা উপরে উঠে আসবে তখন তাদেরকে লোহার হাতুড়ী মেরে মেরে পুনরায় জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করা হবে। মোট কথা, তাদের সেই চিরস্থায়ী

শাস্তি থেকে বের হওয়া অসম্ভব। আনাস ইব্ন মলিক (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘জাহান্নামের একটি লোককে আনা হবে। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে : হে আদম সন্তান! তোমার জায়গা কেমন পেয়েছ?’ সে উত্তরে বলবে : ‘আমার জায়গা অত্যন্ত খারাপ পেয়েছি।’ আবার তাকে জিজ্ঞেস করা হবে : ‘তুমি কি এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ প্রদানে সম্মত আছ?’ সে উত্তর দিবে : ‘হে আমার প্রভু! হ্যাঁ (আমি সম্মত আছি।)’ তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন : ‘তুমি মিথ্যা বলছ। আমি তো তোমার কাছে এর চেয়েও অনেক কম চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি সেটাও দাওনি।’ অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম ৪/২১৬২, নাসাঈ ৬/৩৬)

৩৮। আর যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তোমরা তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসাবে তাদের (ডান হাত) কেটে ফেল, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি, আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, মহা প্রজ্ঞাময়।

৩৮. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

৩৯। অনন্তর যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করার পর (চুরি করার পর) তাওবাহ করে এবং ‘আমলকে সংশোধন করে, তাহলে আল্লাহ তার প্রতি (রাহমাতের) দৃষ্টি বর্ষণ করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

৩৯. فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৪০। তুমি কি জাননা যে, আল্লাহরই জন্য রয়েছে

৪০. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ

আধিপত্য আসমানসমূহে এবং
যমীনে, তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি
দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা
করেন! আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ের
উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ
يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

চুরি করার অপরাধে হাত কাটার শাস্তির যৌক্তিকতা

আল্লাহ আদেশ করেন যে, পুরুষ কিংবা মহিলা যেই হোক চুরি করলে তার হাত কেটে ফেলতে হবে। জাহিলিয়াত যামানায়ও চুরি করার শাস্তি ছিল হাত কেটে ফেলা, ইসলামেও সেই আইন বলবৎ রয়েছে। তবে ইসলামে এ ব্যাপারে কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে শর্তগুলি পূরণ হলেই কেবল হাত/পা কেটে ফেলা যাবে। ইনশাআল্লাহ এগুলি সম্পর্কে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব। জাহিলিয়াত যামানার আরও কিছু আইন রয়েছে যা ইসলামে কিছু পরিবর্তন করে গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন রক্তপণ।

কখন চোরের হাত কাটা অবশ্য করণীয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ চোরের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন যে, সে সামান্য ডিম চুরি করে হাত কাটিয়ে নেয়, সে দড়ি বা রজ্জু চুরি করে, ফলে তার হাত কাটা হয়।’ (ফাতহুল বারী ১২/৮৩, মুসলিম ৩/১৩১৪) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘এক চতুর্থাংশ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বা তার চেয়ে বেশীতে চোরের হাত কেটে নেয়া হবে।’ (ফাতহুল বারী ১২/৯৯, মুসলিম ৩/১৩১২) সহীহ মুসলিমের অন্য একটি হাদীসে আয়িশা (রাঃ) হতেই বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘এক চতুর্থাংশ দীনার কিংবা তার চেয়ে বেশি না হলে চোরের হাত কাটা যাবেনা।’ (মুসলিম ৩/১৩১৩) সুতরাং এ হাদীস স্পষ্টভাবে চুরির শাস্তির মাসআলার মীমাংসা করে দেয়। আর যে হাদীসে তিন দিরহামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোরের হাত কেটে নেয়ার

নির্দেশ বর্ণিত আছে, ওটা এর বিপরীত নয়। কেননা ঐ সময় দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা বারোটি দিরহাম বা রৌপ্যমুদ্রা পরিমাণ মূল্যের ছিল। অতএব, মূল হচ্ছে এক চতুর্থাংশ দীনার, তিন দিরহাম নয়। উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ), উসমান ইব্ন আফ্ফান (রাঃ) এবং আলী ইব্ন আবী তালিবও (রাঃ) এ কথাই বলেন। উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ), লায়েস ইব্ন সা'দ আওয়ালী (রহঃ), ইমাম শাফিঈ (রহঃ), আহমাদ ইব্ন হাম্মাল (রহঃ) ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই (রহঃ) এবং আবু সাউর দাউদ ইব্ন আলী যাহারীও (রহঃ) এরূপ উক্তি করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা এবং তার ছাত্র আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ এবং জাফরসহ সুফিয়ান শাওরী অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, চোরের হাত কাটার বিচার/ফাইসালা করা যেতে পারে, যদি সে কম পক্ষে দশ দিরহাম পরিমাণ চুরি করে। অথচ তখন এক দিনারের মূল্য ছিল চার দিরহামের সমান। প্রথমে বর্ণিত ফাইসালাটিই সঠিক যাতে বলা হয়েছে যে, এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ অথবা তদপেক্ষা বেশি চুরি করলে হাত কেটে ফেলার হুকুম দেয়া যেতে পারে। এত সামান্য পরিমাণ জিনিস চুরি করার অপরাধে হাত কাটার বিধান এ জন্য রাখা হয়েছে যাতে মানুষ চুরি করা থেকে বিরত থাকে। এ সিদ্ধান্ত প্রদানের মধ্যে হিকমাত রয়েছে। যদি চুরিতেও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের শর্ত লাগানো হত তাহলে চুরির পথ বন্ধ হতনা। এটা কৃতকর্মেরই প্রতিফল। সঠিক পন্থা এটাই যে, যে অঙ্গ দ্বারা সে অপরের ক্ষতিসাধন করেছে ঐ অঙ্গের উপরই শাস্তি হবে, যাতে তার যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হয় এবং অন্যরাও সতর্ক হয়। আল্লাহ প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে প্রবল পরাক্রান্ত এবং স্বীয় আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে পূর্ণ বিজ্ঞানময়।

চোরের তাওবাহ গ্রহণযোগ্য হতে পারে

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

যে ব্যক্তি সীমালংঘন করার পর অর্থাৎ চুরি করার পর তাওবাহ করে এবং আমলকে সংশোধন করে, তার প্রতি আল্লাহ (রাহমাতের) দৃষ্টিতে তাকাবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। তবে হ্যাঁ, কেহ যদি কারও সম্পদ চুরি করার পর তা নিজের কাছেই রেখে দেয় তাহলে শুধুমাত্র তাওবাহ করলেই পাপ ক্ষমা হবেনা, যে পর্যন্ত না সেই সম্পদ মালিককে ফিরিয়ে দিবে অথবা ওর পূর্ণ মূল্য প্রদান করবে। বিজ্ঞ ইমামগণের এটাই অভিমত। শুধুমাত্র ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন যে, যদি চুরির অপরাধে হাত কেটে নেয়া হয় এবং চোরাই মাল নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে দুনিয়ায় ওর বদলা প্রদান করা তার উপর যব্বরী নয়।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক মহিলা চুরি করেছিল। সে যে লোকদের মালামাল চুরি করেছিল তারা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করে। অতঃপর তারা বলে : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ মহিলাটি আমাদের মালামাল চুরি করেছে।’ তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল : আমরা এ জন্য মুক্তিপণ দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন : ‘তোমরা তার হাত কেটে নাও।’ তার গোত্রীয় লোকেরা পুনরায় বলে : ‘আমরা তার মুক্তিপণ হিসাবে পাঁচশ’ দীনার প্রদান করছি।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনও বলেন : ‘তোমরা তার হাত কেটে নাও।’ ফলে তার ডান হাত কেটে নেয়া হল। মহিলাটি তখন বলল : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এতে আমার তাওবাহও কি হয়ে গেল?’ তিনি বললেন : ‘হ্যাঁ, তুমি পাপ থেকে এমন পবিত্র হয়ে গেলে যে, যেন তুমি আজই জন্মগ্রহণ করলে।’ তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ২/১৭৭) ঐ মহিলাটি ছিল মাখযুম গোত্রের। এ ঘটনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও আছে। মহিলাটি কুরাইশ বংশের ছিল বলে তার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে খুবই দূশ্চিন্তা দেখা দেয় এবং তারা ইচ্ছা করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার সম্পর্কে কিছু সুপারিশ করা হোক। এ ঘটনাটি মাক্কা বিজয়ের সময় ঘটেছিল। অবশেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, উসামা ইব্ন যায়েদের (রাঃ) মাধ্যমে সুপারিশ করা হোক। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। সুতরাং উসামা ইব্ন যায়েদ (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার জন্য সুপারিশ করেন তখন তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং রাগতঃস্বরে বলেন : ‘উসামা! তুমি আল্লাহর হদসমূহের মধ্যে একটি হদের ব্যাপারে সুপারিশ করছ?’ এ কথা শুনে উসামা (রাঃ) অত্যন্ত ঘাবড়ে যান এবং বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি বড়ই অপরাধ করে ফেলেছি, দয়া করে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।’ সন্ধ্যার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ভাষণ প্রদান করেন। তাতে তিনি আল্লাহর পূর্ণ প্রশংসা ও স্তুতিবাদের পর বলেন :

‘তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ স্বভাবের কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের মধ্যে যখন কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। পক্ষান্তরে কোন সাধারণ লোক চুরি করলে তার উপর হদ জারি করত। যে

আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদও চুরি করে তাহলে তারও হাত কেটে নিব।’ অতঃপর তাঁর নির্দেশক্রমে মহিলাটির হাত কেটে নেয়া হয়। আয়িশা (রাঃ) বলেন : ‘এরপর ঐ মহিলাটি বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবাহ করে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারপর থেকে সে কোন কাজে আমার কাছে আসত এবং তার প্রয়োজনের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তুলে ধরতাম।’ (ফাতহুল বারী ৭/৬১৯, মুসলিম ৩/১৩১৫)

সহীহ মুসলিমে অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আয়িশা (রাঃ) বলেন যে, মাখযুম গোত্রের এক মহিলা লোকদের কাছ থেকে আসবাবপত্র ধার করত, তারপর তা অস্বীকার করত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত কেটে নেয়ার নির্দেশ দেন। (মুসলিম ৩/১৩১৬) আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলার জন্যই সমুদয় প্রশংসা। সমস্ত বাদশাহর বাদশাহ, সারা বিশ্বের প্রকৃত বাদশাহ এবং সঠিক শাসনকর্তা একমাত্র আল্লাহ, যাঁর কোন নির্দেশকে কেহ বাধা দিতে পারেনা এবং যাঁর কোন ইচ্ছাকে কেহ বদলে দিতে সক্ষম নয়। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান।

৪১। হে রাসূল! যারা দৌড়ে দৌড়ে কুফরীতে পতিত হয় তাদের এই কাজ যেন তোমাকে চিন্তিত না করে, তারা ঐ সব লোকের মধ্য থেকেই হোক যারা নিজেদের মুখে তো (মিছামিছি) বলে : আমরা ঈমান এনেছি; অথচ তাদের অন্তর বিশ্বাস করেনি, অথবা তারা সেই সব ইয়াহুদী যারা মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত, তারা তোমার কথাগুলি অন্য সম্প্রদায়ের জন্য কান পেতে শোনে; সেই সম্প্রদায়ের

٤١. يَأْتِيهَا الرَّسُولُ لَا تَحْزُنَكَ
الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ
الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ
وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ
هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ
سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخِرِينَ لَمْ

অবস্থা এরূপ যে, তারা তোমার নিকট আসেনি (বরং অন্যকে পাঠিয়েছে); তারা কলামকে ওর স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে থাকে। তারা বলে : যদি তোমরা (সেখানে গিয়ে) এই (বিকৃত) বিধান পাও তাহলে তা কবুল করবে, আর যদি এই (বিকৃত) বিধান না পাও তাহলে বিরত থাকবে। আল্লাহ যাকে পরীক্ষায় ফেলার ইচ্ছা করেন তুমি তার জন্য আল্লাহর সাথে কোন কিছুই করার অধিকারী নও; তারা এরূপ যে, তাদের অন্তরগুলি পবিত্র করা আল্লাহর অভিপ্রায় নয়; তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে অপমান এবং আখিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি।

يَأْتُوكَ سَخِرْفُونَ ۚ أَلَكِلِمَ مِنْ بَعْدِ
مَوَاضِعِهِ ۚ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ
هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ
فَأَحْذَرُوا ۚ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ
فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ
يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ ۚ هُمْ فِي الدُّنْيَا
خِزْيٌ ۚ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ

৪২। তারা মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত, হারাম বস্তু খেতে অভ্যস্ত। অতএব তারা যদি তোমার কাছে আসে তাহলে তুমি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও, কিংবা তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাক, আর যদি তুমি তাদের থেকে নির্লিপ্তই থাক তাহলে তাদের

৪২. سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ
أَكْكُلُونَ لِلْسُّحْتِ ۚ فَإِنْ جَاءُوكَ
فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَإِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ

সাধ্য নেই যে, তোমার
বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করে। আর
যদি তুমি বিচার-মীমাংসা কর
তাহলে তাদের মধ্যে
ন্যায়সঙ্গত বিচার করবে,
নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়
বিচারকদেরকে ভালবাসেন।

شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم
بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

৪৩। আর তারা কিরূপে
তোমাকে মীমাংসাকারী
বানিয়ে নিচ্ছে? অথচ তাদের
কাছে তাওরাত রয়েছে, যাতে
আল্লাহর বিধান বিদ্যমান!
অতঃপর তারা (তোমার
মীমাংসা হতে) ফিরে যায়,
আর তারা কখনও বিশ্বাসী
নয়।

٤٣. وَكَيْفَ تُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ
التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ
يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا
أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

৪৪। আমি তাওরাত নাযিল
করেছিলাম, যাতে হিদায়াত
ছিল এবং (আনুষ্ঠানিক
বিধানাবলীর) আলো ছিল,
আল্লাহর অনুগত নাবীগণ
তদনুযায়ী ইয়াহুদীদেরকে
আদেশ করত আর আল্লাহ-
ওয়ালাগণ এবং আলিমগণও।
কারণ এই যে, তাদেরকে এই
কিতাবুল্লাহর সংরক্ষণের
আদেশ দেয়া হয়েছিল এবং
তারা এর সাক্ষী। অতএব (হে
ইয়াহুদী আলিমগণ!) তোমরা

٤٤. إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا
هُدًى وَنُورٌ ۚ تَحْكُمُ بِهَا
النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ
هَادُوا وَالرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا
أَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا

ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের আচরণে দুঃখ না পেতে বলা হয়েছে

এ আয়াতসমূহে ঐ লোকদের নিন্দা করা হচ্ছে যারা স্বীয় অভিমত, কিয়াস এবং প্রবৃত্তিকে আল্লাহর শারীয়াতের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে, আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য পরিত্যাগ করে কুফরীর দিকে দৌড়ে যায়। **مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنِ قُلُوبُهُمْ**। তারা মুখে শুধু ঈমানের দাবী করে বটে, কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান শূন্য। মুনাফিকদের অবস্থা তো এটাই যে, তারা কথায় খুব সাধুতা প্রকাশ করে, কিন্তু অন্তর তাদের সম্পূর্ণ কপটতাপূর্ণ।

ইয়াহুদীদের স্বভাবও তদ্রূপ। তারা ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু। তারা মিথ্যা ও বাজে কথা খুব মজা করে শোনে এবং অন্তরের সাথে কবুল করে। পক্ষান্তরে সত্য কথা থেকে তারা দূরে সরে থাকে, এমনকি ঘৃণাও করে। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাজলিসে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য থাকে মুসলিমদের গোপন কথা নিজেদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া, তাদের পক্ষ থেকে তারা গুণ্ডচরের কাজ করে।

ইয়াহুদীরা ব্যভিচারীদের পাথর মেরে হত্যা করাসহ আল্লাহর আইন পরিবর্তন করেছে

ইয়াহুদীদের সবচেয়ে বড় দুষ্টামি হচ্ছে এই যে, **يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ** **مَوَاضِعِهِ** তারা কথাকে বদলে দেয়। ভাবার্থ হবে এক ধরনের, কিন্তু তারা অন্য

ইَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ ۖ অর্থ করে জনগণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেয়।
 وَإِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا উদ্দেশ্য এই যে, সেটা যদি তাদের মর্জি মুতাবেক হয় তাহলে তা মানবে, আর উল্টা হলে তা থেকে দূরে থাকবে।

কথিত আছে যে, এ আয়াত ঐ সব ইয়াহুদীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা একে অপরকে হত্যা করেছিল। অতঃপর তারা পরস্পর বলাবলি করে : ‘চল, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাই, যদি তিনি রক্তপণ ও জরিমানার নির্দেশ দেন তাহলে তো মেনে নিব, আর যদি কিসাস বা হত্যার বদলে হত্যার নির্দেশ দেন তাহলে মানবনা।’ কিন্তু সর্বাধিক সঠিক কথা এই যে, তারা দুই ইয়াহুদী ব্যাভিচারী ও ব্যাভিচারিণীকে নিয়ে এসেছিল। তাদের কিতাব তাওরাতে তো এ হুকুমই ছিল যে, ব্যাভিচারী বা ব্যাভিচারিণী বিবাহিত বা বিবাহিতা হলে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। কিন্তু তারা ওটাকে বদলে দিয়েছিল এবং একশ’ চাবুক মেরে, মুখে চুনকালি মেখে এবং গাধায় উল্টো করে সওয়ার করিয়ে লাঞ্চিত করত। আর এরূপ শাস্তি দিয়েই ছেড়ে দিত। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদীনায হিজরাতের পর তাদের এক লোক ব্যাভিচারের অপরাধে অপরাধী হয়ে গ্রেফতার হয়। তখন তারা পরস্পর বলাবলি করে : ‘চল, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করি এবং তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। যদি তিনি আমাদের শাস্তি দানের মতই চাবুক মারার শাস্তির নির্দেশ দেন তাহলে আমরা তা মেনে নিব এবং আল্লাহর কাছেও এটা আমাদের জন্য সনদ হয়ে যাবে। আর যদি রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যার নির্দেশ দেন তাহলে তা মানবনা।’ সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে বলল : ‘আমাদের এক মহিলা ব্যাভিচার করেছে। তার ব্যাপারে আপনি কি নির্দেশ দিচ্ছেন?’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ‘তোমাদের তাওরাতে কি নির্দেশ রয়েছে?’ তারা বলল : ‘আমরা তাকে লাঞ্চিত করি এবং চাবুক মেরে ছেড়ে দেই।’ এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) বললেন : ‘তোমরা মিথ্যা কথা বলছ। তাওরাতে পাথর নিক্ষেপে হত্যার নির্দেশ রয়েছে, তাওরাত নিয়ে এসো।’ তারা তাওরাত খুলে দিল বটে, কিন্তু রজমের আয়াতের উপর হাত রেখে দিয়ে পূর্বাপর সমস্ত পড়ে শোনা। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) সব কিছু বুঝে ফেললেন এবং তাদেরকে বললেন, হাত সরিয়ে নাও। হাত সরালে দেখা গেল যে, সেখানে রজমের আয়াত বিদ্যমান

রয়েছে। তখন তাদেরকেও স্বীকার করতে হল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে ব্যভিচারীদ্বয়কে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হল। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন, আমি দেখলাম যে, ব্যভিচারী পুরুষ লোকটি ব্যভিচারিণী মহিলাটিকে পাথর থেকে বাঁচানোর জন্য আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন। তবে বর্ণনাটি সহীহ বুখারী থেকে নেয়া হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীদেরকে বলেছেন : এ ব্যাপারে তোমরা কি করতে? তারা উত্তরে বলল : আমরা তাকে ধিক্কার জানাতাম এবং লোক সমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করলেন :

فَاتُّوْا بِالتَّوْرَةِ فَاتَّلُوْهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো, অতঃপর ওটা পাঠ কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯৩)

সুতরাং তারা এক চোখ অন্ধ বিশিষ্ট এক লোককে নিয়ে এলো যে তাদের কাছে সম্মানিত ব্যক্তি বলে পরিচিত ছিল। বলা হল, (তাওরাত হতে) পাঠ কর। সুতরাং সে পাঠ করতে শুরু করল এবং একটি আয়াত পর্যন্ত পাঠ করার পর সে পরবর্তী আয়াতটি তার হাতের নিচে চেপে ধরল। তাকে বলা হল, তোমার হাত সরিয়ে ফেল। ঐ আয়াতটি ছিল ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করা বিষয়ক আয়াত। তখন ঐ লোকটি বলল : হে মুহাম্মাদ! এটি পাথর মেরে হত্যা করার আয়াত যেটি আমরা আপনার কাছে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছি। সুতরাং ঐ দুই ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ করা হল এবং তা কার্যকরও করা হল। (বুখারী ৪৫৫৬)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, দুই ইয়াহুদী পুরুষ ও মহিলাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হল, যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : ব্যভিচার সম্পর্কে তোমাদের তাওরাতে কি শাস্তি বিধান রয়েছে তা তোমরা জান কি? তারা উত্তরে বলল : আমরা তাদেরকে জন-সমাবেশে হাযির করি, অতঃপর গাধার পিঠে চড়িয়ে লোকালয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করলেন : فَاتُّوْا بِالتَّوْرَةِ فَاتَّلُوْهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ । সুতরাং

তারা তাওরাত নিয়ে এলো এবং যেখানে ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ করা হয়েছে তার পূর্বের আয়াত পর্যন্ত পাঠ করল। অতঃপর ঐ আয়াতটি হাত দিয়ে চেপে ধরে পরবর্তী আয়াত পাঠ করতে শুরু করল। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) ঐ সময় রাসূলুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি বললেন : তাকে আদেশ করুন যেন তার হাত তাওরাত থেকে সরিয়ে নেয়। তখন সে হাত সরিয়ে নেয়ার পর দেখা গেল যে, ওখানে ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ রয়েছে। সুতরাং ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীকে পাথর মেরে হত্যা করার জন্য রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করলে তা কার্যকর করা হয়। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন : ঐ পাথর মারার সময় আমিও একজন ছিলাম এবং দেখতে পাচ্ছিলাম যে, পুরুষ লোকটি মেয়ে লোকটিকে আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য তার শরীর দিয়ে আড়াল করছিল। (মুসলিম ৩/১৩২৬)

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন উমার (রাঃ) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু ইয়াহুদী এসে ‘কুফ’ নামক স্থানে গমন করার জন্য দা‘ওয়াত দেয়। সুতরাং তিনি ‘মিদরাস’ নামের এক লোকের বাড়িতে উঠেন। ইয়াহুদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল : হে আবুল কাসিম! আমাদের এক লোক এক মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছে, আপনি তাদের মাঝে ফাইসালা করে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বসার জন্য তারা একটি বালিশ দিলে তিনি ওর উপর উপবেশন করেন এবং বলেন : তোমাদের তাওরাত নিয়ে এসো। তাকে তাওরাত এনে দেয়া হলে তিনি যে বালিশটিতে বসা ছিলেন ওটা সরিয়ে এনে ওর উপর তাওরাতটিকে রাখলেন এবং বললেন : আমি তোমাতে (তাওরাতে) বিশ্বাস করি এবং যিনি তোমাকে নাযিল করেছেন তাঁর (আল্লাহর) উপর ঈমান রাখি। এরপর তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তখন এক যুবককে উপস্থিত করা হয় ...। অতঃপর হাদীসের বাকী অংশ উহা যা ইমাম মালিক (রহঃ) নাফি’ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (আবু দাউদ ৪/৫৯৭)

এ হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি ফাইসালা দেন যা তাওরাতেও রয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, ইয়াহুদীরা তাওরাতে বিশ্বাস করে এবং ওর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বলেই তিনি তা করেছিলেন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পরে শুধু তাঁর ধর্মীয় আইনকেই অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। বরং ইয়াহুদীদের চরিত্র

প্রকাশ করে দেয়ার জন্য আল্লাহই তাঁকে ঐরূপ করতে আদেশ করেছেন। তিনি ইয়াহুদী মহিলা ও পুরুষটিকে পাথর মেরে হত্যার করার আদেশ এ জন্য দিয়েছিলেন যাতে তারা স্বীকার করতে ও মানতে বাধ্য হয় যে, তাদের তাওরাতে ঐ আইন রয়েছে যা তারা যোগসাজশ করে লুকিয়ে রেখেছিল, অস্বীকার করেছিল এবং চিরদিনের জন্য তা আর চালু না করার জন্য বন্ধপরিকর ছিল। তারা যে ভুল করেছিল তাও মেনে নিতে বাধ্য হল, যদিও সঠিক জ্ঞান তাদের আগে থেকেই ছিল। তারা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এই মনোবৃত্তি, অভিলাষ ও ঔদ্ধত্য নিয়ে বিচারের জন্য গিয়েছিল যে, তারা যে অভিমত ব্যক্ত করবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই বিষয়ে তাদের মতের সাথে একই মত পোষণ করবেন। তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলনা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঠিক বিচার করবেন এবং তারাও ন্যায় বিচারের প্রত্যাশী বলে তা মেনে নিবে।

অন্য সনদে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীরা বলেছিল, ‘আমরা তো তাদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে এবং কিছু মারপিট করে ছেড়ে দেই।’ অতঃপর রজমের আয়াত প্রকাশ হওয়ার পর তারা বলে, ‘রয়েছে তো এ হুকুমই, কিন্তু আমরা তা গোপন রেখেছিলাম।’ যে পাঠ করেছিল সে‘ই রজমের আয়াতের উপর হাত রেখে দিয়েছিল। যখন তার হাত সরিয়ে ফেলা হল তখন রজমের আয়াত প্রকাশ হয়ে পড়ল। এ দু’জনের উপর রজম কার্যকরকারীদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন উমারও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন।

ঐ ইয়াহুদীরা সরল মনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসেনি যে, তাঁর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করবে। বরং তাদের আগমনের উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, তিনিও যদি তাদের ইজমা’ মুতাবেক নির্দেশ দেন তাহলে তারা মেনে নিবে, নচেৎ অন্য কিছুই মানবেনা। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন যে, তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার সুপথ প্রাপ্তি কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাদের অপবিত্র অন্তরকে পবিত্র করার আল্লাহর ইচ্ছাই নেই। তারা দুনিয়ায়ও লাঞ্চিত ও অপমানিত হবে এবং পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি।

বলা হচ্ছে : তারা মিথ্যা কথা কান লাগিয়ে শুনতে এবং হারাম বস্তু অর্থাৎ সুদ খেতে অভ্যস্ত। সুতরাং কিরূপে তাদের অপবিত্র অন্তর পবিত্র হবে? আর তাদের দু‘আই বা আল্লাহ কি করে শুনবেন? হে নাবী! যদি তারা তোমার কাছে মীমাংসার জন্য আসে তাহলে তাদের ফাইসালা করা না করার তোমার অধিকার রয়েছে।

তুমি যদি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তথাপি তারা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। কেননা তাদের উদ্দেশ্য সত্যের অনুসরণ নয়, বরং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), ‘আতা খুরাসানী (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, আয়াতের **فَاَحْكُم بَيْنَهُم اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ** **وَإِنْ تَعْرِضْ** (আল্লাহ এ অংশটি **اللَّهُ أَنزَلَ** এ যেনা ফাইসালা করতে বলেছেন তেমনিভাবে তুমি তাদের মধ্যে মীমাংসা কর) (৫ : ৪৯) এ আয়াতের মাধ্যমে বাতিল হয়ে গেছে। (তাবারী ১০/৩৩০-৩৩২)। এর পর বলা হয়েছে :

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ হে নাবী! তুমি যদি তাদের মধ্যে মীমাংসা কর তাহলে ন্যায়ের সাথে মীমাংসা কর, যদিও এরা নিজেরা অত্যাচারী এবং আদল ও ইনসার থেকে বহু দূরে রয়েছে। **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ** আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা‘আলা ন্যায় বিচারকদেরকে ভালবাসেন।

ইয়াহুদীরা তাওরাতের প্রশংসা করলেও

তা না মানার কারণে আল্লাহ তাদেরকে তিরস্কার করেন

অতঃপর ইয়াহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা, অভ্যর্থনার কলুষতা এবং বিরুদ্ধাচরণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, একদিকে তো তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার এ কিতাবকে ছেড়ে দিয়েছে যার আনুগত্য স্বীকার ও সত্যতার কথা তারা নিজেরাও স্বীকার করেছে। দ্বিতীয়তঃ তারা তাওরাত ছেড়ে অন্য দিকে ঝুঁকে পড়েছে যাকে তারা নিজেরাও মানেনা এবং ওটাকে মিথ্যা বলে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাই আল্লাহ তা‘আলা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : তারা কিভাবে তোমার হুকুম মানতে পারে? তারা তো তাওরাতকেও ত্যাগ করেছে। তাতে আল্লাহর হুকুম রয়েছে, এটা তো তারাও স্বীকার করেছে, অথচ তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

তারপর ঐ তাওরাতের প্রশংসা করা হচ্ছে যা তিনি স্বীয় মনোনীত রাসূল মূসার (আঃ) উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। ওর মধ্যে হিদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর হুকুমবাহী নাবীগণ ওর মাধ্যমেই ফাইসালা করে থাকেন এবং

ইয়াহুদীদের মধ্যে ওরই আহকাম জারী করেন। তাঁরা ওর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে বেঁচে থাকেন এবং রুহবান ও আহবারগণও এ নীতির উপর থাকেন। কেননা এ পবিত্র গ্রন্থ তাদেরকে সমর্পণ করা হয়েছিল এবং ওটা প্রকাশ করে দেয়া ও ওর উপর আমল করার তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তারা ওর উপর সাক্ষী ছিলেন। ঘোষিত হচ্ছে :

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ এখন তোমাদের উচিত,
তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কেহকেও ভয় করবেনা। তোমরা প্রতি মুহুর্তে এবং
পদে পদে আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর আয়াতগুলিকে সামান্য মূল্যের
বিনিময়ে বিক্রি করবেনা। জেনে রেখ যে, আল্লাহর নাযিলকৃত অহী মোতাবেক
যারা ফাইসালা করেনা তারা কাফির। এতে দু'টি উক্তি রয়েছে, যা ইনশাআল্লাহ
এখনই বর্ণিত হচ্ছে। এ আয়াতগুলির আরও একটি শানে নুযূল রয়েছে যা এখন
আলোচিত হচ্ছে।

‘যারা আল্লাহ প্রদত্ত আইনে বিচার করেনা তারা কাফির, যালিম ও ফাসিক’ এর বর্ণনা

ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অত্র সূরার ৪৪, ৪৫ ও ৪৭
আয়াতে ইয়াহুদীদের দু'টি দলকে কাফির, যালিম এবং ফাসিক বলা হয়েছে।
ব্যাপার এই যে, ইয়াহুদীদের দু'টি দল ছিল। একটি বানু নাযীর এবং অপরটি
বানু কুরাইযা। তাদের প্রথমটি ছিল সবল এবং দ্বিতীয়টি ছিল দুর্বল। তাদের
পরস্পরের মধ্যে এ কথার উপর সন্ধি হয়েছিল যে, বিজিত দলটির কোন লোক
যদি পরাজিত দলটির কোন লোককে হত্যা করে তাহলে তাকে পঞ্চাশ ওয়াসাক
রক্তপণ দিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি পরাজিত দলটির কোন লোক বিজিত দলটির
কোন লোককে হত্যা করে তাহলে তাকে একশ ওয়াসাক রক্তপণ দিতে হত। এ
প্রথাই তাদের মধ্যে চলে আসছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের
মাদীনায়া আগমনের পর এরূপ এক ঘটনা ঘটে যে, দুর্বল ইয়াহুদীদের এক ব্যক্তি
সবল ইয়াহুদীদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। তখন এদের পক্ষ থেকে এক লোক
ওদের কাছে গিয়ে বলে, ‘এখন একশ’ ওয়াসাক আদায় কর।’ তারা উত্তরে বলে,

‘এটা তো প্রকাশ্য অন্যায় আচরণ। আমরা তো সবাই একই গোত্রের, একই ধর্মের, একই বংশের এবং একই শহরের লোক। অথচ আমরা রক্তপণ্ডা পাব কম, আর তোমরা পাবে বেশী? এতদিন পর্যন্ত তোমরা আমাদেরকে দাবিয়ে রেখেছিলে। আমরা বাধ্য ও অপারগ হয়ে তোমাদের এ অন্যায় সহ্য করে আসছিলাম। কিন্তু এখন যেহেতু এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায় একজন ন্যায়পরায়ণ লোক এসে গেছেন সেহেতু আমরা তোমাদেরকে সেই পরিমাণ রক্তপণ্ডাই প্রদান করব যে পরিমাণ তোমরা আমাদেরকে প্রদান করে থাক।’ এ নিয়ে চতুর্দিকে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হল। শেষ পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এর মীমাংসাকারী নিযুক্ত করা হোক। কিন্তু সবল লোকেরা যখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল তখন তাদের কয়েকজন বুদ্ধিমান লোক তাদেরকে বলল : তোমরা এ আশা করনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যায়ের আদেশ প্রদান করবেন। এটাতো স্পষ্ট বাড়াবাড়ি যে, আমরা দিব অর্ধেক এবং নিব পূরাপুরি! আর বাস্তবিকই এ লোকগুলো অপারগ হয়েই এটা মেনে নিয়েছিল। এক্ষণে তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মীমাংসাকারী নির্বাচন করলে অবশ্যই তোমাদের হক মারা যাবে। কেহ কেহ পরামর্শ দিল, গোপনে কোন লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠিয়ে দাও। তিনি কি ফাইসালা করবেন তা সে জেনে আসুক। সেটা যদি আমাদের অনুকূলে হয় তাহলে তো ভাল কথা। আমরা তাদের নিকট থেকে আমাদের হক আদায় করে নিব। আর যদি ওটা আমাদের প্রতিকূলে হয় তাহলে আমাদের পৃথক থাকাই বাঞ্ছনীয় হবে। এ পরামর্শ অনুযায়ী তারা মাদীনার কয়েকজন মুনাফিককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রেরণ করল। তারা তাঁর নিকট পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ করে স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের কু-মতলব সম্পর্কে অবহিত করলেন। (আবু দাউদ ৪/৭, আহমাদ ১/২৪৬)

আর একটি বর্ণনায় আবু জাফর ইব্ন জারীর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُوا شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ আয়াতটি বানু নাযীর এবং বানু কুরাইযার মধ্যে যে রক্তপণ নিয়ে বিবাদ ছিল সেই সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। বানু নাযীর গোত্রের কেহকে হত্যা করা হলে তার পরিবার যে পরিমাণ রক্তপণ (দিয়াত) প্রাপ্ত হত, বানু কুরাইযার কোন লোককে হত্যা করা হলে তার পরিবার রক্তপণ বাবদ তার অর্ধেক অর্থ প্রাপ্ত হত। সুতরাং তারা এ ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য ন্যস্ত করে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তখন এ আয়াত নাযিল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদেরকে আল্লাহর আদেশের প্রতি নতজানু হয়ে উভয় গোত্রকে একই সমান রক্তপণ প্রদানের হুকুম করেন। (তাবারী ১০/৩২৬) আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এ হাদীসটি আবু ইসহাক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ১/৩৬৩, ৪/১৬, ৮/৪৯)

আল আউফী (রহঃ) এবং আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতটি দুই ইয়াহুদীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, যে বিষয়টি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। হতে পারে যে, উভয় কারণেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ এ থেকে এ বিশ্বাসই বেশি জোরদার হচ্ছে যে, রক্তপণের ব্যাপারেই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

আর আমি তাদের প্রতি তাতে (তাওরাতে) এটা ফারয করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং (তদ্রূপ অন্যান্য) যখমেরও বিনিময়ে

যখম রয়েছে; অতঃপর যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে এটা তার জন্য (পাপের) কাফ্ফারা হয়ে যাবে; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত বিধান অনুযায়ী ফাইসালা করেনা তাহলে তো এমন ব্যক্তি পূর্ণ যালিম। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৪৫)

বারা ইব্ন আযিব (রাঃ), হুযাইফা ইব্নুল ইয়ামান (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আবু মিসলাজ (রহঃ), আবু রাজা আল উতারিদি (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এ আয়াতটি আহলে কিতাবদের প্রতি নাযিল হয়েছিল। (তাবারী ১০/৩৪৭-৩৫৭) হাসান বাসরী (রহঃ) আরও যোগ করেন যে, আয়াতটি আমাদের (মুসলিমদের) জন্যও প্রযোজ্য। (তাবারী ১০/৩৫৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَزِيزًا وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنْ

أَعْلَمَ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ

আর এভাবে আমি ইহা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বিধান (বিচার নির্ধারক), আরাবী ভাষায়। জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবেনা। [সূরা রা'দ, ১৩ : ৩৭]

আবদুর রাযযাক (রহঃ) সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, মানসুর (রহঃ) ইবরাহীম (রহঃ) থেকে বলেন যে, এ আয়াতটি বানী ইসরাঈলের জন্য নাযিল করেছেন এবং আমাদের মুসলিম উম্মাহর জন্যও তা গৃহীত হয়েছে। (তাবারী ১০/৩৫৬) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : আল্লাহ তা'আলা যা কিছু নাযিল করেছেন তা যে অস্বীকার করল সে কুফরী করল এবং যে তা স্বীকার করল কিন্তু সেই অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালিত করলনা সে যালিম, ফাসিক এবং পাপী। ইব্ন জারীর (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৪/৫৯৭)

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, ঘুষ খেয়ে কোন শারঈ মাসআলার ব্যাপারে উল্টা ফাতওয়া দেয়া কুফরী। সুদী (রহঃ) বলেন যে, যদি ইচ্ছাপূর্বক আল্লাহর অহীর বিপরীত ফাতওয়া দেয়, জানা সত্ত্বেও তার উল্টা করে তাহলে সে কাফির।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ফরমানকে অস্বীকার করবে তার হুকুম এটাই। আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করলনা বটে, কিন্তু সেই মুতাবেক বললনা, সে যালিম ও ফাসিক। সে আহলে কিতাবই হোক অথবা আর কেহ হোক। শা'বী (রহঃ) বলেন যে, মুসলিমদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের বিপরীত ফাতওয়া দিবে সে কাফির, ইয়াহুদীদের মধ্যে যে দিবে সে যালিম এবং খৃষ্টানদের মধ্যে যে দিবে সে ফাসিক।

আবদুর রায়যাক (রহঃ) বলেন, মা'মার (রহঃ) আমাদের কাছ বর্ণনা করেছেন, তাউস (রহঃ) বলেছেন : ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) **وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ** (রাঃ) যে আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার করেনা ... সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : এটি কুফরী কাজ। ইব্ন তাউস (রহঃ) আরও যোগ করেন যে, এটি ঐরূপ নয় যারা আল্লাহ, তাঁর কিতাব, মালাইকা/ফেরেশতা এবং নাবীগণকে অস্বীকার করে। শাওরী (রহঃ) ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'আতা (রহঃ) বলেছেন : কুফর এবং কুফরের চেয়ে ছোট কুফর, যুল্ম এবং যুল্মের চেয়ে ছোট যুল্ম এবং ফাসিকী ও ফাসিকীর চেয়ে ছোট ফাসিকী রয়েছে। (আবদুর রায়যাক ১/১৯১, তাবারী ৪/৫৯৫) ওয়াকী (রহঃ) বলেন, সাঈদ আল মাক্বী (রহঃ) বলেছেন যে, তাউস (রহঃ) বলেছেন যে, আয়াতে বর্ণিত যে কুফরীর কথা বলা হয়েছে তা ঐ ধরনের কুফরী নয় যার ফলে দীন থেকে বহিস্কার হয়ে যায়। (তাবারী ১০/৩৫৫)

৪৫। আর আমি তাদের প্রতি তাতে (তাওরাতে) এটা ফারয করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং (তদ্রূপ অন্যান্য) যখমেরও বিনিময়ে যখম রয়েছে; অনন্তর যে

৪৫. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ

ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়,
তাহলে এটা তার জন্য
(পাপের) কাফ্ফারা হয়ে
যাবে; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর
অবতারিত বিধান অনুযায়ী
ফাইসালা করেনা, তাহলে
তো এমন ব্যক্তি পূর্ণ যালিম।

تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ
وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

ইয়াহুদীদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তাদের কিতাবে
পরিষ্কার ভাষায় যে হুকুমগুলি ছিল তারা তো খোলাখুলিভাবে তারও বিরোধিতা
করছে এবং দুষ্টামি করে ও বেপরওয়া ভাব দেখিয়ে সেগুলিও পরিত্যাগ করছে।
ইয়াহুদ বানু নাযীরকে ইয়াহুদ বানু কুরাইযার বিনিময়ে হত্যা করছে, অথচ ইয়াহুদ
বানু কুরাইযাকে ইয়াহুদ বানু নাযীরের বিনিময়ে হত্যা করছেন। অনুরূপভাবে
তারা বিবাহিত ব্যভিচারীর রজমের হুকুমকে বদলে দিয়েছে এবং চাবুক দ্বারা
প্রহার করা, জনসমক্ষে অপমানিত করা কিংবা মারধর করে ছেড়ে দিচ্ছে। এ
জন্যই আল্লাহর আদেশকে অগ্রাহ্য করে বিদ্রোহী হওয়ায় তাদেরকে কাফির বলা
হয়েছে। আর এখানে ইনসাফ ভিত্তিক বিচার না করার কারণে তাদেরকে যালিম
বলা হয়েছে।

কোন মহিলাকে হত্যাকারী পুরুষ হলেও তাকে হত্যা করতে হবে

ইমাম আবু নাসর ইব্নুস সাব্বাগ (রহঃ) তার ‘আশ-শামিল’ গ্রন্থে বর্ণনা
করেছেন যে, আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, (৫ : ৪৫) এ আয়াতটি বাস্তবায়ন
করা উচিত। ইমামগণও এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতের দাবী এটাই যে, যদি
কোন লোক কোন মহিলাকে হত্যা করে তাহলে তাকেও হত্যার হুকুম দিতে হবে।
এ আয়াতটি সাধারণ বলে এর দ্বারা এ দলীলও গ্রহণ করা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকের
হত্যার বিনিময়েও পুরুষ লোককে হত্যা করা হবে। কেননা এখানে **نَفْسٌ** শব্দ
রয়েছে, যদ্বারা নারী পুরুষ উভয়কেই বুঝাচ্ছে। তাছাড়া নাসাঈ ইত্যাদি হাদীস
গ্রন্থেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ইব্ন
হাযামকে (রাঃ) এক চিঠিতে লিখেছিলেন, স্ত্রীলোকের হত্যার বিনিময়ে পুরুষ

লোককে হত্যা করা হবে। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, মুসলিমদের রক্ত পরস্পরের মধ্যে সমান। (ইব্ন মাজাহ ২/৮৯৫) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কাফিরের হত্যার বিনিময়ে মুসলিমকে হত্যা করা হবেনা।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, আনাস ইব্ন মালিকের (রাঃ) ফুফু রাবী (রাঃ) এক দাসীর একটি দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তখন জনগণ তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু সে ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘কিসাস নেয়া হবে।’ তখন আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাঁর কি দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হবে?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : ‘হ্যাঁ! হে আনাস! আল্লাহর কিতাবে কিসাসের হুকুম বিদ্যমান রয়েছে।’ তখন আনাস (রাঃ) বললেন : না, না, যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! তাঁর দাঁত কখনও ভেঙ্গে ফেলা হবেনা। বস্তুতঃ হলও তাই। দাসীটির কাওম সম্মত হয়ে গেল এবং কিসাস ছেড়ে দিল, এমন কি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘অবশ্যই আল্লাহর কতক বান্দা এমন রয়েছে যে, তারা আল্লাহর উপর কোন কিছুই শপথ করলে তিনি তা পূরা করেন।’ (আহমাদ ৩/১৬৭, ফাতহুল বারী ৮/১২৪, মুসলিম ৩/১৩০২)

যখমের পরিবর্তে যখম করতে হবে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ** এবং যখমের পরিবর্তে যখম। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রাণের বদলে প্রাণ হত্যা করা হবে, কেহ কারও চোখ উঠিয়ে নিলে তারও চোখ উঠিয়ে নেয়া হবে, কেহ কারও নাক কেটে নিলে তারও নাক কেটে নেয়া হবে, কেহ কারও দাঁত ভেঙ্গে দিলে তারও দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং যখমেরও বদলা নেয়া হবে। (তাবারী ১০/৩৬০) এ ব্যাপারে আযাদ মুসলিম সবাই সমান। নারী ও পুরুষের একই হুকুম, যখন তারা ইচ্ছাপূর্বক এ কাজ করবে। তাতে গোলামেরাও পরস্পরের মধ্যে সমান। তাদের পুরুষ লোকেরাও সমান এবং স্ত্রীলোকেরাও সমান।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইসালা

মাসআলা : কেহ যদি অন্যকে যখম করে এবং তার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেয়া হয়, অতঃপর সে ঐ যখমেই মারা যায় তাহলে বিবাদীর উপর আর কিছুই

ওয়াজিব হবেনা। এ রায়ের স্বপক্ষে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমার ইব্ন শুয়াইব (রহঃ) তার পিতা হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার বর্শা দ্বারা আঘাত করে। আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে এর প্রতিকার চান। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : এখন নয়, পরে এসো। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে লোকটি আবার ক্ষতিপূরণের আবেদন করলে তিনি তাকে তা প্রদান করার আদেশ দেন। পরবর্তী সময়ে ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো খোঁড়া হয়ে গেছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আমি তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার কথা শুনলেনা। সুতরাং আল্লাহ তোমার প্রতি রাহমাত বর্ষণ করলেননা। তোমার খোঁড়া হয়ে যাওয়ার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। পরবর্তী সময়ে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আঘাত সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত আঘাতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্থগিত করার আদেশ দেন। (আহমাদ ২/২১৭)

অধিকাংশ সাহাবী এবং তাদের পরবর্তীগণের মতামত হল এই যে, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যদি আঘাতকারীকে অনুরূপ আঘাত করার অনুমতি দেয়া হয় এবং তাতে যদি প্রথম আঘাতকারী মারা যায় তজ্জন্য প্রথম আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির লোকদেরকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবেনা।

অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করে দিলে সে দায়মুক্ত

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ** অতঃপর যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দিবে, ওটা ঐ যখমকারীর জন্য কাফফারা হয়ে যাবে এবং যাকে যখম করা হয়েছে তার জন্য সাওয়াব বা সাওয়াবের কারণ হবে, যা আল্লাহরই দায়িত্বে রয়েছে। এ বিষয়ে আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে কেহ যদি দয়া পরবশ হয়ে ক্ষমা করে দেয় তাহলে আক্রমণকারী অপরাধ হতে মুক্ত হয়ে যাবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সাওয়াব লাভ করবে। (তাবারী ১০/৩৬৭) সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) বলেন, ‘আতা ইবনুস সাবি (রহঃ) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি আক্রমণকারীর উপর থেকে তার দাবী তুলে নেয় তাহলে আক্রমণকারী তার দায় থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে, এ জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পাবে। (তাবারী ১০/৩২৬) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ এ আয়াত সম্পর্কে যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন যে, এ ব্যক্তি হল যাকে যখম বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। হাসান বাসরী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং আবু ইসহাক আল হামদানীও (রহঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘কোন ব্যক্তির দেহে যদি কারও দ্বারা কোন যখম হয় এবং সে তাকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে আল্লাহ তার সেই পরিমাণ পাপ ক্ষমা করে দেন।’ (আহমাদ ৫/৩১৬) ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৬/৩৩৫, ১০/৩৬৪) আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ যারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফাইসালা করেনা তারা যালিম।’ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কুফরীর মধ্যে কম বেশি আছে, যুলুমেরও কম বেশি আছে এবং ফিসকের মধ্যেও শ্রেণীভেদ রয়েছে।

৪৬। আর আমি তাদের পর ঈসা ইবনে মারইয়ামকে এই অবস্থায় প্রেরণ করেছিলাম, সে তার পূর্ববর্তী কিতাবের (তাওরাতের) সত্যায়নকারী ছিল এবং আমি তাকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি, যাতে হিদায়াত এবং আলো ছিল, আর ওটা তার পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের সত্যতা সমর্থন করত এবং এটা সম্পূর্ণ রূপে মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও নাসীহত ছিল।

٤٦. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم
بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ
وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى
وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

৪৭। আহলে ইঞ্জিলের উচিত -
আল্লাহ তাতে যা কিছু অবতীর্ণ
করেছেন, তদনুযায়ী হুকুম
প্রদান করা, আর যে ব্যক্তি
আল্লাহর অবতারিত (বিধান)
অনুযায়ী হুকুম প্রদান করেনা,
তাহলে তো এ রূপ লোকই
পাপাচারী ফাসিক।

٤٧. وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ
بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَّمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ

আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) ইঞ্জিল প্রদান করেছিলেন এবং
তার প্রশংসা করেছেন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ আমি ঈসাকে বানী ইসরাঈলের শেষ নাবী করে পাঠিয়েছিলাম। সে তাওরাতকে বিশ্বাস করত এবং ওর নির্দেশ অনুযায়ী লোকদের মধ্যে ফাইসালা করত। আমি তাকে স্বীয় কিতাব ইঞ্জিল প্রদান করেছিলাম। তাতে সত্যের হিদায়াত ছিল, আর ছিল কাঠিন্য ও জটিলতার ব্যাখ্যা এবং পূর্ববর্তী কিতাবগুলির অনুকরণ। কতগুলি মাসআলার তাতে স্পষ্ট ফাইসালা ছিল, যেগুলিতে ইয়াহুদীরা মতভেদ সৃষ্টি করেছিল। এ জন্যই আলেমদের প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে যে, ইঞ্জিল তাওরাতের কতক হুকুম মানসূখ করে দিয়েছে। ইঞ্জিল দ্বারা পুণ্যবান লোকেরা হিদায়াত, ওয়ায ও উপদেশ লাভ করত এবং এর ফলে তারা সাওয়াব লাভের প্রতি আগ্রহী হত এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকত। 'ওয়ায য়াহকুম আহলুল ইঞ্জিলে' এখানে 'আহলাল ইঞ্জিলে'ও পড়া হয়েছে। এ অবস্থায় وَلِيَحْكُمَ শব্দটি কী এর অর্থে হবে। তখন ভাবার্থ হবে, আমি ঈসাকে ইঞ্জিল এ জন্যই প্রদান করেছি যেন সে তার যুগে তার অনুসারীদেরকে ওটা অনুযায়ীই পরিচালিত করে। আর যদি মাশহুর কিরা'আত وَلِيَحْكُمَ অনুযায়ী لَاَم -কে আমারের لَاَم মনে করা হয় তাহলে তখন অর্থ হবে : তাদের উচিত যে, তারা ইঞ্জিলের সমস্ত আহকামের উপর ঈমান আনে এবং ওটা অনুযায়ী ফাইসালা করে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا
 أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيُزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ
 طُغْيَيْنًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

তুমি বলে দাও : হে আহলে কিতাব! তোমরা কোনো পথেই প্রতিষ্ঠিত নও যে পর্যন্ত না তাওরাত, ইঞ্জীল এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে তার উপর আমল কর; আর অবশ্যই যা তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয় তা তাদের মধ্যে অনেকেরই নাফরমানী ও কুফর বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়। অতএব তুমি এই কাফিরদের জন্য মনঃক্ষুন্ন হয়োনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৬৮) অন্যত্র আছে :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
 عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
 وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
 وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

যারা সেই নিরক্ষর রাসুলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়, যে মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে, আর সে তাদের জন্য পবিত্র বস্ত্রসমূহ বৈধ করে দেয় এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্ত্রকে তাদের প্রতি অবৈধ করে, আর তাদের উপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন হতে তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং তার প্রতি যারা ঈমান রাখে, তাকে সম্মান করে এবং সাহায্য করে ও সহানুভূতি প্রকাশ করে, আর সেই আলোকের অনুসরণ করে চলে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারাই (ইহকালে ও পরকালে) সাফল্য লাভ করবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৭) যারা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশমত ফাইসালা করেনা তারা আল্লাহর আনুগত্য হতে বেরিয়ে পড়েছে, সত্যকে পরিত্যাগ করেছে, বাতিলের উপর আমল করেছে। আয়াতটির জার্ণনা

ধারা অনুযায়ী ইহাই প্রকাশ পাচ্ছে যে, এটি খৃষ্টানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর পূর্বে এ বর্ণনা দেয়াও হয়েছে।

৪৮। আর আমি এই কিতাবকে (কুরআন) তোমার প্রতি নাযিল করেছি যা নিজেও সত্যতা গুণে বিভূষিত, (এবং) ওর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরও সত্যায়নকারী এবং ঐ সব কিতাবের বিষয় বস্তুর সংরক্ষকও। অতএব তুমি তাদের পারস্পরিক বিষয়ে আল্লাহর অবতারিত এই কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা কর, যা তুমি প্রাপ্ত হয়েছ, তা থেকে বিরত হয়ে তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করা, তোমাদের প্রত্যেকের (সম্প্রদায়) জন্য আমি নির্দিষ্ট শারীয়ত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম; আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সকলকে একই উম্মাত করে দিতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি এ কারণে যে, যে ধর্ম তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তাতে তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করবেন, সুতরাং তোমরা কল্যাণকর বিষয়সমূহের দিকে ধাবিত হও; তোমাদের সকলকে

৪৮. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ
وَمُهِمِّنَا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم
بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ
مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا
مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
وَّاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي
مَا آتَيْنَاكُمْ ۚ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ
مَرْجِعُكُمْ

আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করছিলে।

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ

৪৯। আর আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, তুমি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে এই প্রেরিত কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করবে এবং তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেনা, এবং তাদের দিক থেকে সতর্ক থাকবে যেন তারা তোমাকে আল্লাহ প্রেরিত কোন নির্দেশ হতে বিভ্রান্ত করতে না পারে; অনন্তর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে দৃঢ় বিশ্বাস রেখ, আল্লাহর ইচ্ছা এটাই যে, তাদেরকে কোন কোন পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করবেন; আর বহু লোক তো নাফরমানই হয়ে থাকে।

٤٩. وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ
بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ
كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

৫০। তাহলে কি তারা অজ্ঞতা যুগের মীমাংসা কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসীদের কাছে মীমাংসা কার্যে আল্লাহর চেয়ে কে উত্তম ফাইসালাকারী?

٥٠. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا
لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের জন্য কুরআনী আইনের সাহায্য নিতে হবে

তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করার পর এখন কুরআনুল হাকীমের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
নাযিল করেছি। নিশ্চিতরূপে এটি আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে এবং এটি তাঁরই কালাম বা কথা। **الْكِتَابِ** এটি পূর্ববর্তী সমুদয় কিতাবের সত্যতা স্বীকার করেছে এবং ঐসব কিতাবেও এর প্রশংসা ও গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে। আর ঐ কিতাবগুলির মধ্যে এ বর্ণনাও রয়েছে যে, এ পবিত্র ও সর্বশেষ কিতাবটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুলের উপর অবতীর্ণ হবে। সুতরাং প্রত্যেক জ্ঞানী লোক এর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং একে মেনে চলে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ ءَامِنُوا بِهِمْ أَوْ لَا تُوْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا

বল : তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বলে : আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১০৭-১০৮)

‘তিনি পূর্ববর্তী রাসূলদের মাধ্যমে যেসব সংবাদ দিয়েছিলেন, সবগুলিই সত্যে পরিণত হয়েছে এবং সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেই গেছেন। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : ‘মুহাইমিন’ অর্থ হল বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআন সম্পর্কে বলেছেন যে, ইহা এমন একটি বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ যা পূর্ববর্তী পবিত্র কিতাবসমূহের বাণীর উপর স্থান পেয়েছে। (তাবারী ১০/৩৭৯) ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কাব (রহঃ), আতিয়াহ (রহঃ) হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) ‘আতা আল

খুরাসানী (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১০/৩৭৭, ৩৮০) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন : কুরআন যেহেতু পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে লিখিত বাণীসমূহের মূলসহ লিখিত সর্বশেষ নাযিলকৃত বিশ্বস্ত কিতাব, তাই পূর্বের কোন কিতাবে লিখিত কোন বিষয় যদি কুরআনে থাকে তাহলে তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে, আর যদি কুরআনে না থাকে এবং পূর্বের কিতাবেও না থাকে তাহলে তা (উক্ত কিতাবে পরিবর্তন করা হয়েছে এ বিশ্বাস রেখে) বিশ্বাস করা যাবে না। আল ওয়ালিবি (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে ‘মুহাইমিনান’ শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘সাক্ষী’ (তাবারী ১০/৩৭৭) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। আল আওফি (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, ‘মুহাইমিনান’ শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্যান্য কিতাবসমূহের উপর প্রাধান্য লাভকারী। (তাবারী ১০/৩৭৯) এ সমস্ত অর্থই ‘মুহাইমিন’ শব্দের অর্থের আওতায় এসে যায়। আল কুরআন একদিকে হল বিশ্বাসযোগ্য, সাক্ষী এবং অন্যদিকে কুরআনের পূর্বে যতগুলি ধর্মীয় গ্রন্থ আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেছেন তাদের সবার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রভাব বিস্তারকারী ও সত্যায়নকারী। আল্লাহ তা‘আলা মহান মর্যাদাময় কুরআনকে সর্বশেষ কিতাব হিসাবে মানব কল্যাণের জন্য নাযিল করেছেন যাতে কোন ঋণটি নেই এবং যাতে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সঠিক বাণীসমূহও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং নতুন নতুন বিষয়সমূহও আল্লাহর তরফ থেকে সংযোজন করা হয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা একে আস্থাভাজন, সাক্ষী এবং অন্যান্য কিতাবের উপর স্থান দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, সর্বশেষ কিতাব কুরআনের বাণীকে তিনিই সংরক্ষণ করবেন। যেমন তিনি বলেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

আমিই যিক্র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক। (সূরা হিজর, ১৫ : ৯) আল্লাহ বলেন :

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

অনুযায়ী বিচার কর, আরাব হোক অথবা অনারাব হোক, শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত হোক। ‘আল্লাহর নাযিলকৃত’ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অহী। হয় সেটা এ কিতাবের আকারেই হোক, না হয় আল্লাহ তা‘আলা যে পূর্ববর্তী আহকাম তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন সেটাই হোক। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ

আয়াতের পূর্বে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা‘আলা তাদের মধ্যে ফাইসালা করা ও না করার অধিকার দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর অহী মোতাবেক ফাইসালা করা যরুরী। (তাবারী ১০/৩৩২) তাঁকে বলা হচ্ছে : **وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ** হে নাবী! এ দুর্ভাগা অজ্ঞরা নিজেদের পক্ষ থেকে যে আহকাম তৈরী করে নিয়েছে এবং ওর কারণে আল্লাহর কিতাবকে যে পরিবর্তন করে ফেলেছে, কোনক্রমেই তুমি তাদের প্রবৃত্তির পিছনে পড়ে সত্যকে ছেড়ে দিওনা। তাদের প্রত্যেকের জন্য আমি রাস্তা এবং পস্থা তৈরী করে দিয়েছি। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, **‘شُرْعَةٌ’** শব্দের অর্থ হচ্ছে মসৃণ পথ। (তাবারী ১০/৩৮৭) এর পরে বলা হয়েছে :

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ‘যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তোমাদের সকলকে একই উম্মাত করে দিতেন।’ অতএব জানা গেল যে, পূর্ব সম্বোধন শুধু এ উম্মাতকেই নয়, বরং এর সম্বোধন হচ্ছে সকল উম্মাতের প্রতিই। আর এতে আল্লাহ তা‘আলার খুব বড় ও পূর্ণ ক্ষমতার বর্ণনা রয়েছে যে, যদি তিনি চাইতেন তাহলে সমস্ত লোককে একই শারীয়াত ও একই দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করতেন, কোন সময়েও কোন প্রকার পরিবর্তন আসতনা। কিন্তু মহান প্রভুর পরিপূর্ণ হিকমাত ও কলাকৌশলের চাহিদা এই যে, তিনি পৃথক শারীয়াত নির্ধারণ করবেন, একের পর অন্য নাবী প্রেরণ করবেন, কোন নাবীর হুকুমকে পরবর্তী নাবীর মাধ্যমে বদলিয়ে দিবেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সমস্ত দীন মানসূখ বা রহিত হয়ে যায়। তাঁকে সারা বিশ্বের জন্য সর্বশেষ নাবী করে পাঠানো হয়। ঘোষিত হচ্ছে :

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ এ বিভিন্ন শারীয়াত দেয়া হয়েছে শুধু তোমাদের পরীক্ষার জন্য, যেন তিনি তোমাদের বাধ্য ও অনুগত লোকদেরকে পুরস্কার এবং অবাধ্য লোকদেরকে শাস্তি দেন। এটাও বলা হয়েছে যে, তিনি যেন ঐ জিনিস দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন যা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ কিতাব। অতএব তোমাদের উচিত মঙ্গল ও উত্তম কাজের দিকে দৌড়ে যাওয়া, আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করা, তাঁর শারীয়াত মেনে চলতে আগ্রহী হওয়া এবং সর্বশেষ কিতাব এবং সর্বশেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে প্রাণে আনুগত্য করা। হে লোকসকল! তোমাদের সকলেরই প্রত্যাবর্তন ও আশ্রয়স্থল

আল্লাহরই কাছে। সেখানে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মতভেদের মধ্যে প্রকৃত মত সম্পর্কে অবহিত করবেন। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিতদের তিনি পুরস্কৃত করবেন এবং মিথ্যা ও বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত বিরুদ্ধবাদী ও প্রবৃত্তি-পূজারীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন, যারা হককে মানা তো দূরের কথা, বরং হকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রথমটিই উত্তম।

অতঃপর প্রথম কথার প্রতি আরও গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে যে, আল্লাহ যে হুকুম করেছেন তদনুরূপ বিচার করতে এবং ওর বিপরীত থেকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে : ‘হে মুহাম্মাদ! তুমি যেন এ বিশ্বাসঘাতক, চক্রান্তকারী, মিথ্যাবাদী, কাফির ইয়াহুদীর কথার ফাঁদে পড়ে আল্লাহর কোন হুকুম থেকে এদিক ওদিক চলে না যাও। যদি তারা তোমার হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং শারীয়াত বিরোধী কাজে লিপ্ত হয় তাহলে জেনে রেখ যে, তাদের কলংকময় কার্যাবলীর কারণে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি অবশ্যই নেমে আসবে। এ জন্যই ভাল কাজের তাওফীক তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। **وَإِنَّ كَثِيرًا مِّن**

النَّاسِ لَفَاسِقُونَ অধিকাংশ লোকই হচ্ছে ফাসেক অর্থাৎ হকের আনুগত্য হতে বাইরে, আল্লাহর দীনের বিরোধী এবং হিদায়াত হতে দূরে। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাল্হু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০৩) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন :

وَإِنْ تَطَّعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথা মত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। (সূরা আন‘আম, ৬ : ১১৬)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : কা‘ব ইব্ন আসাদ, ইব্ন সালুবা, আবদুল্লাহ ইব্ন শুরা‘ এবং শাস ইব্ন কায়িস বলাবলি করছিল : চল আমরা মুহাম্মাদের কাছে যাই এবং তাকে তার ধর্ম হতে বিচ্যুত করার চেষ্টা করি। সুতরাং তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেল এবং বলল : আমাদের এবং আমাদের কাওমের মধ্যে একটা বিবাদ

আছে, আপনি আমাদের মতানুযায়ী এর মীমাংসা করে দিন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওটা অস্বীকার করলেন। ঐ সম্পর্কেই এ আয়াতটি (৫ : ৪৯) অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১০/৩৯৩)

এরপর মহান আল্লাহ ঐ লোকগুলোর কথার প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়ে বলছেন : যারা আল্লাহর এমন হুকুম থেকে দূরে সরে থাকে যার মধ্যে সমস্ত মঙ্গল বিদ্যমান রয়েছে এবং সমস্ত অমঙ্গল দূরে রয়েছে, এরূপ পবিত্র হুকুম থেকে সরে গিয়ে কিয়াসের দিকে, কু-প্রবৃত্তির দিকে এবং ঐসব হুকুমের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা লোকেরা কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে নিয়েছে। যেমন আহলে জাহেলিয়াত ও আহলে দালালাত (গুমরাহ সম্প্রদায়) নিজেদের মত ও মর্জি মোতাবেক হুকুম-আহকাম জারী করত। যেমন তাতারীরা রাষ্ট্রীয় কাজে চেঙ্গিস খানী হুকুমের অনুসরণ করত, যার নাম হল ‘আল-ইয়াসিক’। ওটা ছিল বহু ধর্মের সম্মিলিত আহকামের দফতর, যা বিভিন্ন শারীয়াত ও মাযহাব হতে ছেঁটে নেয়া হয়েছিল। ওটা ছিল ইয়াহুদিয়াত, নাসরানিয়াত, ইসলামিয়াত ইত্যাদি সমস্ত আহকামের সমষ্টি, আবার তাতে এমনও কতক আহকাম ছিল যা শুধুমাত্র তার নিজস্ব জ্ঞান, মত ও চিন্তা দ্বারা আবিষ্কার করা হয়েছিল এবং যার মধ্যে প্রবৃত্তিরও সংযোগ ছিল। পরবর্তীতে ঐ সমষ্টিই তাদের সন্তানদের নিকট আমলের যোগ্য বিবেচিত হত এবং ওকেই তারা কিতাব ও সুন্নাতের উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিল। প্রকৃতপক্ষে এরূপ কার্য সম্পাদনকারীরা কাফির এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব, যে পর্যন্ত না তারা ঐসব ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং যে কোন ছোট, বড়, গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন হুকুম গ্রহণ না করে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ তাহলে কি তারা অজ্ঞতার যুগের মীমাংসা কামনা করে? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوفُونَ দৃঢ় বিশ্বাসীদের কাছে মীমাংসা কাজে আল্লাহর চেয়ে উত্তম কে হতে পারে? আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া আর কার হুকুম বেশি ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক হতে পারে? ঈমানদার ও পূর্ণ বিশ্বাসীগণ খুব ভাল করেই জানে যে, আহকামুল হাকিমীন, আরহামুর রাহিমীনের চেয়ে বেশি উত্তম, স্বচ্ছ, সহজ ও পবিত্র আহকাম, মাসায়েল এবং কাওয়ায়েদ আর কারও হতে পারেনা। মা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়া-পরবশ হতে পারে

তার চেয়েও বেশি তিনি তাঁর সৃষ্টজীবের উপর মেহেরবান ও দয়ালু। তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান, বিরাট শক্তি এবং ন্যায় ও ইনসারফের অধিকারী। তাবারানীর (রহঃ) হাদীস গ্রন্থে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘ঐ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত যে ইসলামে অজ্ঞতা যুগের নিয়ম-কানুন ও চাল-চলন অনুসন্ধান করে এবং বিনা কারণে কেহকে হত্যা করতে উদ্যত হয়।’ এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতেও রয়েছে এবং তাতে কিছু বেশি বর্ণনা আছে। (তাবারানী ১০/৩৭৪, ফাতহুল বারী ১২/২১৯)

৫১। হে মু‘মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তারা পরস্পর বন্ধু; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেননা।

৫১. يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

৫২। এ কারণেই যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে তাদেরকে তোমরা দেখেছ যে, তারা দৌড়ে দৌড়ে তাদের (কাফিরদের) মধ্যে প্রবেশ করছে, এবং তারা বলে : আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে না কি! অতএব

৫২. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا سَآءٌ مَّا لَكُم بَلَاءٌ

আশা করা যায় যে, অচিরেই আল্লাহ (মুসলিমদের) পূর্ণ বিজয় দান করবেন অথবা অন্য কোন বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে (প্রকাশ করবেন), অনন্তর তারা নিজেদের অন্তরে লুকায়িত মনোভাবের কারণে লজ্জিত হবে।

دَايِرَةٌ ۚ فَعَسَىٰ ۖ لِلَّهِ أَن يَأْتِيَ
بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ
فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي
أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ

৫৩। আর মুসলিমরা বলবে : আরে! এরাই নাকি তারা, যারা অতি দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নামে শপথ করত, আমরা তোমাদের সাথেই আছি? এদের সমস্ত কাজই ব্যর্থ হয়ে গেছে, ফলে তারা অকৃতকার্য হয়ে রইল।

۵۳. وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ
جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۖ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا
خَاسِرِينَ

ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং

ইসলামের শত্রুদের বন্ধু রূপে গ্রহণ করা যাবেনা

আল্লাহ তা'আলা ইসলামের শত্রু ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করছেন। তিনি বলেন : তারা কখনও তোমাদের বন্ধু হতে পারেনা, কেননা তোমাদের ধর্মের প্রতি তাদের হিংসা ও শত্রুতা রয়েছে। হ্যাঁ, তারা নিজেরা একে অপরের বন্ধু। وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব কায়েম করবে তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। উমার (রাঃ) আবু মূসাকে (রাঃ) এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন করেছিলেন এবং এ আয়াতটি পড়ে গুনিয়েছিলেন।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার উমার (রাঃ) আবু মূসা আল আশআরীকে (রাঃ) তার প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব পাঠাতে আদেশ করেন। আবু মূসার (রাঃ) একজন খৃষ্টান অনুলেখক ছিল যাকে উমারের (রাঃ) কাছে পাঠিয়ে দেন। উমার (রাঃ) যেভাবে চেয়েছিলেন ঐভাবে খৃষ্টান লোকটি তার কাজ করে দেয়ায় তিনি খুবই খুশি হন এবং তার কাজের প্রশংসা করে বলেন : এ লোকটি খুবই দক্ষ। উমারের (রাঃ) কাছে সিরিয়া থেকে আসা একটি চিঠির ব্যাপারে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি এ চিঠিটি মাসজিদে বসে আমাদের সকলকে পাঠ করে শোনাবে? আবু মূসা (রাঃ) বললেন : তার পক্ষে তা সম্ভব নয়। উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : কেন, সে কি পবিত্র নয়? আবু মূসা (রাঃ) বললেন : না তা নয়, সে খৃষ্টান। অতঃপর আবু মূসা (রাঃ) বলেন : এতে উমার (রাঃ) আমার উপর রেগে গেলেন এবং আমার পাঁজরে খোঁচা দিয়ে বললেন : এখনি তাকে পবিত্র মাদীনা থেকে বের করে দাও। তুমি কি **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ** এ আয়াতটি পাঠ করনি? (দুররুল মানসুর ৩/১০০)

আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা বলেন : ‘হে লোকসকল! তোমরা এ থেকে বেঁচে থাক যে, তোমরা নিজেরা জানতেই পারবেনা, অথচ আল্লাহর কাছে ইয়াহুদী ও নাসারা বলে পরিগণিত হবে।’ বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বুঝে গেলাম যে, এ আয়াতের ভাবার্থই তার উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে :

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা গোপনে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে যোগাযোগ ও ভালবাসা স্থাপন করে এবং অজুহাত পেশ করে বলে : এরা যদি মুসলিমদের উপর জয়যুক্ত হয় তাহলে না জানি আমরা বিপদে পড়ে যাই। এ জন্যই তাদের সাথে সম্পর্ক রাখছি। কেহকে চটিয়ে আমাদের লাভ কি? আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা‘আলা বলেন : **فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ بِالْفَتْحِ** খুব সম্ভব, আল্লাহ মুসলিমদেরকে স্পষ্ট বিজয় দান করবেন। (তাবারী ১০/৪০৫) মাক্কাও তাদের হাতে বিজিত হবে এবং শাসনকর্তা তারাই হবে। আল্লাহ তাদেরই পায়ের নীচে হুকুমাত নিক্ষেপ করবেন অথবা ইয়াহুদী নাসারাদেরকে পরাজিত করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করে তাদের নিকট থেকে জিযিয়া কর আদায় করার নির্দেশ তিনি মুসলিমদেরকে প্রদান করবেন। সুতরাং আজ যেসব মুনাফিক গোপনে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে

সংযোগ স্থাপন করছে এবং নেচে খেলে বেড়াচ্ছে, সেদিন এ চালাকির জন্য তাদেরকে রক্তাশ্রু ঝরাতে হবে। তাদের পর্দা সেদিন খুলে যাবে। ঐ সময় মুসলিমরা তাদের এ চক্রান্তের উপর বিস্ময়বোধ করবে এবং বলবে : আরে! এরাই কি ওরা যারা আমাদেরকে শপথ করে করে বলত যে, তারা আমাদের সাথেই আছে! তারা যা কিছু করেছিল সব বিনষ্ট হয়ে গেল।

৫৪। হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হতে বিচ্যুত হবে, (এতে ইসলামের কোন ক্ষতি নেই, কেননা) আল্লাহ সত্বরই (তাদের স্থলে) এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে, তারা মুসলিমদের প্রতি মেহেরবান থাকবে, কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে আর তারা কোন নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করবেনা; এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তা তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।

۵۴. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مَن يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِيْنِهٖۙ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَہٗۙ اُذِلَّةٌ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٌ عَلٰی الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَاۤ اِمْرٍۭ ذٰلِكَ فَضَلُ اللّٰهُ يُوْتِيْہٗۙ مَن يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

৫৫। তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মু'মিনগণ - যারা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত প্রদান করে এবং বিনম্র।

۵۵. اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۙ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ

	<p>الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ</p>
<p>৫৬। আর যারা বন্ধুত্ব রাখবে আল্লাহর সাথে, তাঁর রাসুলের সাথে এবং মু'মিনদের সাথে, তাহলে তারা আল্লাহর দলভুক্ত হলো এবং নিশ্চয়ই আল্লাহর দলই বিজয়ী।</p>	<p>৫৬. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ</p>

ইসলাম ত্যাগ করলে অন্য আদম সন্তান দ্বারা তা পূরণ করার সাবধান বাণী

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ সংবাদ দিচ্ছেন যে, যদি কেহ এ পবিত্র দীন ত্যাগ করে, তাহলে সে ইসলামের একটুও ক্ষতি করতে পারবেনা। কেননা আল্লাহ তাদের পরিবর্তে এমন লোকদেরকে এ সত্য ধর্মের খিদমাতে লাগিয়ে দিবেন যারা সবদিক দিয়েই এদের চেয়ে উত্তম হবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ.

এবং যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩৮)

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ.

যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে হে লোকসকল! তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে অন্যদেরকে আনয়ন করতে পারেন। (সূরা নিসা, ৪ : ১৩৩) অন্য এক জায়গায় রয়েছে :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ

তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ১৯) আল্লাহ তা‘আলার জন্য এটা মোটেই কঠিন কিংবা অসাধ্য নয়। তিনি বলেন, **أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ** হল। হককে ছেড়ে দিয়ে বাতিলের দিকে ফিরে যাওয়াকে **ارْتِدَاد** বলা হয়।

أَذَلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ এখানে ঐ পূর্ণ ঈমানদারদের গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা তাদের বন্ধুদের প্রতি (অর্থাৎ মুসলিমদের প্রতি) খুবই কোমল ও নম্র হবে, কিন্তু কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

حَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। (সূরা ফাতহ, ৪৮ : ২৯) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি বন্ধুদের সামনে ছিলেন হাসিমুখ ও প্রফুল্ল চেহারা বিশিষ্ট, আর শত্রুদের সামনে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও সংগ্রামী বীর পুরুষ। মুসলিমরা জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়না, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেনা, ক্লান্ত হয়ে পড়েনা, ভীর্ণতা প্রকাশ করেনা এবং বিলাসপ্রিয় হয়না। তারা আল্লাহর ওয়াস্তে কাজ করতে গিয়ে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করেনা। আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, ভাল কাজের হুকুম করা এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখা ইত্যাদি কাজে তারা সদা নিমগ্ন থাকে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবু যার (রাঃ) বলেন : ‘আমার বন্ধু (মুহাম্মাদ (সাঃ)) আমাকে সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। (১) মিসকীনদের ভালবাসা এবং তাদের সাথে উঠাবসা করা। (২) পার্থিব বিষয়ে নিজের চেয়ে নিম্ন স্তরের লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং উচ্চ পর্যায়ের লোকের দিকে নয়র না দেয়া। (৩) রক্তের সম্পর্ক যুক্ত রাখা যদিও তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে। (৪) কারও কাছে কিছু না চাওয়া। (৫) তিক্ত হলেও সত্য কথা বলা। (৬) আল্লাহর ব্যাপারে (ধর্মীয় কাজে) কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না করা।

(৭) অধিকাংশ সময় ‘লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ এ কালেমাটি পাঠ করা, কেননা এটা আরশের কোষাগার।’ (আহমাদ ৫/৪০৫, তিরমিযী ৬/৫৩১, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৩২)

একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে : ‘মু’মিনের জন্য এটা উচিত নয় যে, সে নিজেকে লাঞ্ছিত করবে।’ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিভাবে সে নিজেকে লাঞ্ছিত করতে পারে? তিনি উত্তরে বললেন : ‘ঐ বিপদ সে নিজের উপর উঠিয়ে নিবে যা বহন করার শক্তি তার নেই।’ (আহমাদ ৫/১৫৯) ইরশাদ হচ্ছে :

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ এটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানের এ গুণাবলী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার বিশেষ দান। এর তাওফীক তাঁরই পক্ষ থেকে এসে থাকে। তাঁর অনুগ্রহ খুবই প্রশস্ত এবং তিনি মহাজ্ঞানী। এত বড় নি‘আমাতের হকদার কে তা তিনিই খুব ভাল জানেন। ঘোষিত হচ্ছে :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا তোমাদের বন্ধু কাফিরেরা নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত আল্লাহর সাথে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এবং মু’মিনদের সাথে। মু’মিন তো তারাই যাদের মধ্যে এ গুণাবলী রয়েছে যে, তারা নিয়মিতভাবে সালাত আদায় করে যা ইসলামের একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ রুকন এবং যাকাত প্রদান করে যা আল্লাহর দুর্বল ও মিসকীন বান্দাদের হক। শেষ বাক্যটি সম্পর্কে কিছু লোকের মনে সন্দেহ জেগেছে যে, ওটা الزَّكَاةَ (২ : ৩) থেকে হালা হয়েছে।

অর্থাৎ তারা রুকু অবস্থায় যাকাত প্রদান করে। এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল ধারণা। কেননা যদি এটা মেনে নেয়া হয় তাহলে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, রুকু অবস্থায় যাকাত দেয়া উত্তম। অথচ কোন আলেমই এ কথা বলেননা।

অতএব رَاكِعُونَ এর অর্থ হচ্ছে তারা আল্লাহর ঘর মাসজিদে জামা‘আতে সালাত আদায় করে এবং মুসলিমদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে সাদাকাহ হিসাবে ব্যয় করে। আয়াতগুলির শেষে ঘোষণা করা হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُغْلِبُونَ যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মু’মিনদের সাথে

বন্ধুত্ব রাখে সে আল্লাহর সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহর সেনাবাহিনীই জয়যুক্ত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كَتَبَ اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِأَنَّهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ سَيَرْزُقُهُمْ اللَّهُ مِنْ فَاتَحٍ يَوْمَ يُدْعَىٰ إِلَىٰ الْغُلَابِ ۚ إِنَّا أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۚ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ ۚ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় তুমি পাবেনা যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে, হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠী। তাদের অন্তরে (আল্লাহ) ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা; তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ২১-২২) অতএব যে কেহ আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মু'মিনদের বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট হবে, তাকে দুনিয়ায়ও সাহায্য করা হবে এবং পরকালেও সে সফলকাম হবে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতকে এ বাক্য দ্বারাই শেষ করেছেন।

৫৭। হে মু'মিনগণ! যারা তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে হাসি-তামাশার বস্তু মনে করে

۵۷. يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا

<p>তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করা, এবং আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।</p>	<p>اَلِكُتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ اَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ</p>
<p>৫৮। আর যখন তোমরা সালাতের (আযান দ্বারা) আহ্বান কর তখন তারা ওর সাথে উপহাস করে; এর কারণ এই যে, তারা এরূপ লোক যারা মোটেই জ্ঞান রাখেনা।</p>	<p>৫৮. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ</p>

কাফিরদের জন্য বিশ্বস্ত বন্ধু হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের মনে অমুসলিমদের বন্ধুত্ব ও ভালবাসার প্রতি ঘৃণা জন্মিয়ে বলছেন, তোমরা কি এমন লোকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে যারা তোমাদের পবিত্র ধর্মের সাথে হাসি তামাশা করছে? এই কাফির মুশরিকরা ইসলামের মূল কার্যাবলী (যেমন সালাত, সিয়াম, যাকাত) সম্পাদনকারীদের প্রতি তাদের নিকৃষ্টতম ভাষায় নিন্দা করে, অথচ এসব কার্যাবলী হল ইহকাল ও পরকালে সাফল্য লাভের সোপান। তারা এ সমস্ত বিষয়ে গুধু নিন্দা বা কটাক্ষই করেনা, বরং তাদের হাসি তামাসার বিষয় বলে গণ্য করে থাকে। ইহা এ জন্য যে, তারা বিভ্রান্ত, সঠিক পথ হতে বিচ্যুত এবং কঠোর হৃদয় সম্পন্ন। **من** শব্দটি **جِنْسٍ** এর জন্য এসেছে, যেমন **الْوَثَانِ** এর মধ্যে। কেহ কেহ অল কুফ্যারে পড়েছেন এবং **عُطِفَ** করেছেন। আবার কেহ কেহ ওয়াল কুফ্যারা পড়েছেন এবং **لَا تَتَّخِذُوا** এর **مَعْمُولٍ** বানিয়েছেন। তখন **عِبَارَتٍ** হবে ওয়ালাল কুফ্যারা আউলিয়ায়া এরূপ। এখানে **كُفَّارٍ** দ্বারা মুশরিকদেরকে

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا ۖ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَلَعِبًا ۖ

আহলে কিতাবের এ কাফিরেরা এবং মুশরিকরাও এ সময়েও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকে যখন তোমরা সালাতের জন্য আযান দাও। অথচ এটাই আল্লাহ তা‘আলার সবচেয়ে প্রিয় ইবাদাত। কিন্তু এ নির্বোধরা এটুকুও জানেনা। তাই তারা শাইতানের অনুসারী। আর শাইতানের অবস্থা এই যে, আযান শোনামাত্রই সে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু বের করে পলায়ন করে এবং সেখানে গিয়ে থেমে যায় যেখানে আযানের শব্দ পৌঁছেনা। তারপর আবার ফিরে আসে এবং তাকবীর শুনে পালিয়ে যায়। তাকবীর দেয়া শেষ হলেই সে পুনরায় এসে পড়ে এবং সালাত আদায়কারীকে বিভ্রান্ত করার কাজে লেগে যায়। তাকে সে এদিক ওদিকের বিস্মরণ হয়ে যাওয়া কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, এমনকি কত রাক‘আত সালাত আদায় করা হয়েছে তাও তার স্মরণ থাকেনা। যখন এরূপ অবস্থা ঘটবে তখন সালাম ফিরানোর পূর্বে দু’টি সাহ্ সাজদাহ করতে হবে। (বুখারী ৬০৮, ১২২২, ১২৩১; মুসলিম ১/২৯১, ৩৯৮) ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন যে, কুরআন কারীমে আযানের উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটিই (৫ : ৫৭) পাঠ করেন।

৫৯। তুমি বলে দাও, হে আহলে কিতাব! তোমরা আমাদের মধ্যে কোন্ কাজটি দুষণীয় পাচ্ছ এটা ব্যতীত যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা আমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতিও যা অতীতে প্রেরিত হয়েছে, অথচ তোমাদের অধিকাংশ লোক (উল্লিখিত কিতাবসমূহের) প্রতি ঈমান (এর গন্ডি) হতে বহির্ভূত।

৫৯. قُلْ يٰٓاَهْلَ ٱلْكِتٰبِ هَلْ تَنۢقِمُوۡنَ مِنَّاۤ اِلَّا اَنۡ ءَامَنَّا بِٱللّٰهِ وَمَاۤ اُنۢزِلَ اِلَيْنَا وَمَاۤ اُنۢزِلَ مِنۡ قَبۡلُ وَاَنۡ اَكۡثَرُكُمۡ فَسٰۤقُوۡنَ

৬০। তুমি বলে দাও : আমি কি তোমাদেরকে এরূপ পছন্দ হিসাবে ওটা হতেও (যাকে তোমরা মন্দ বলে জান) এরূপ সংবাদ দিব যা আল্লাহর কাছে অধিক নিকৃষ্ট? ওটা ঐ সব লোকের পছন্দ, যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন এবং যাদের প্রতি গযব নাযিল করেছেন ও যাদেরকে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করেছেন এবং যারা তাগুতের ইবাদাত করছে তারা মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সরল পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত।

৬০. قُلْ هَلْ اُنۢبِئُكُمۡ بِشَرٍّ مِّنۡ ذٰلِكَ مَثُوۡبَةً عِنۡدَ ٱللّٰهِ ؕ مَنۡ لَّعَنَهُ ٱللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَیۡهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلۡقِرۡدَةَ وَٱلۡخَنٰزِیۡرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوۡتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَٰنًا وَّاَضَلُّ عَنۡ سَوَآءِ ٱلسَّبۡیۡلِ

৬১। আর যখন তারা তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি; অথচ তারা কুফরী নিয়েই এসেছিল এবং তারা কুফরী

৬১. وَاِذَا جَآءُوۡكُمۡ قَالُوۡا

উপহাস করছে তাদেরকে বল, তোমরা আমাদের প্রতি যে বৈরীভাব পোষণ করছ তার কারণ তো এটা ছাড়া আর কিছু নয় যে, আমরা আল্লাহর উপর এবং তাঁর সমুদয় কিতাবের উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং এটা কোন ঈর্ষার কারণ নয় এবং কোন নিন্দারও কারণ নয়। এটা **اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ** হয়েছে।

وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা সেই মহিমাময় পরাক্রান্ত প্রশংসাজনক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। (সূরা বুরূজ, ৮৫ : ৮) অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ

তারা শুধু এ কারণে প্রতিশোধ নিয়েছে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৭৪) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আছে : ‘ইবন জামীল ওরই বদলা নিচ্ছে যে, সে দরিদ্র ছিল, অতঃপর আল্লাহ তাকে ধনী করে দিয়েছেন।’ (ফাতহুল বারী ৩/৩৮৮, মুসলিম ২/৬৭৬) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ

তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৫৯) অর্থাৎ সোজা-সরল পথ থেকে তোমরা সরে পড়েছ। অতএব এ আয়াতাত্মশের অর্থ হচ্ছে : আমরা এও বিশ্বাস করি যে, তোমাদের অধিকাংশই সীমা লংঘনকারী, সত্য পথ হতে বিচ্যুত।

কিয়ামাত দিবসে আহলে কিতাবরা কঠোর শাস্তি প্রাপ্ত হবে

قُلْ هَلْ أَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ

যে ধারণা করছ, তাহলে এসো, তোমাদেরকে বলি যে, আল্লাহর নিকট প্রতিফল প্রাপক হিসাবে কে অধিক নিকৃষ্ট! আর এরূপ তোমরাই বটে। কেননা এরূপ অভ্যাস তোমাদের মধ্যেই পাওয়া যায়।

অর্থাৎ যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদেরকে স্বীয় রাহমাত থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছেন, যাদের উপর তিনি এত রাগান্বিত হয়েছেন যে, এরপর আর সন্তুষ্ট হওয়ার নয় এবং যাদের কোন কোন দলের আকার বিকৃত করে তাদেরকে তিনি বানর ও শূকরে পরিণত করেছেন তারা তো তোমরাই। সূরা

বাকারায় এর পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : এখন যেসব বানর ও শূকর রয়েছে এগুলো কি ওরাই? তিনি উত্তরে বলেছিলেন :

‘যে কাওমের উপর আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হয় তাদের বংশধর কেহ থাকেনা। (অর্থাৎ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেন)। তাদের পূর্বেও শূকর ও বানর ছিল।’ (মুসলিম ৪/২০৫১) এ রিওয়ায়াতটি বিভিন্ন শব্দে সহীহ মুসলিম ও নাসাঈতেও রয়েছে।

وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ভাবার্থ এই যে, তোমরা ওরাই যাদের মধ্যে তাগুতের পূজা করা হয়েছে। মোট কথা, আহলে কিতাবকে দোষারোপ করে বলা হচ্ছে : তোমরা তো আমাদেরকে দোষারোপ করছ, অথচ আমরা একাত্মবাদী। আমরা শুধু এক আল্লাহকে মেনে থাকি। আর তোমরা তো হচ্ছে ওরাই যে, তোমাদের মধ্যে সব কিছুই পাওয়া যায়। এ কারণেই শেষে বলা হয়েছে, এ লোকেরাই সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে খুবই নিকৃষ্ট পর্যায়ে। তারা সীরাতে মুসতাকীম থেকে বহু দূরে। তারা ভুল ও বিভ্রান্তির পথে রয়েছে। এখানে **اسْمُ تَفْضِيلٍ** ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এত অধিক পথভ্রষ্ট আর কেহই হতে পারেনা। যেমন নিম্নের আয়াতে রয়েছে।

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا

সেদিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৪)

মুনাফিকরা ঈমান প্রদর্শন করলেও, অন্তরে কুফরী গোপন রাখে

অতঃপর মুনাফিকদের একটি বদ অভ্যাসের কথা আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিয়ে বলেন : বাহ্যিকভাবে তো মু‘মিনদের সামনে তারা ঈমান প্রকাশ করে, কিন্তু তাদের ভিতর কুফরীতে পরিপূর্ণ। তারা তোমার কাছে কুফরী অবস্থায়ই আগমন করে এবং যখন ফিরে যায় তখন কুফরী অবস্থায়ই ফিরে যায়। তোমার কথা ও উপদেশ তাদের উপর মোটেই ক্রিয়াশীল হয়না। ভিতরের এ কলুষতা দ্বারা কি উপকার তারা লাভ করবে? যাঁর কাছে তাদের কাজ, তিনি আলীমুল গায়িব। অদৃশ্যের সমস্ত খবরই

তিনি জানেন। তাদের অন্তরের গোপন কথা তাঁর কাছে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সেখানে গিয়ে তাদেরকে এর পূর্ণ ফল ভোগ করতে হবে।

হে নাবী! তুমি তো স্বচক্ষে দেখছ যে, তারা দৌড়ে দৌড়ে কিভাবে পাপ, যুল্ম এবং ঘুষ ও সুদ ভক্ষণে নিপতিত হচ্ছে! তাদের কৃতকর্মগুলো অত্যন্ত জঘন্য হয়ে গেছে।

নিষিদ্ধ কাজ হতে বাধা না দেয়ার ইয়াহুদী-খৃষ্টান যাজকদের নিন্দা করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّخْتَ

তাদের অলী-উল্লাহরা অর্থাৎ আবেদ ও আলেমরা তাদেরকে এসব কাজ থেকে বিরত রাখছেন কেন? প্রকৃতপক্ষে এসব আবেদ ও আলেমদের (রহবান ও আহবার) কাজগুলোও খারাপ হয়ে গেছে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, أَحْبَارُ হল তারা যাদের ধর্মীয় জ্ঞান আছে কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই, আর رَبَّانِيُّونَ দের ধর্মীয় জ্ঞানের সাথে সাথে প্রশাসনিক ক্ষমতাও রয়েছে। (তাবারী ১০/৪৫০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আলেম ও ফকীর দরবেশদের প্রতি ধর্মকের জন্য এর চেয়ে বেশি কঠিন আয়াত কুরআন কারীমে আর একটিও নেই। (তাবারী ১০/৪৪৯) একদা আলী (রাঃ) এক খুৎবায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর বলেন : ‘হে লোকসকল! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তারা অসৎ কাজে লিপ্ত থাকত এবং তাদের রহবান এবং আহবারগণ এতে বাধা দিতনা। তাদের লোকেরা ঐ খারাপ কাজগুলো করতে থেকেছে, অথচ তাদের প্রতি হদ জারী করা হতনা। যখন এটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হল তখন আল্লাহ তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি অবতীর্ণ করলেন। সুতরাং তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যে শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল সেই শাস্তিই তোমাদের উপর অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তোমাদের উচিত মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। বিশ্বাস রেখ যে, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান না তোমাদের রিয্ক বা খাদ্য কমাবে, আর না তোমাদের মৃত্যু নিকটবর্তী করবে। (কানযুল উম্মাল ৩/৩৬৩)

সুনান আবু দাউদে জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : ‘যে কাওমের মধ্যে কোন লোক অবাধ্যতার কাজ করে এবং ঐ কাওমের লোকগুলো বাধা দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে ঐ কাজ থেকে বিরত রাখেনা, তাহলে আল্লাহ সবারই উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বেই স্বীয় শাস্তি নাযিল করবেন।’ সুনান ইব্ন মাজাহয়ও এ বর্ণনাটি রয়েছে। (আবু দাউদ ৪/৫১০, ইব্ন মাজাহ ২/১৩২৯)

৬৪। আর ইয়াহুদীরা বলে : আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ, এবং তাদের এই উক্তির দরুণ তারা অভিশপ্ত। বরং তাঁর (আল্লাহর) তো উভয় হাত উন্মুক্ত, যে রূপ ইচ্ছা তিনি ব্যয় করেন; আর যে বিষয় তোমার নিকট তোমার রবের পক্ষ হতে প্রেরিত হয় তা তাদের মধ্যে অনেকের নাফরমানী ও কুফর বৃদ্ধির কারণ হয়, এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা নিক্ষেপ করেছি কিয়ামাত পর্যন্ত; যখনই (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে চায়, আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন; তারা ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি ছড়িয়ে বেড়ায়; আর আল্লাহ অশান্তি বিস্তার - কারীদেরকে ভালবাসেননা।

٦٤. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ
مَغْلُولَةٌ ۖ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا
بِمَا قَالُوا ۚ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ
يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ
كَثِيرًا مِّنْهُمْ ۖ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَالْقَيْنَا
بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا
نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

৬৫। আর এই আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও নাসারাহ) যদি ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, আমি অবশ্যই তাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে নি‘আমতের উদ্যানসমূহে দাখিল করতাম।

৬৫. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ
ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ
النَّعِيمِ

৬৬। আর যদি তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তাদের রবের পক্ষ হতে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, ওর থেকে যথারীতি ‘আমলকারী হত তাহলে তারা উপর (অর্থাৎ আকাশ) হতে এবং নিম্ন (অর্থাৎ যমীন) হতে প্রাচুর্যের সাথে আহার পেত; তাদের একদল তো সরল পথের অনুগামী; আর তাদের অধিকাংশই এরূপ যে, তাদের কার্যকলাপ অতি জঘন্য।

৬৬. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ
رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ
وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ
مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا
يَعْمَلُونَ

ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত বন্ধ

অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের একটি জঘন্য উক্তি বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা মহান আল্লাহকে কৃপণ বলত। তারা আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলাকে দরিদ্রও বলত। আল্লাহ তা‘আলার পবিত্র সত্তা সেই অপবিত্র উক্তি বহু উর্ধ্বে। সুতরাং ‘আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে আছে’ এটার ভাবার্থ তাদের নিকট এই ছিলনা যে, তাঁর হাত বন্ধনযুক্ত রয়েছে। বরং এর দ্বারা তারা তাঁর কৃপণতা বুঝাতে চেয়েছিল। (তাবারী ১০/৪৫২) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ বাকরীতিই কুরআনুল হাকীমের অন্য জায়গায়ও রয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
مَلُومًا مَّحْسُورًا

তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়োনা এবং একবারে মুক্ত হস্তও হয়োনা; তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃশ্ব হবে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ২৯) সুতরাং এ আয়াতে আল্লাহ কৃপণতা থেকে এবং অযথা ও অতিরিক্ত খরচ করা থেকে বিরত থাকতে বললেন। অতএব ইয়াহুদীদেরও ‘হাত বন্ধনযুক্ত রয়েছে’ এ কথার উদ্দেশ্য এটাই ছিল। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, ফিনহাস নামক ইয়াহুদী এ কথা বলেছিল। (তাবারী ১০/১৫৩) এ অভিশপ্ত ইয়াহুদী বলেছিল :

إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ

আল্লাহ দরিদ্র ও আমরা ধনবান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮১) ফলে আবু বাকর (রাঃ) তাকে প্রহার করেছিলেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, কৃপণ, লাঞ্চিত এবং কাপুরুষ হচ্ছে তারা নিজেরাই। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

أَمْ هُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمَلِكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. أَمْ تَحْسُدُونَ
النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا

তাহলে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ রয়েছে? বস্তুতঃ তখন তারা লোকদেরকে কণা পরিমাণও প্রদান করবেনা। তাহলে কি তারা লোকদের প্রতি এ জন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় সম্পদ হতে কিছু দান করেছেন? ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি ইবরাহীম বংশীয়গণকে গ্রন্থ ও হিকমাত দান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করেছি। (সূরা নিসা, ৪ : ৫৩-৫৪)

আল্লাহর হাত অব্যাহত, প্রশস্ত

আল্লাহ বলেন : كَيْفَ يَشَاءُ ۚ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ তো বরং তারা তো অন্যদের নি‘আমাত দেখে জ্বলে পুড়ে মরে। তারা লাঞ্চিত লোক, বরং আল্লাহর হাত খোলা রয়েছে, তিনি অনেক কিছু খরচ করতে রয়েছেন, তাঁর ফসল ও

অনুগ্রহ প্রশস্ত, তাঁর দান সাধারণ। সব জিনিসের ভাণ্ডার তাঁরই হাতে রয়েছে। সমস্ত সৃষ্টজীব দিন-রাত সব জায়গায় তাঁরই মুখাপেক্ষী। যেমন আল্লাহ বলেন :

وَأَتَيْنُكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا^٥

إِنَّا لَآلِنَسْنَن لَظَلُّومٌ كَفَّارٌ

আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু চেয়েছ; তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা; মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৩৪) মুসনাদ আহমাদে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

আল্লাহর দান হাত পরিপূর্ণ। রাত দিনের খরচ তাঁর ধনভাণ্ডারকে কমাযনা। শুরু হতে আজ পর্যন্ত যত কিছু তিনি স্বীয় মাখলুককে তাঁর দান হাতে যা রয়েছে তা থেকে দান করেছেন তা তাঁর ধনভাণ্ডারকে একটুও হ্রাস করেনি। তাঁর আরশ পানির উপর। তাঁর অপর হাতে ধরে রেখেছেন যা তিনি উঁচু করেন এবং নীচু করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : তোমরা আমার পথে খরচ কর, আমিও তোমাদেরকে দান করব। (আহমাদ ২/৩১৩, ফাতহুল বারী ১৩/৪১৫, মুসলিম ২/৬৯১)

মুসলিমদের প্রতি অহী নাযিল হলে ইয়াহুদীদের হিংসা ও কুফরী বৃদ্ধি পায়

ঘোষণা করা হচ্ছে : وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا

وَكَفْرًا হে নাবী! তোমার কাছে আল্লাহর নি‘আমাত যত বৃদ্ধি পাবে, এ শাইতানদের কুফর ও হিংসা-বিদ্বেষ ততো বেড়ে যাবে। অনুরূপভাবে যেমন মু‘মিনদের ঈমান, আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে তেমনই এসব ইয়াহুদী ও মুশরিকদের অবাধ্যতা, হঠকারিতা এবং হিংসা-বিদ্বেষ বাড়তে থাকবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আছে :

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي

ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى^٦ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ

বল : মু'মিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ : ৪৪) আর একটি আয়াতে আছে :

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৮২) ইরশাদ হচ্ছে :

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ তাদের পরস্পরের অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ ও বৈরীভাব কিয়ামাত পর্যন্ত মিটবেনা। তারা একে অপরের রক্ত পিপাসু। হক তথা সত্যের উপর তাদের একতাবদ্ধ হওয়া অসম্ভব। তারা নিজেদেরই ধর্মের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও শত্রুতা চলে আসছে এবং চলতে থাকবে। তারা মাঝে মাঝে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু প্রতিবারই তাদেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়। তাদের চক্রান্ত তাদেরই উপর প্রত্যাভর্তিত হয়। তারা অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী এবং আল্লাহর শত্রু। কোন বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীকে আল্লাহ ভালবাসেননা।

আহলে কিতাবরা যদি তাদের কিতাব অনুসরণ করত তাহলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করত

মহান আল্লাহ বলেন : وَاتَّقُوا ۖ وَالْكِتَابَ آمَنُوا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا ۖ যদি এ আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাসারারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, আর হারাম ও হালাল মেনে চলত, তাহলে আমি তাদের কৃত সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিতাম ও তাদেরকে সুখের উদ্যানে প্রবেষ্ট করতাম এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল করতাম। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ যদি তারা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং কুরআনকে মেনে নিত, কেননা তাওরাত ও ইঞ্জীলকে মেনে নিলে কুরআনকে মেনে নেয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে; কারণ ঐ দু'টি কিতাবের

সঠিক শিক্ষা এটাই যে, কুরআন সত্য। কুরআনের ও শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার স্বীকারোক্তি পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে রয়েছে, সুতরাং যদি তারা এ কিতাবগুলিকে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়াই মেনে নিত তাহলে ওগুলি তাদেরকে ইসলামের পথ দেখাত, যে ইসলামের প্রচার নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাদেরকে দুনিয়ার সুখ-শান্তিও প্রদান করতেন। আকাশ থেকে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করতেন। ফলে যমীন হতে ফসল উৎপাদিত হত। তখন উপর ও নীচের অর্থাৎ আসমান ও যমীনের বারাকাত তাদেরকে দান করা হত। যেমন তিনি বলেন :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ

জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং আল্লাহভীতি অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বারাকাতের দ্বারসমূহ খুলে দিতাম। (সূরা আ‘রাফ, ৭ : ৯৬) ইরশাদ হচ্ছে :

مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ তাদের মধ্যে একটি দল সরল-সঠিক পথের পথিকও রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই কার্যকলাপ অতি জঘন্য। যেমন এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন :

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা সঠিক ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায় বিচার করে। (সূরা আ‘রাফ, ৭ : ১৫৯) ঈসার (আঃ) কাওমের ব্যাপারে বলা হয়েছে :

فَقَاتِلْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ

তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি করেছিলাম পুরস্কৃত এবং তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৭) অতএব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আহলে কিতাবের জন্য যে সর্বোচ্চ শ্রেণী নির্ধারণ করেছেন তা হল ‘ইকতিসাদ’ যা উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার জন্য যে স্তর রয়েছে তার

মধ্যম স্তর। উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার জন্য এর উপরে একটি স্তর রয়েছে যা হল ‘সাবিকুন’। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ
وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ
الْكَبِيرُ ۚ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا
وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে
যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী,
কেহ মধ্য পন্থী এবং কেহ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী। এটাই মহা
অনুগ্রহ। তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ নির্মিত
কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোষাক পরিচ্ছদ
হবে রেশমের। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩২-৩৩) সুতরাং এ উম্মাতের তিন প্রকারের
লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৬৭। হে রাসূল! যা কিছু
তোমার রবের পক্ষ থেকে
তোমার উপর অবতীর্ণ করা
হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব
কিছুই পৌছে দাও; আর যদি
এরূপ না কর তাহলে
তোমাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন
করলেনা; আল্লাহ তোমাকে
মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে
রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ
কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ
প্রদর্শন করেননা।

٦٧. يٰٓأَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَّمْ
تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكٰفِرِينَ

রাসূলকে (সাঃ) আল্লাহর বাণী পৌছে দেয়ার আদেশ এবং নিরাপত্তার আশ্বাস

মহান আল্লাহ এখানে স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ‘রাসূল’ এ প্রিয় শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে বলছেন :

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ হে রাসূল! তুমি মানুষের কাছে আমার সমস্ত আহকাম পৌছে দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম করলেনও তাই।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আয়িশা (রাঃ) বলেন : ‘যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নাযিলকৃত কোন কিছু গোপন করেছেন সে মিথ্যা বলেছে।’ (ফাতহুল বারী ৮/১২৪) এখানে ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের কোন অংশ গোপন করতেন তাহলে তিনি অবশ্যই নিম্নের এ আয়াতটিই গোপন করতেন :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করছ, তুমি তাকে বলেছিলে : তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন রেখেছ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি লোকদেরকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। অতঃপর যাবিদ যখন তার (যাইনাবের) সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মু’মিনদের পোষ্য পুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে

সেই সব রমনীকে বিয়ে করায় মু'মিনদের জন্য কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৭) (ফাতহুল বারী ১৩/৪১৫, মুসলিম ১/১৬০)

সহীহ বুখারীতে যুহরীর (রহঃ) উক্তি রয়েছে, তিনি বলেন : ‘আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে হচ্ছে রিসালাত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দায়িত্ব হচ্ছে প্রচার করা এবং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মেনে নেয়া।’ (ফাতহুল বারী ১৩/৫১২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার সমস্ত কথা পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর সমস্ত উম্মাতই এর সাক্ষী। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমানাত পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং যেটা সবচেয়ে বড় সম্মেলন ছিল তাতে সবাই এটা স্বীকার করে নিয়েছেন। অর্থাৎ হাজ্জাতুল বিদা’ বা বিদায় হাজ্জের খুৎবায় সমস্ত সাহাবী এ কথা স্বীকার করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেছেন এবং আল্লাহর বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ ভাষণে জনগণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

‘তোমরা আল্লাহর কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তাহলে বল তো তোমরা কি উত্তর দিবে?’ সবাই সম্মুখে বললেন : ‘আমরা সাক্ষ্য দান করছি যে, আপনি প্রচার করেছেন, রিসালাতের হক পূরাপুরি আদায় করেছেন এবং পূর্ণভাবে আমাদের মঙ্গল কামনা করেছেন।’ তিনি তখন স্বীয় হাত ও মাথা আকাশ পানে উত্তোলন করে জনগণের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে বললেন : ‘হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?’ (মুসলিম ২/৮৮৬) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে :

وَأِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ হে নাবী! তুমি যদি আমার হুকুম আমার বান্দা পর্যন্ত পৌঁছে না দাও তাহলে তুমি রিসালাতের হক আদায় করলেনা। তারপর এর যা শাস্তি তা তো নাবীর কাছে স্পষ্ট। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে : আল্লাহর কাছ থেকে কুরআনের যে আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে তা থেকে তুমি যদি একটি আয়াতও গোপন কর তাহলে তুমি যেন তাঁর বাণী প্রচার করলেনা। (তাবারী ১০/৪৬৮) তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ তোমাকে লোকদের থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব

আমার, তোমার রক্ষক ও সাহায্যকারী আমি। তুমি নির্ভয় থাক, কেহই তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের প্রহরী রাখতেন। সাহাবীগণ তাঁকে রক্ষা করার কাজে নিযুক্ত থাকতেন। যেমন আয়িশা (রাঃ) বলেন : একদা রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেগেই ছিলেন। তাঁর ঘুম হচ্ছিলনা। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ব্যাপার কি? তিনি উত্তরে বললেন : ‘আজ রাতে যদি আমার কোন হৃদয়বান সাহাবী আমাকে পাহারা দিত!’ হঠাৎ আমরা অস্ত্রের ঝনঝনানী শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ‘কে?’ উত্তর এলো : ‘আমি সা’দ ইবন মালিক (রাঃ)’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ‘তুমি কেন এখানে এসেছ?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে পাহারা দেয়ার জন্য এসেছি।’ এরপর তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। (ফাতহুল বারী ১৩/২৩২, মুসলিম ৪/১৮৭৫, আহমাদ ৬/১৪১)

বুখারী ও মুসলিমের অন্য একটি রিওয়াযাতে আছে যে, এটা দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনা। এ আয়াতটি নাযিল হওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁবু হতে মাথা বের করে দিয়ে প্রহরীদেরকে বললেন :

‘তোমরা চলে যাও, আমি আমার প্রভুর আশ্রয়ে এসে গেছি। সুতরাং এখন তোমাদের পাহারা দেয়ার কোনই প্রয়োজন নেই।’ (তিরমিযী ৮/৪১০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন যে এটি গারীব। ইবন জারীর (রহঃ) তার তাফসীরে এবং হাকীম (রহঃ) তার মুসতাদরাক গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। হাকীম বলেন যে, এর বর্ণনা ধারা সহীহ, তবে তারা তাদের সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। (তাবারী ১০/৪৬৯, হাকিম ২/৩১৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

হে মুহাম্মাদ! তুমি প্রচারের কাজ চালিয়ে যাও, আল্লাহ যাকে চাইবেন সে’ই হিদায়াত লাভ করবে এবং যাকে চাইবেন সে বিপথে পরিচালিত হবে। অন্য এক আয়াতে বলেন :

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৭২)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ

তোমার দায়িত্ব হচ্ছে শুধু প্রচার করা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২০) কারণ হিদায়াত দানের ক্ষমতা আল্লাহর। তিনি কাফিরদেরকে হিদায়াত করবেননা। তুমি বাণী পৌছে দাও। হিসাব গ্রহণকারী হচ্ছেন আল্লাহ।

৬৮। তুমি বলে দাও : হে আহলে কিতাব! তোমরা কোনো পথেই প্রতিষ্ঠিত নও যে পর্যন্ত না তাওরাত, ইঞ্জীল এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে তার উপর আমল কর; আর অবশ্যই যা তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয়, তা তাদের মধ্যে অনেকেরই নাফরমানী ও কুফর বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়। অতএব তুমি এই কাফিরদের জন্য মনঃক্ষুব্ধ হয়োনা।

৬৮. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

৬৯। এটা সুনিশ্চিত যে, মুসলিম, ইয়াহুদী, সাবেঈ এবং খৃষ্টানদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সৎ কাজ করে, এইরূপ লোকদের

৬৯. إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ

জন্য শেষ দিনে না কোন
প্রকার ভয় থাকবে আর না
তারা চিন্তান্বিত হবে।

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

কুরআনের প্রতি ঈমান আনা ছাড়া মুক্তির দ্বিতীয় কোন পথ নেই

এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলছেন : يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা কোন ধর্মের উপরই নেই যে পর্যন্ত তারা নিজ নিজ কিতাবের উপর এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার এ কিতাব অর্থাৎ কুরআনের উপর ঈমান না আনবে। কিন্তু তাদের অবস্থাতো এই যে, যখন কুরআন অবতীর্ণ হয় তখন তাদের বিরোধিতা ও কুফর বাড়তে থাকে। সুতরাং হে নাবী! তুমি ঐ কাফিরদের জন্য দুঃখ ও আফসোস করে তোমার জীবনকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করনা।

খৃষ্টান ও মাজুসীদের বেদীন দলকে সাবেঈ বলা হয়। শুধুমাত্র মাজুসীদেরকেও সাবেঈ বলা হয়। এটা মাজুসীদের মত ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যকার একটি দল ছিল। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা যাবূর পাঠ করত। তারা কিবলার পরিবর্তে অন্য দিকে মুখ করে সালাত আদায় করত এবং মালাইকা/ফেরেশতাদের পূজা করত। অহাব (রহঃ) বলেন যে, সাবেঈরা আল্লাহকে চিনত। নিজেদের শারীয়াত অনুযায়ী তারা আমল করত। তাদের মধ্যে কুফরের উৎপত্তি হয়নি। তারা ইরাক সংলগ্ন ভূমিতে বসবাস করত। তাদেরকে ইয়ালুসা বলা হত। তারা নাবীদেরকে মানত। এদের সবারই সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা বলেন যে, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভকারী এবং নির্ভয় হবে ওরাই যারা আল্লাহ উপর এবং কিয়ামাতের উপর সত্য ঈমান রাখে এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে। আর এটা সম্ভব নয়, যে পর্যন্ত এই শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা না হবে, যাকে সমস্ত দানব ও মানবের নিকট আল্লাহর রাসূল করে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং যারা এ সর্বশেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে তারাই পরবর্তী জীবনের বিপদাপদ থেকে নির্ভয় ও নিরাপদ থাকবে। আর দুনিয়ায় ছেড়ে যাওয়া লোভনীয় জিনিসের জন্য তাদের কোনই দুঃখ ও আফসোস থাকবেনা। সূরা বাকারাহর তাফসীরে এ

বাক্যের বিস্তারিত অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

৭০। আমি বানী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছি এবং তাদের কাছে বহু রাসূল প্রেরণ করেছি; যখনই তাদের কাছে কোন নাবী আগমন করত এমন কোন বিধান নিয়ে যা তাদের মনঃপুত হতনা, তখনই তারা কতিপয়কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করত এবং কতিপয়কে হত্যা করে ফেলত।

۷۰. لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا كَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ

৭১। আর তারা এই ধারণাই করেছিল যে, কোন শাস্তিই হবেনা, ফলে তারা আরও অন্ধ ও বধির হয়ে গেল, অতঃপর দীর্ঘকাল পর আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা করলেন; তবুও তাদের অধিকাংশই অন্ধ ও বধিরই রইল। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের কার্যকলাপসমূহ প্রত্যক্ষ করেন।

۷۱. وَحَسِبُوا أَنَّ تَكُوتَ فِتْنَةٍ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদী ও নাসারাদের নিকট ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তারা আল্লাহর আহকামের উপর আমল করবে এবং অহীর অনুসরণ করবে। কিন্তু তারা ঐ ওয়াদা ভেঙ্গে দেয় এবং নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদার পেছনে লেগে পড়ে! আল্লাহর কিতাবের যে কথা তারা নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে পায় তা মেনে নেয় এবং যা তাদের স্বার্থের প্রতিকূলে হয় তা পরিত্যাগ করে। শুধু

এটুকুই নয়, বরং তারা রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলে এবং বহু রাসূলকে হত্যা করে ফেলে। কেননা তাঁরা তাদের কাছে যে আহকাম নিয়ে এসেছিলেন তা তাদের মতের বিপরীত ছিল।

এত বড় পাপ করার পরেও তারা নিশ্চিত থাকে এবং মনে করতে থাকে যে, তাদের কোনই শাস্তি হবেনা। কিন্তু তাদের ভীষণ আধ্যাত্মিক শাস্তি হয়। অর্থাৎ তাদেরকে সত্য (হক) অনুধাবন করা থেকে দূরে নিক্ষেপ করা হয় এবং অন্ধ ও বধির বানিয়ে দেয়া হয়। না তারা হককে শুনতে পায়, আর না ‘হিদায়াতকে দেখতে পায়। কিন্তু তবুও আল্লাহ তাদের উপর দয়া করেন। আর এর পরেও তাদের অধিকাংশই ঐ রূপই থেকে যায়, অর্থাৎ তারা হক দর্শন থেকে অন্ধ এবং হক শ্রবণ থেকে বধির। আল্লাহ তাদের আমল সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। কাজেই কে কিসের যোগ্য তা তিনি ভালই জানেন।

৭২। নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়েছে যারা বলে - মসীহ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ। অথচ মসীহ নিজেই বলেছিল : হে বানী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর! যিনি আমার রাক্ব এবং তোমাদেরও রাক্ব; নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশী স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম; এবং এরূপ অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবেনা।

۷۲. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ
قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ
ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ
يَبْنِي إِسْرَءِيلَ ۖ اعْبُدُوا اللَّهَ
رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۚ وَمَا
لِظَّالِمِينَ مِّنْ أَنْصَارٍ

৭৩। নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে : ‘আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা’বুদের) এক’, অথচ এক মা’বুদ ভিন্ন অন্য কোনই (হক) মা’বুদ নেই; আর যদি তারা স্বীয় উজিসমূহ হতে নিবৃত্ত না হয় তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে অটল থাকবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।

۷۳. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا
إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا
مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ
لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ
لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

৭৪। তারা আল্লাহর সমীপে কেন তাওবাহ করেনা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেনা? অথচ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

۷۴. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ
وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

৭৫। মসীহ ইবনে মারইয়াম একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়; তার পূর্বে আরও বহু রাসূল গত হয়েছে, আর তার মাতা একজন পরম সত্যবাদিনী, তারা উভয়ে খাদ্য আহার করত। লক্ষ্য কর! আমি কিরূপে তাদের নিকট প্রমাণসমূহ বর্ণনা করছি। আবার লক্ষ্য কর! তারা উল্টা

۷۵. مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا
يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ أَنْظِرْ
كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ

কোন দিকে যাচ্ছে?

ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُؤْفَكُونَ

খৃষ্টানরা ঈসাকে (আঃ) প্রভু বলে মিথ্যা দাবী করে

এখানে খৃষ্টান দলগুলোর অর্থাৎ মালেকিয়াহ, ইয়াকুবিয়াহ এবং নাসতুরিয়াহদের কুফরের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা মাসীহকেই (আঃ) প্রভু বলে মেনে থাকে। আল্লাহ তাদের এ উক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। মাসীহ (আঃ) তো আল্লাহর গোলাম ও নাবী ছিলেন। পার্থিব জগতে পা রেখে দোলনায়ই তাঁর মুখের প্রথম কথা ছিল :

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

সে (ঈসা) বলল : আমি তো আল্লাহর দাস; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নাবী করেছেন। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৩০) ‘আমি আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র’ এ কথা তো তিনি বলেননি! বরং তিনি স্বীয় দাসত্বের কথা অকপটে স্বীকার করেছিলেন। সাথে সাথে তিনি বলেছিলেন :

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

আল্লাহই আমার রাব্ব এবং তোমাদের রাব্ব। সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর, ইহাই সরল পথ। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৩৬) যৌবনের পরবর্তী বয়সেও তিনি বলেছিলেন : ‘তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত কর। যারা তাঁর সাথে অন্য কারও ইবাদাত করে তাদের জন্য জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম ওয়াজিব।’ যেমন কুরআনুল হাকীমের অন্য আয়াতে রয়েছে :

اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করেননা এবং এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (সূরা নিসা, ৪ : ১১৬) জাহান্নামবাসীরা যখন জান্নাতবাসীদের কাছে খাদ্য ও পানি চাবে তখন তাদের ব্যাপারে বলা হবে :

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ

مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ

জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে বলবে : আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ প্রদত্ত তোমাদের জীবিকা হতে কিছু প্রদান কর। তারা বলবে : আল্লাহ এসব জিনিস কাফিরদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষকদের দ্বারা মুসলিমদের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, শুধু মু'মিন ও মুসলিমরাই জান্নাতে যাবে। (ফাতহুল বারী ৬/২০৭) এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

(নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশী স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম; এবং এরূপ অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবেনা) এরপর ঐ লোকদের কুফরীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা আল্লাহকে তিন মা'বুদের মধ্যে এক মা'বুদ মনে করত।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ

(নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে : 'আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা'বুদের) এক') ইয়াহুদীরা উযায়েরকে (আঃ) এবং খৃষ্টানরা ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর পুত্র বলত এবং আল্লাহকে তিন মা'বুদের মধ্যে এক মা'বুদ মনে করত। (তাবারী ১০/৪৮৩) সুদী (রহঃ) ও অন্যান্যরা বলেন, মাসীহকে (আঃ), তাঁর মাকে এবং আল্লাহকে মিলিয়ে দিয়ে আল্লাহ মানত। এ সূরার শেষে এরই বর্ণনা রয়েছে :

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِنْ كُنْتُ ثَلَاثَةً فَفَقَدْ عَلِمْتَهُ ۖ تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

আর যখন আল্লাহ বলবেন : হে ঈসা ইব্ন মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে : তোমরা আল্লাহর সাথে আমার ও আমার মায়েরও ইবাদাত কর? ঈসা নিবেদন করবে : আপনি পবিত্র! আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি

তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; আপনি তো আমার অন্তরে যা আছে জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানিনা; সমস্ত গায়িবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ১১৬) কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলা ঈসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলবেন : ‘তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে, তোমরা আল্লাহকে ছাড়াও আমাকে ও আমার মাকে আল্লাহ বলে স্বীকার কর?’ তিনি তা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করবেন এবং নিজের না জানার কথা ও নিরপরাধ হওয়ার কথা প্রকাশ করবেন।

প্রকৃতপক্ষে ইবাদাতের যোগ্য মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেহই নয়। সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রকৃত মা‘বুদ তিনিই। যদি এরা কুফরীপূর্ণ উক্তি থেকে বিরত না থাকে তাহলে নিশ্চিতরূপে এরা ধ্বংসাত্মক শাস্তির শিকারে পরিণত হবে।

অতঃপর আল্লাহ স্বীয় দয়া, অনুকম্পা, স্নেহ ও ভালবাসার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাদের এত কঠিন অপরাধ ও এত ভীষণ নির্লজ্জতা ও মিথ্যারোপ সত্ত্বেও তাদেরকে স্বীয় রাহমাতের দা‘ওয়াত দিচ্ছেন এবং বলছেন : এখনও যদি তোমরা আমার দিকে প্রত্যাভর্তিত হও তাহলে তোমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিব এবং তোমাদেরকে আমার রাহমাতের ছায়ায় আশ্রয় দিব।

ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা বা দাস এবং

তাঁর মা একজন সত্যবাদিনী

আল্লাহ বলেন : مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ মাসীহ আল্লাহর বান্দা ও রাসূলই ছিলেন। তাঁর মত রাসূল তাঁর পূর্বেও অতীত হয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ ‘সে একজন গোলামই ছিল।’

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اُنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي اِسْرَءِيْلَ

সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৫৯) তবে তিনি তাঁর উপর স্বীয় রাহমাত নাযিল করেছিলেন এবং বানী ইসরাঈলের জন্য তাঁকে একটি নিদর্শন বানিয়েছিলেন। তাঁর মা মু‘মিনা ও সত্যবাদিনী ছিলেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, তিনি নাবী ছিলেননা। কেননা এটা হচ্ছে বিশেষণ বা গুণ বর্ণনার

স্থান। সুতরাং তিনি যে গুণের অধিকারিণী ছিলেন তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

كَأَنَّا يَاكُلَانِ الطَّعَامَ মা ও পুত্র উভয়ে পানাহারের মুখাপেক্ষী ছিল। আর এটা প্রকাশ্য কথা যে, যা ভিতরে যাবে তা বেরিয়ে আসবে। অর্থাৎ তারা প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতেন। সুতরাং সাব্যস্ত হচ্ছে যে, তাঁরা অন্যদের মত বান্দাই ছিলেন। আল্লাহর গুণাগুণ তাঁদের মধ্যে ছিলনা। যারা এরূপ দাবী করে তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, লক্ষ্য কর! আমি কিভাবে খোলাখুলি তাদের সামনে আমার দলীল প্রমাণাদি পেশ করছি! আবার লক্ষ্য কর যে, এত দলীল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে তারা বিভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক ফিরছে! কেমন ভ্রষ্ট মাযহাবের উপর তারা রয়েছে! কেমন জঘন্য ও দলীল প্রমাণহীন উক্তি তারা করছে!

৭৬। তুমি বলে দাও : তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুর ইবাদাত কর যা তোমাদের না কোন অপকার করার ক্ষমতা রাখে, আর না কোন উপকার করার? অথচ আল্লাহই সব শুনে, জানেন।

٧٦. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

৭৭। তুমি বল : হে আহলে কিতাব! তোমরা নিজেদের ধর্মে অন্যায়ভাবে সীমা লংঘন করনা, এবং ঐ সম্প্রদায়ের (ভিত্তিহীন) কল্পনার উপর চলোনা যারা অতীতে নিজেরাও ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে এবং অন্যান্যদেরকে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছে।

٧٧. قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا

বস্তুতঃ তারা সরল পথ থেকে
দূরে সরে পড়েছিল।

عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

শিরক বর্জন এবং ধর্মের ভিতর নতুন কিছু সংযোজন করতে নিষেধাজ্ঞা

এখানে আল্লাহকে ছেড়ে বাতিল মা'বুদগুলোর ইবাদাত করতে নিষেধ করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, এসব লোককে বলে দাও :

أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

কোন ক্ষতি করার কিংবা উপকার করার কোনই ক্ষমতা রাখেনা তাদের তোমরা কেন পূজা করছ? যিনি সবকিছু শুনে ও সবকিছুর খবর রাখেন সেই আল্লাহকে ছেড়ে যাদের শোনার, দেখার এবং উপকার কিংবা অপকার করার কোনই ক্ষমতা নেই, তাদের অনুসরণ করা কতই না নির্বুদ্ধিতার কাজ! হে আহলে কিতাব! তোমরা হক ও সত্যের সীমা ছাড়িয়ে যেওনা। যার যতটুকু সম্মান করার নির্দেশ রয়েছে তাকে ততটুকুই সম্মান কর। মানুষের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ নাবুওয়াত দান করেছেন তাদেরকে নাবুওয়াতের মর্যাদা থেকে বাড়িয়ে আল্লাহর মর্যাদায় পৌঁছে দিওনা। যেমন তোমরা মাসীহর ব্যাপারে ভুল করছ। এর একমাত্র কারণ এটাই যে, তোমরা তোমাদের পীর, মুরশিদ, উস্তাদ এবং ইমামদের পিছনে লেগে পড়েছ। তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট এবং অনুসারীদেরকেও করেছে পথভ্রষ্ট। তারা বহু দিন হতে সরল ও ন্যায়ের পথকে ছেড়ে দিয়েছে এবং ভ্রান্তি ও বিদ'আতের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছে।

৭৮। বনী ইসরাঈলের মধ্যে
যারা কাফির ছিল, তাদের
উপর অভিসম্পাত করা
হয়েছিল দাউদ ও ঈসা ইবনে
মারইয়ামের মুখে; এই লা'নত
এ কারণে করা হয়েছিল যে,
তারা অবাধ্য ছিল এবং সীমা
লংঘন করত।

٧٨. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ

دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ

بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

৭৯। তারা যে অন্যায় কাজ করেছিল তা হতে একে অপরকে নিষেধ করতনা; বাস্তবিকই তাদের কাজ ছিল অত্যন্ত গর্হিত।

٧٩. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ
عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا
كَانُوا يَفْعَلُونَ

৮০। তুমি তাদের (ইয়াহুদীদের) অনেককে দেখবে, তারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করছে; যে কাজ তারা ভবিষ্যতের জন্য করেছে তা নিঃসন্দেহে মন্দ, আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ফলতঃ তারা আযাবে চিরকাল থাকবে।

٨٠. تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ
يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ
أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي
الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ

৮১। আর যদি তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতো এবং নাবীর প্রতি এবং ঐ কিতাবের (তাওরাতের) প্রতি যা তাঁর নাবীর নিকট প্রেরিত হয়েছিল, তাহলে তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) কখনও বন্ধু রূপে গ্রহণ করতনা, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই নাফরমান।

٨١. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا
اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ
كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

বানী ইসরাঈলের অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ প্রদান

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ :

وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ বানী ইসরাঈলের কাফিরেরা প্রাচীনতম অভিশপ্ত। দাউদ (আঃ) ও ঈসার (আঃ) যুগে তারা অভিশপ্তরূপে সাব্যস্ত হয়েছিল। কেননা তারা ছিল আল্লাহর অবাদ্য এবং আল্লাহর সৃষ্টজীবের প্রতি অত্যাচারী। তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবুর, কুরআন প্রভৃতি সমস্ত কিতাবই তাদের উপর লা'নত বর্ষণ করে আসছে। তারা নিজেদের যুগেও একে অপরকে খারাপ কাজ করতে দেখেছে।

كَاثُرًا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعْلُوهُ কিছু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। হারাম কাজগুলো তাদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে চলত এবং কেহ কেহকেও নিষেধ করতনা। এ ছিল তাদের জঘন্য কাজ।

ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ করার তাগিদ

মুসনাদ আহমাদ ও জামেউত তিরমিযীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! হয় তোমরা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতে থাকবে, না হয় আল্লাহ তোমাদের উপর স্বীয় পক্ষ থেকে শাস্তি পাঠিয়ে দিবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে থাকবে, কিন্তু তোমাদের প্রার্থনা তিনি কবুল করবেননা।’ (আহমাদ ৫/৩৮৮, তিরমিযী ৬/৩৯১) সহীহ হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমাদের কেহ কেহকে শারীয়াত গর্হিত কাজ করতে দেখলে তাকে হাত দ্বারা বাধা প্রদান করা তার উপর ফারয। যদি এটার ক্ষমতা তার না থাকে তাহলে তার উচিত, সে যেন তাকে কথা দ্বারা বাধা দেয়। যদি ওটারও ক্ষমতা তার না থাকে তাহলে তার উচিত তাকে অন্তরে ঘৃণা করা, এবং এটা হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচয়।’ (মুসলিম ১/৬৯)

নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে জায়গায় পাপ ছড়িয়ে পড়েছে সেখানে যারা উপস্থিত আছে তারা যদি ঐ শারীয়াত বিরোধী কাজে অসম্মত হয় (আর একটি বর্ণনায় আছে যে, যদি ঐ কাজে বাধা দেয়) তাহলে তারা যেন ঐ লোকদের মতই যারা সেখানে উপস্থিত নেই। পক্ষান্তরে যারা সেখানে উপস্থিত নেই, কিন্তু ঐ শারীয়াত বিরোধী কাজে তারা সম্মত থাকত, তাহলে তারা যেন ঐ লোকদের মতই যারা সেখানে উপস্থিত আছে।’ (আবু

দাউদ ৪৩৪৫) আবু দাউদে অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘লোকদের ওয়র দেয়ার সুযোগ যে পর্যন্ত লুপ্ত না হবে সে পর্যন্ত তারা ধ্বংস হবেনা।’ (আবু দাউদ ৪৩৪৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুৎবা দিতে গিয়ে বলেন : ‘সাবধান! কেহকে যেন লোকদের ভয়ে সত্য কথা বলা থেকে বিরত না রাখে।’ (ইব্ন মাজাহ ৪০০৭) এ হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে আবু সাঈদ (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন : আল্লাহর শপথ! আমরা তো এরূপ দেখতে পাচ্ছি এবং মানুষের ভয় করছি। অন্য একটি হাদীসে আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা হচ্ছে উত্তম জিহাদ।’ (আবু দাউদ ৪/৫১৪, তিরমিযী ৬/৩৯৫, ইব্ন মাজাহ ২/১৩২৯) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মুসলিমদের নিজেকে লাঞ্ছিত করা উচিত নয়।’ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তা কিরূপে? তিনি উত্তরে বললেন : ‘ঐ বিপদাপদকে মাথা পেতে নেয়া যা বরদাশত করার ক্ষমতা তার নেই।’ (আহমাদ ৫/১৪০৫, তিরমিযী ৬/৫৩১, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৩২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন।

মুনাফিকদের প্রতি তিরস্কার

ইরশাদ হচ্ছে : تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا অধিকাংশ মুনাফিককে তুমি দেখবে যে, তারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। তাদের এ কাজের কারণে অর্থাৎ মুসলিমদের বন্ধুত্ব ছেড়ে দিয়ে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করার কারণে তারা তাদের জন্য বড় শাস্তি জমা করে রেখেছে। এরই প্রতিশোধ হিসাবে তাদের অন্তরে নিফাক বা কপটতা সৃষ্টি হয়েছে এবং এর উপর ভিত্তি করেই তাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছে। আর কিয়ামাতের দিন তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি অপেক্ষা করছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ এ লোকগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং কুরআনের উপর পূর্ণ ঈমান আনত তাহলে কখনও কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতনা ও খাঁটি মুসলিমের সাথে শত্রুতা করতনা। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, وَلَكِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

তাদের অধিকাংশ লোকই ফাসিক। অর্থাৎ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হতে সরে পড়েছে এবং তাঁর অহী ও পবিত্র কালামের আয়াতগুলির বিরোধী হয়ে গেছে।

৮২। তুমি মানবমন্ডলীর মধ্যে ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে মুসলিমদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবে, আর তন্মধ্যে মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর নিকটবর্তী ঐ সব লোককে পাবে যারা নিজেদেরকে নাসারাহু (খৃষ্টান) বলে; এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে বহু আলিম এবং বহু দরবেশ রয়েছে; আর এ কারণে যে, তারা অহংকারী নয়।

۸۲. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدُوًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اَلْيَهُودَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اَلَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَصْرِيْكَ ذٰلِكَ بِاَنّٰ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهَبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

(৫ : ৮২) আয়াটি নাযিল হওয়ার কারণ

সাইদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, এ আয়াতটি ঐ সময়ের ঘটনা বর্ণনা করছে যখন ইথিওপিয়ান বাদশা নাজ্জাসী রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন এই পর্যবেক্ষণ করতে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ধরনের লোক এবং তাঁর কথাবার্তা, আচরণ কিরূপ। প্রতিনিধি দল রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলে তিনি কুরআন পাঠ করে শোনান। এতে তারা আল্লাহর প্রতি বিনম্র হয়ে কাঁদতে থাকেন এবং ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর তারা নাজ্জাসীর কাছে ফিরে যান এবং পূর্বাণর ঘটনা বর্ণনা করেন। (তাবারী ১০/৪৯৯, ৫০০) ‘আতা ইব্ন আবী রাবাহ (রহঃ) মন্তব্য করেন যে, তারা ছিল ঐ ইথিওপিয়ান যাদের কাছে মুসলিমরা হিজরাত করে বসবাস করছিলেন।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, প্রথমে তারা ঈসায়ী ধর্মের অনুসারী ছিলেন। যখন তারা মুসলিমদেরকে দেখতে পান ও কুরআন শ্রবণ করেন তখনই কাল বিলম্ব না করে তারা মুসলিম হয়ে যান। (তাবারী ১০/৫০১) ইব্ন জারীরের (রহঃ) ফাইসালা এসব উক্তিকে সত্য বলে সাব্যস্ত করছে। তিনি বলেন যে, এ আয়াতগুলি এসব লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যাদের মধ্যে এ গুণাবলী রয়েছে। তারা ইখিওপীয়ই হোন বা অন্য কোন জায়গারই হোন।

ইয়াহুদীদের মুসলিমদের সাথে যে ভীষণ শত্রুতা রয়েছে তার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে দুষ্টামি, বিরোধিতা ও অস্বীকার করার প্রবণতা রয়েছে এবং তারা জেনে শুনে কুফরী করে এবং জেদের বশবর্তী হয়ে অন্যায় আচরণ করে। তারা হকের মুকাবিলায় বিগড়ে যায়। হক পন্থী আলেমদের উপর তারা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়। তাদের প্রতি হিংসা পোষণ করে। এ কারণে তারা বহু নাবীকে হত্যা করেছিল। শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও ইয়াহুদীরা, কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করণ, বহুবার হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। তারা তাঁর খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করে, তাঁর উপর যাদু করে এবং তাদের ন্যায় দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর উপর আক্রমণ চালায়। আল্লাহ বলেন :

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى

মুসলিমদের বন্ধুত্বের ব্যাপারে সবচেয়ে নিকটবর্তী এসব লোক, যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে, যারা ঈসার (আঃ) সত্য অনুসারী এবং ইঞ্জিলের আসল ও সঠিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাদের মনে মোটের উপর মুসলিম ও ইসলামের প্রতি মহব্বত আছে। এর কারণ এই যে, ঈসার (আঃ) ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার ফলে (বিকৃত হলেও) তাদের মধ্যে নম্রতা রয়েছে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً

এবং তার (ঈসার) অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৭) তাদের কিতাবে নির্দেশ আছে, যে তোমার ডান গালে চড় মারে, তুমি তার সামনে তোমার বাম গালটিও এগিয়ে দাও। তাদের শারীয়াতে যুদ্ধই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে তাদের বন্ধুত্বের কারণ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে বহু ধর্ম-যাজক ও জ্ঞান পিপাসু আলেম রয়েছে।

ষষ্ঠ পারা সমাপ্ত।

৮৩। আর যখন রাসুলের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা শ্রবণ করে তখন তুমি দেখতে পাও যে, তাদের অশ্রু বইছে; এ কারণে যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা এরূপ বলে : হে আমাদের রাব্ব! আমরা মু'মিন হয়ে গেলাম, সুতরাং আমাদেরকেও ঐ সব লোকের সাথে লিপিবদ্ধ করে নিন, যারা (মুহাম্মাদ ও কুরআনকে সত্য বলে) স্বীকার করে -

۸۳. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَكُتِبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

৮৪। আর আমাদের কি এমন ওয়র আছে, যে জন্য আমরা ঈমান আনবনা আল্লাহর প্রতি এবং সেই সত্যের প্রতি যা আমাদের কাছে পৌছেছে; অথচ এ আশা রাখবো যে, আমাদের রাব্ব নেককারদের সাথে আমাদেরকে शामिल করবেন?

۸۴. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ

৮৫। ফলতঃ তাদের এই উক্তির বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে এমন উদ্যানসমূহ প্রদান করবেন, যার তলদেশে নহর বইতে থাকবে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে। সৎ কর্মশীলদের জন্য

۸۵. فَأَثْبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ

এটাই প্রতিদান!	جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ
৮৬। আর যারা কান্ধির হয়েছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।	۸۶. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ যখন তারা রাসুলের উপর অবতারিত অহী শ্রবণ করে তখন তুমি তাদেরকে দেখতে পাও যে, তাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়েছে। কেননা তারা সেই ভবিষ্যত সুসংবাদ সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেছে যা (তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবী হিসাবে প্রেরণ সম্পর্কিত সংবাদ) তাদের কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীলে দেখেছিল। তাই তারা বলতে শুরু করে : হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনি আমাদের ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা সাক্ষ্য দান করেছে ও ঈমান এনেছে। তারা আরও বলেন :

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ আমাদের এমন কি ওয়র আছে যে, আমরা ঈমান আনবনা আল্লাহর প্রতি এবং সেই সত্যের প্রতি যা আমাদের কাছে এসেছে? অথচ আমরা এ আশা রাখব যে, আমাদের প্রভু সৎ লোকদের সাথে আমাদেরকে शामिल করবেন। ঐ লোকগুলি ছিলেন নাসারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ

এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর সম্মুখে বিনয়াবনত

থাকে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯৯) অন্য জায়গায় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (৫৩) وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَاْمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ

এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের নিকট এটি আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে : আমরা এতে ঈমান এনেছি, এটা আমাদের রাক্ব হতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পনকারী ছিলাম। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৫২-৫৩)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرْتُمْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۚ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের দম্ভ করত। এগুলিই তো তাদের ঘরবাড়ী, তাদের পরে এগুলিতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে; আর আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৫৮) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন : ‘এ স্বীকারোক্তির কারণে আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতসমূহ প্রদান করবেন যেগুলির নিম্নদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। এক মুহূর্তের জন্যও তাদেরকে সেখান থেকে সরানো হবেনা, সৎকর্মশীলদের প্রতিদান এটাই।’ অতঃপর তিনি দুষ্ট লোকদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : ‘যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা জাহান্নামের অধিবাসী।’

৮৭। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ যে সব বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন তন্মধ্যে সুস্বাদু বস্তুগুলিকে হারাম করনা এবং সীমা লংঘন করনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে

۸۷. يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا

পছন্দ

করেননা।	سُحِبَ الْمُعْتَدِينَ
৮৮। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তন্মধ্য হতে হালাল ও পবিত্র বস্তুগুলি আহার কর, এবং আল্লাহকে ভয় কর - যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।	۸۸. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

ইসলামে কোন সন্ন্যাস-ব্রত নেই

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতটি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের একটি দলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাঁরা বলেছিলেন, ‘আমরা আমাদের গোপনাজ কেটে ফেলব এবং দুনিয়ার কাম, লোভ-লালসা পরিত্যাগ করব এবং পাদ্রীদের মত বিভিন্ন দেশে প্রচার কাজ করে ঘুরে বেড়াব।’ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারা বলেন : ‘হ্যাঁ, আমরা এরূপই সংকল্প করেছি।’ তখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

জেনে রেখ যে, আমি তো সিয়াম পালনও করি এবং (কোন কোন সময়) পালন নাও করি, রাতে সালাতও আদায় করি এবং নিদ্রাও যাই। আমি স্ত্রীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধও হই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুনাত গ্রহণ করে সে আমারই অন্তর্ভুক্ত এবং যে ব্যক্তি আমার নীতি গ্রহণ করেনা সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।’ (তাবারী ১০/৫১৮) সহীহ বুখারীর শর্তে এটি সহীহ। ইব্ন আবী হাতিমও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্ন মারদুয়াই (রহঃ) বর্ণনা করেন, আল আউফী (রহঃ) বলেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবী তাঁর স্ত্রীদেরকে তাঁর গোপনীয় আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন! তখন (সম্ভবতঃ তাঁর রাত দিনের আমল সম্পর্কে অবহিত হয়ে) তাদের মধ্যে কোন একজন বলেন : ‘আমি এখন থেকে আর কখনও গোশ্‌ত খাবনা।’ আর একজন বলেন : ‘আমি কখনও

মহিলাদের সাথে বিবাহিত হবনা।' অন্য একজন বললেন : 'আমি কখনও বিছানায় শয়ন করবনা (বরং মাটিতে শয়ন করব)।' এসব কথা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছলে তিনি বলেন : 'ঐ লোকদের কি হয়েছে যে, তাদের কেহ এ কথা বলে এবং ও কথা বলে? কিন্তু আমি তো সিয়াম পালন করি এবং কোন কোন সময় ছেড়েও দিই, আমি নিদ্রা যাই এবং রাত জেগে সালাতও আদায় করি, আমি গোশতও খাই এবং নারীদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার নীতি (সুনাত) থেকে সরে পড়ে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।' (ফাতহুল বারী ৯/৫, মুসলিম ২/১০২০)

وَلَا تَعْتَدُوا এর অর্থ এও হতে পারে, তোমরা হালাল বস্তুকে নিজেদের উপর হারাম করে দিয়ে নাফসের উপর সংকীর্ণতা আনয়ন করনা। আবার এও অর্থ হতে পারে, তোমরা হালালকে হারাম বানিয়ে নিওনা এবং হালাল দ্বারা উপকার লাভ করতে গিয়ে সীমা অতিক্রম করনা। হালালকেও প্রয়োজন পরিমাণই গ্রহণ কর, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করনা।

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩১) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করেনা, কার্পন্যও করেনা; বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৭) আল্লাহ তা'আলা না 'ইফরাত' বা বাহুল্যের অনুমতি দিয়েছেন, আর না 'তাফরীত' বা অত্যল্পতার অনুমতি দিয়েছেন। এ জন্যই তিনি বলেন, وَلَا تَعْتَدُوا তোমরা সীমা অতিক্রম করনা।

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا

আর আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তন্মধ্য হতে হালাল ও পবিত্র বস্তুগুলি আহার কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৮৮)

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কেহ যদি কোন হালালকে নিজের উপর হারাম করে নেয় তাহলে কাফফারা আদায় করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

হে নাবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা তাহরীম, ৬৬ : ১) এখানে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত বর্ণনা করার পর কসমের কাফফারার বর্ণনা দিলেন। এর দ্বারা এটা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, কসমের উল্লেখ না থাকলেও যদি কেহ নিজের উপর কোন জিনিস হারাম করে নেয় তাহলে কসমের কাফফারার মতই তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন : 'তোমরা সর্বাবস্থায় হালাল ও পবিত্র জিনিস আহার কর এবং সর্বকাজে আল্লাহকেই ভয় কর। তাঁর মর্জির অনুসরণ কর এবং বিরোধিতা ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাক।

৮৯। আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য তোমাদের পাকড়াও করবেননা, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে ঐ শপথসমূহের জন্য পাকড়াও করবেন যেগুলিকে তোমরা (ভবিষ্যত বিষয়ের প্রতি) দৃঢ় কর, সুতরাং ওর কাফফারা হচ্ছে দশজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য প্রদান করা মধ্যম ধরণের, যা তোমরা নিজ পরিবারের লোকদেরকে খাইয়ে থাক, কিংবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করা (মধ্যম ধরণের), কিংবা একজন গোলাম কিংবা বাদী আজাদ করা। আর যে

৮৯. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّרَتُهُ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ

ব্যক্তি সামর্থ্য রাখেনা সে
(একাধারে) তিন দিন সিয়াম
পালন করবে; এটা তোমাদের
শপথসমূহের কাফফারা যখন
তোমরা শপথ কর এবং
অতঃপর ভঙ্গ কর এবং
নিজেদের শপথসমূহকে রক্ষা
করবে। এই রূপেই আল্লাহ
তোমাদের জন্য স্বীয় বিধানসমূহ
বর্ণনা করেন যেন তোমরা
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

لَمْ سِجْدَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَنِيكُمْ إِذَا
حَلَفْتُمْ ۖ وَاحْفَظُوا أَيْمَنِيكُمْ ۚ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

অর্থহীন শপথ

অর্থহীন শপথের বর্ণনা সূরা বাকারায় দেয়া হয়েছে, সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এ ধরনের শপথ মানুষ তার কথা-বার্তার মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও করে থাকে। যেমন সে বলে, আল্লাহর শপথ ইত্যাদি। কেহ কেহ এ কথাও বলেছেন যে, এটা হচ্ছে ক্রোধের সময় বা ভুল বশতঃ শপথ। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, কেহ যদি কোন খাদ্য, পানীয় বা পোশাক পরিত্যাগ করা সম্পর্কে শপথ করে তাহলে এ দলীল অনুযায়ী তাকে পাকড়াও করা হবেনা। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে যে শপথ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ওটাই হচ্ছে অর্থহীন বা বাজে শপথ।

শপথ ভঙ্গ করার কাফফারা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۚ তোমরা যদি শপথকে দৃঢ় করে নাও তাহলে সেই কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন।

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ

দৃঢ় শপথ ভেঙ্গে দেয়ার কাফফারা হচ্ছে দশজন অভাবগ্রস্ত লোককে খেতে দেয়া। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) প্রমুখ বলেন : তাদেরকে তোমরা এমন মধ্যম ধরনের খাবার খেতে দিবে যা তোমরা

তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে খাইয়ে থাক। (তাবারী ১০/৫৪১) ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বলেন : আয়াতের অর্থ হচ্ছে পরিবারকে যেমন উত্তম খাদ্য প্রদান করা হয় অনুরূপ খাবার খাওয়াতে হবে। (তাবারী ১০/৫৩১) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

اَوْ كَسُوْهُمْ অর্থাৎ গরীব দশজন পুরুষ কিংবা মহিলাকে এমন কাপড় প্রদান করতে হবে যা পরিধান করে সালাত আদায় করা যাবে। আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে দশ জন গরীবকে পরিধানযোগ্য কাপড় অথবা জামা প্রদান করতে হবে। (তাবারী ১০/৫৪৭) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে কাপড় প্রদান করা, অন্যথায় তুমি যা দেয়া দরকার মনে কর। (তাবারী ১০/৫৪৫) হাসান বাসরী (রহঃ), আবু জাফর আল বাকীর (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), তাউস (রহঃ), ইব্রাহীম নাখঈ (রহঃ), হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলাইমান (রহঃ) এবং আবু মালিক (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে দশজন গরীবের প্রত্যেককে কাপড় প্রদান করা। (তাবারী ১০/৫৪৬)

اَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ এর দ্বারা গোলাম অর্থ নেয়া হয়েছে। ফকীহগণ বলেন যে, হত্যার কাফ্ফারায় যেমন মু‘মিন গোলামের শর্ত রয়েছে তদ্রূপ কসমের কাফ্ফারায়ও মু‘মিন গোলাম হওয়া যরুরী। মুয়াবিয়া ইব্ন হাকাম আস-সালামীর (রাঃ) হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, তার উপর একবার একটি গোলাম আযাদ করার দায়িত্ব পড়েছিল। তখন তিনি একটি হাবশি ক্রীতদাসী নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রীতদাসীটিকে জিজ্ঞেস করেন : ‘আল্লাহ কোথায়?’ সে উত্তরে বলে : তিনি আকাশে রয়েছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন : ‘আমি কে?’ সে উত্তর দেয়, আপনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআবিয়া ইব্ন হাকাম আস-সালামীকে (রাঃ) বললেন : ‘এ মু‘মিনা, সুতরাং তুমি তাকে আযাদ করতে পার।’ (মুসলিম ১/৩৮, মুয়াত্তা ২/৭৭৬)

তিন প্রকারের কাফ্ফারার মধ্য হতে যে প্রকারের কাফ্ফারা আদায় করা হবে তাতেই আদায় হয়ে যাবে। কুরআন কারীমে সর্বপ্রথম সহজটার কথা বলা হয়েছে। তারপর শ্রেণীগতভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পোশাক দেয়ার তুলনায় খানা খাওয়ানো সহজ। অতঃপর গোলাম আযাদ করার তুলনায় পোশাক

দেয়া সহজ। মোট কথা, নিম্নতম হতে উচ্চতমের দিকে পা বাড়ানো হয়েছে।
সর্বশেষে বলা হয়েছে :

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ যে ব্যক্তি এ তিনটির মধ্যে একটির উপরেও
সক্ষম হবেনা, তাকে তিনটি সিয়াম পালন করতে হবে। এখন এ তিনটি সিয়াম
পর্যায়ক্রমে রাখা ওয়াজিব কি মুস্তাহাব বা বিচ্ছিন্নভাবে রাখাই যথেষ্ট কিনা এ ব্যাপারে
আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তাদের দলীল এই যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ)
এবং ইব্ন মাসউদের (রাঃ) একটি কিরা'আতে مُتَتَابِعَاتِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
(অতঃপর সে যেন পরপর তিন দিন সিয়াম পালন করবে) এরূপও রয়েছে। (তাবারী
৫/৩১) এ কিরা'আতটি মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত না থাকলেও কমপক্ষে খবরে
ওয়াহিদ তো বটে। তাছাড়া সাহাবীগণের (রাঃ) তাফসীর দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়
এবং এটি হাদীসে মারফূ'র হুকুমেই পড়ে। ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ এটি
হচ্ছে শপথের শারঈ কাফ্ফারা। (৫ : ৮৯)

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তোমরা
কাফ্ফারা আদায় না করে ছেড়ে দিওনা। (তাবারী ১০/৫৬০, ৫৬২) এভাবেই
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকেন, যেন
তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৯০। হে মু'মিনগণ!
নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি
ইত্যাদি এবং লটারীর তীর,
এ সব গর্হিত বিষয়,
শাইতানী কাজ ছাড়া আর
কিছুই নয়। সুতরাং এ
থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরে
থাক, যেন তোমাদের
কল্যাণ হয়।

۹۰. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْحَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ
فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

৯১। শাইতান তো এটাই
চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা

۹۱. اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ

তোমাদের পরস্পরের মধ্যে
শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক
এবং আল্লাহর স্মরণ হতে
ও সালাত হতে
তোমাদেরকে বিরত রাখে।
সুতরাং এখনো কি তোমরা
নিবৃত্ত হবেনা?

يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

৯২। আর তোমরা আল্লাহর
আনুগত্য করতে থাক ও
রাসূলের অনুগত হও এবং
সতর্ক থাকো, আর যদি
বিমুখ থাকো তাহলে জেনে
রেখ যে, আমার রাসূলের
দায়িত্ব ছিল শুধু স্পষ্টভাবে
(আদেশ) পৌছে দেয়া।

৯২. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا
الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

৯৩। যারা ঈমান রাখে ও
ভাল কাজ করে, এরূপ
লোকদের উপর কোন পাপ
নেই যা তারা পূর্বে আহার
করেছে যখন তারা
ভবিষ্যতের জন্য পরহেয
করে, ঈমান রাখে ও ভাল
কাজ করে, পুনরায় সংযত
থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন
করে। পুনরায় সংযত থাকে
ও ভাল কাজ করতে থাকে;
বস্ত্তত আল্লাহ এরূপ সং

৯৩. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا
طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا
وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ

মদ পান করা ও জুয়া খেলা নিষেধ

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে মদ পান, জুয়া খেলা ইত্যাদি থেকে নিষেধ করছেন। আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবী তালিব (রাঃ) বলেন যে, দাবা এক প্রকারের জুয়া। মুজাহিদ (রহঃ) এবং 'আতা (রহঃ) বলেন যে, বাজি রেখে যে খেলা করা হয় সেটাই জুয়া। এমনকি ছেলেরা বাজি রেখে যে কড়ি খেলে সেটাও জুয়া। (তাবারী ৪/৩২২, ৩২৩) অজ্ঞতার যুগে ইসলাম আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই জুয়া বিশেষভাবে খেলা হত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে এই জঘন্য খেলা খেলতে নিষেধ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যে ব্যক্তি 'চওসর' খেলা করল সে যেন শূকরের মাংস ও রক্ত দ্বারা স্বীয় হাত রাঙ্গিয়ে দিল।' (মুসলিম) আর দাবা সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন যে, ওটা 'চওসর' থেকেও খারাপ এবং তিনি ওটাকে পাশা ও জুয়ার মধ্যে গণ্য করতেন।। ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন, 'চওসর' হল জুয়া খেলা।

'আনসাব' ও 'আযলাম' কী

أَنْصَابُ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, উহা ঐ পাথরগুলোকে বলা হত যেগুলোর উপর পশু যবাই করে মুশরিকরা তাদের মূর্তিগুলোর নামে উৎসর্গ করত। أَزْلَامٌ হল ঐ তীর যা নিক্ষেপ করার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। رَجَسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ অর্থাৎ এগুলো গর্হিত বিষয়, আর এগুলো শাইতানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি এগুলো হচ্ছে নিকৃষ্টতম শাইতানী কাজ। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেছেন যে, ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) অভিমত ইহাই। (তাবারী ১০/৫৬৫) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেছেন যে, 'রিজস' এর অর্থ হচ্ছে পাপ বা অপরাধ। (তাবারী ৪/৩৩০) অন্য দিকে যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে শাইতানী কাজ। (তাবারী ১০/৫৬৫)

فَاجْتَنِبُوهُ এর ‘ه’ সর্বনামটি رَجَسُ শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ

তোমরা এগুলো পরিত্যাগ কর।

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ এ কথা দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে এসব কাজ পরিত্যাগ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : শাইতান তো ওটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখে, সুতরাং এখনও কি তোমরা (এসব কাজ থেকে) বিরত থাকবেনা? এ কথাগুলি আল্লাহ তা‘আলার বান্দাদের প্রতি ভয় প্রদর্শন ও সতর্কবাণী।

মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মদ তিনবার হারাম করা হয়। যখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় আগমন করেন সেই সময় মাদীনার লোকেরা মদ পান করত এবং জুয়ার মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ ভোগ করত। ঐ সম্পর্কে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা‘আলা নিম্নলিখিত আয়াত অবতীর্ণ করেন :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ

মাদক দ্রব্য ও জুয়া খেলা সম্বন্ধে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল : এ দু’টোর মধ্যে গুরুতর পাপ রয়েছে এবং কোন কোন লোকের (কিছু) উপকার আছে, কিন্তু ও দু’টোর লাভ অপেক্ষা পাপই গুরুতর। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২১৯) তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগল : আল্লাহ তা‘আলা এ দু’টো জিনিস আমাদের উপর হারাম তো করলেননা। তিনি শুধু বললেন যে, এ দু’টো জিনিসে আমাদের উপকার কম এবং ক্ষতি বেশী। সুতরাং তারা মদ পান করতেই থাকল। কিন্তু একদিন এমন এলো যে, এক মুহাজির সাহাবী নেশা অবস্থায় সালাতে কুরআন মাজীদ পাঠ করতে গিয়ে ভুল ও এলোমেলো করে ফেলে। তখন নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا

مَا تَقُولُونَ

হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের কাছেও যেওনা, যখন নিজের উচ্চারিত বাক্যের অর্থ নিজেই বুঝতে সক্ষম নও। (সূরা নিসা, ৪ : ৪৩) সুতরাং লোকেরা সালাতের সময় মদ পান করা পরিত্যাগ করল বটে; কিন্তু অন্য সময় পান করতেই থাকল। কেননা তখন পর্যন্ত স্পষ্টভাবে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। অবশেষে পরিষ্কারভাবে মদ পান করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এ সব গর্হিত বিষয়, শাইতানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৯০) তখন লোকেরা বলে : 'হে আমাদের প্রভু! আমরা বিরত থাকলাম।' অতঃপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মদ নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বে যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে নিহত হয়েছে কিংবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে; কিন্তু তারা মদ পান করত এবং জুয়া খেলত তাদের কি হবে? কেননা আল্লাহ তা'আলা তো এটাকে শাইতানী কাজ বলে আখ্যায়িত করলেন এবং নিষিদ্ধ করলেন।' তখন নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হল :

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعُمُوا

যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করে, এরূপ লোকদের উপর কোন পাপ নেই যা তারা পূর্বে আহার করেছে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৯৩) আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'যদি তাদের জীবদ্দশায় এটা হারাম করা হত তাহলে তোমরা যেমন তা ছেড়ে দিলে, তারাও তদ্রূপ ছেড়ে দিত।' (আহমাদ ২/৩৫১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে উমার (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বললেন : 'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য মদ সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা দিন!' তখন সূরা বাকারাহর ২১৯ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর যখন উমারকে (রাঃ) এ আয়াত শুনানো হয়

তখন তিনি পুনরায় প্রার্থনা করেন, ‘হে আল্লাহ! আমাদের জন্য মদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা দান করুন! তখন সূরা নিসার নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ

হে মু’মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের কাছেও যেওনা। (সূরা নিসা, ৪ : ৪৩) তখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে ঘোষণা দিতে বলেন যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। উমারকে (রাঃ) এ আয়াতটিও পড়ে শুনানো হয়। তিনি এবারেও বলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য আরও সুস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করে দিন! তখন সূরা মায়িদাহর উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এবারও উমারকে (রাঃ) আয়াতটি পাঠ করে শুনানো হয়। পাঠ করে যখন فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ‘সুতরাং তোমরা বিরত থাকবে কি? এ পর্যন্ত পৌছেন তখন উমার (রাঃ) বললেন : আমরা বিরত থাকলাম, আমরা বিরত থাকলাম। (আহমাদ ১/৫৩, আবু দাউদ ৪/৭৮, তিরমিযী ৮/৪১৭, নাসাঈ ৮/২৮৬) ইমাম আলী ইবনুল মাদিনী (রহঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে সহীহ বলেছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের রয়েছে যে, উমার (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন : হে লোকসকল! মদ হারাম ঘোষিত হয়েছে। আর পাঁচটি জিনিসের মধ্যে যেটা দিয়েই মদ তৈরী করা হবে সেটাই হারাম। সেই পাঁচটি জিনিস হচ্ছে : আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও যব। যে জিনিস পান করলে জ্ঞান লোপ পায় সেটাই মদ। (ফাতহুল বারী ৮/১২৬, মুসলিম ৪/২৩২২) সহীহ বুখারীতে ইবন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, যে সময় মদ হারাম করা হয় সে সময় মাদীনায়ে আঙ্গুরের মদ ছাড়া অন্যান্য জিনিসেরও পাঁচ রকমের মদ প্রস্তুত করা হত। (ফাতহুল বারী ৮/১২৬)

মুসনাদ আহমাদে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবু তালহার (রাঃ) বাড়ীতে আবু উবাইদাহ ইবন জাররাহ (রাঃ), উবাই ইবন কা’ব (রাঃ), সুহাইল ইবন বাইযা (রাঃ) এবং তাঁর অন্যান্য সাথীদেরকে মদ পান করাচ্ছিলাম। এমনকি তাদের মাতাল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এমতাবস্থায় কয়েকজন মুসলিম এসে বলেন : ‘মদকে হারাম করে দেয়া হয়েছে এ খবর কি আপনারা জানেন?’ তখন তারা বলেন, এখনও আমরা অপেক্ষা করব

এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। অতঃপর তারা বললেন : ‘হে আনাস! তোমার পাশে যা কিছু মদ অবশিষ্ট রয়েছে তা ঢেলে ফেলে দাও। আল্লাহর শপথ! এরপর তারা আর মদ পান করেননি। ওটা ছিল কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করে তৈরী করা মদ। (আহমাদ ৩/১৮১)

অন্য এক বর্ণনায় আনাস (রাঃ) বলেন : আবু তালহা (রাঃ) বাড়ীতে আমি লোকদেরকে মদ পরিবেশন করছিলাম। তখনও উহা নিষিদ্ধ হয়নি। সেই সময় কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করে মদ তৈরী করা হত। হঠাৎ একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করছিলেন। তখন আবু তালহা (রাঃ) বলেন, ‘বেরিয়ে দেখ তো! কি ঘোষণা করা হচ্ছে?’ তখন আমি জানতে পারলাম যে, ঘোষণাকারী ঘোষণা করছেন : ‘জেনে রেখ, মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে।’ বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেন, আবু তালহা (রাঃ) আমাকে বললেন, ‘বাইরে নিয়ে গিয়ে মদ বইয়ে দাও।’ তখন আমি তা বইয়ে দিলাম। ঐ সময় মাদীনার অলিতে গলিতে মদ বয়ে যাচ্ছিল। তখন কেহ কেহ বললেন : ‘অমুক ও অমুক যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, অথচ তখনও তাদের পেটে মদ বিদ্যমান ছিল।’ বর্ণনাকারী বলেন, তখন আল্লাহ তা‘আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا

ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করে, এরূপ লোকদের উপর কোন পাপ নেই যা তারা পূর্বে আহাৰ করেছে। (ফাতহুল বারী ৫/১৩৩, মুসলিম ৩/১৫৭০) ইবন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস (রাঃ) বলেন, আমি আবু তালহা (রাঃ), আবু উবাইদাহ ইবন জাররাহ (রাঃ), আবু দাজানা (রাঃ), মুআয ইবন জাবাল (রাঃ), সুহাইল ইবন বাহযা (রাঃ) প্রমুখ ব্যক্তিগণের কাছে মদ পরিবেশন করছিলাম যা ছিল কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করে তৈরী মদ এবং নেশার কারণে তাদের মাথাগুলি ঢলে পড়ছিল, এমন সময় আমি ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে শুনলাম, জেনে রেখ যে, মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে। এ কথা শোনা মাত্রই যারা আমাদের কাছে আসছিলেন এবং যারা আমাদের নিকট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, সবাই নিজ নিজ মদ বইয়ে দেন। আমরা সবাই মদের ড্রামগুলো ভেঙ্গে ফেলি। আমাদের কেহ কেহ উষ্ম করেন এবং কেহ কেহ গোসলও করেন এবং আমরা সুগন্ধি ব্যবহার করি। অতঃপর আমরা মাসজিদে গমন করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ هতে الْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
 আয়াতগুলি পাঠ করে শুনিয়ে দেন। একটি লোক তখন বলেন : হে আল্লাহর রাসূল
 সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যারা এটা পান করা অবস্থায় মারা গেছে তাদের
 لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا কি হবে? সেই সময় আল্লাহ তা‘আলা
 الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعُمُوا এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১০/৫৭৮)
 ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (আহমাদ
 ১/২৯৫, মুসলিম ৪/১৯১০, তিরমিযী ৮/৪১৯, নাসাঈ ৬/৩৩৭)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে,
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

দশটি বিষয়ের সাথে মদ জড়িত, যা সবই হারাম। মদ হারাম, উহা পানকারী,
 মদ পরিবেশনকারী, ক্রয়কারী, বিক্রয়কারী, বহনকারী, মদের ফরমায়েশকারী,
 পরিবহনকারী, যার কাছে পরিবহন করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিক্রিত মদের মূল্য
 দিয়ে আহরকারী। (আহমাদ ২/২৫, আবু দাউদ ২৬৭৪, ইব্ন মাজাহ ৩৩৮০)

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
 ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সফরে বের হন এবং আমিও তাঁর সাথে বের হই।
 আমি তাঁর ডান পাশে ছিলাম। এমন সময় আবু বাকর (রাঃ) আগমন করলেন।
 আমি তখন তাকে জায়গা দিয়ে নিজে পিছনে চলে গেলাম এবং আবু বাকর (রাঃ)
 তাঁর ডান দিকে গেলেন। আর আমি তাঁর বাম দিকে গেলাম। অতঃপর উমারকে
 (রাঃ) আসতে দেখে আমি সরে গেলাম এবং তিনি তাঁর বাম দিকে চলে গেলেন।
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদে পূর্ণ চামড়ার তৈরী একটি ব্যাগ
 দেখতে পেলেন। তিনি একটু তাকালেন এবং ছুরি দিয়ে ওটা কেটে ফেলার
 নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন : ‘মদ অভিশপ্ত। এ ছাড়া মদ পানকারী,
 পরিবেশনকারী, বিক্রয়কারী, ক্রয়কারী, পরিবহনকারী, বহনকারী, নিংড়িয়ে রস
 বের করাকারী, তৈরীকারী এবং ওর মূল্য গ্রহণকারী সকলের উপর আল্লাহর
 লান’ত।’ (আহমাদ ২/৭১)

সা’দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদের ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ
 হয়। অতঃপর তিনি বলেন, একজন আনসারী আমাদেরকে দা‘ওয়াত করেন।
 আমরা সেখানে প্রচুর মদ পান করি। এটা ছিল মদ হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা।
 আমরা যখন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি তখন আমরা পরস্পর গৌরব প্রকাশ করতে শুরু

করি। আনসারগণ বলেন, ‘আমরাই উত্তম।’ আবার কুরাইশরা (মুহাজির) বলেন, যে তারাই উত্তম।’ অতঃপর এক আনসারী উটের একটা বড় হাড় নিয়ে সা’দের (রাঃ) নাকে আঘাত করেন। ফলে সা’দের (রাঃ) নাকের হাড় ভেঙ্গে যায়। তখন **فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ** হতে **إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ** পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। (বাইহাকী ৮/২৮৫, মুসলিম ১৭৪৮)

মুসনাদ আহমাদে আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবু তালহা (রাঃ) তাঁর কাছে প্রতিপালিত ইয়াতীমদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করেন যারা উত্তরাধিকার সূত্রে মদ প্রাপ্ত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন : ‘ওটা বইয়ে দাও।’ আবু তালহা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, ‘ওর সিরকাহ বানিয়ে নিলে হয়না?’ তিনি জবাবে বলেন : ‘না।’

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতটি (৫ : ৯০) তাওরাতে লিপিবদ্ধ ছিল; আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবী থেকে সর্ববিধ মিথ্যা, নেশা ধরে এমন খেলা, বাজনা, বাঁশি, নাচ, ক্যাবারে/কনসার্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, ভালবাসার কবিতা/গান ইত্যাদিকে নির্মূল করার লক্ষ্যে সত্য ধর্মকে প্রেরণ করেছেন। যারা ‘খামর’ (الْخَمْرُ) পান করেছে তারা জানে যে, ইহা স্বাদে তিক্ত। আল্লাহ তাঁর ক্ষমতা বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে বলেন যে, উহা নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও যারা উহা পান করছে তাদেরকে তিনি কিয়ামাত দিবসে পিপাসার্ত করে উত্থিত করবেন, আর যারা নিষিদ্ধ করার পর উহা পান করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রেখেছে তাদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহের গৃহে (জান্নাতে) উহা পান করাবেন। (ইব্ন আবী হাতিম ৪/১১৯৬) ইহার বর্ণনাধারা সহীহ বলে সাব্যস্ত।

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি দুনিয়ার মদ পান করল এবং তা থেকে তাওবাহ করলনা, পরকালে তার জন্য তা হারাম হয়ে গেল।’ (বুখারী ৫৫৭৫, মুসলিম ২০০৩) ইব্ন উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

নেশার উদ্বেক করে এমন প্রতিটি বস্তু ‘খামর’ এবং প্রতিটি নেশাকৃত বস্তুই হারাম। যারা এই ‘খামর’ পান করে এবং নেশা অবস্থায় মারা যায় (তাওবাহ

করার সুযোগ হয়না) তাহলে পরকালে তাদেরকে উহা পান করতে দেয়া হবেনা। (মুসলিম ২০০৩)

আবদুর রাহমান ইব্ন হারিস ইব্ন হিসাম (রহঃ) বলেন যে, তিনি উসমান ইব্ন আফ্ফানকে (রাঃ) একবার জনগণকে সম্বোধন করে বলতে শোনেন : তোমরা মদ পান করা থেকে বিরত থাক, কেননা এটাই হচ্ছে সমস্ত পাপ ও অশ্রীলতার মূল। তোমাদের পূর্ব যুগে একজন বড় ‘আবেদ লোক ছিল। সে জনগণের সাহচর্যে না থেকে ইবাদাতে লিপ্ত থাকত। একটি পতিতা মহিলার তার প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়। সে তাকে কিছু দেখানোর বাহানায় তার চাকরাণীর মাধ্যমে তাকে ডেকে পাঠায়। সে তার সাথে চলে আসে। অতঃপর সে যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, পিছন থেকে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। অবশেষে সে মহিলাটির নিকট হাযির হয়ে দেখতে পায় যে, সেখানে এক যুবক চাকর এবং কিছু মদ রয়েছে। ঐ পতিতা তাকে বলল : ‘আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে কোন কিছু দেখানোর উদ্দেশ্যে ডাকিনি। বরং এই উদ্দেশ্যে ডেকেছি যে, আপনি আমার সাথে রাত কাটাবেন, এই যুবকটিকে হত্যা করবেন অথবা এই মদ পান করবেন।’ তখন সে (হত্যা ও ব্যভিচার অপেক্ষা মদ পানের পাপকে ছোট মনে করে) এক পেয়লা মদ পান করে। তারপর বলে : ‘আমাকে আরও দাও।’ শেষ পর্যন্ত সে নেশাগ্রস্ত হয়ে ঐ পতিতার সাথে ব্যভিচারী করে এবং যুবকটিকে হত্যা করে। তাই তোমরা মদ/নেশা থেকে বিরত থাক। মদ ও ঈমান কখনও এক জায়গায় জমা হতে পারেনা। মদ থাকলে ঈমান নেই এবং ঈমান থাকলে মদ নেই। (বাইহাকী ৮/২৮৭, ২৮৮) এই বর্ণনাটির সঠিক ধারাবাহিক বর্ণনাক্রম রয়েছে। আবু বাকর ইব্ন আবীদ্বুনইয়া (রহঃ) তার গ্রন্থে নেশা বিষয়ক অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু তিনি ইহা ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে’ বর্ণিত লিখেছেন। উসমান (রাঃ) হতে যে বর্ণনাটি পাওয়া যায় সেটি বেশী সঠিক। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

তার এ উক্তির প্রমাণ হিসাবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ঐ হাদীসটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ব্যভিচারী যে সময় ব্যভিচার করে সে সময় সে মু’মিন থাকেনা, চোর যখন চুরি করে তখন সে মু’মিন থাকেনা এবং মদ পানকারী যখন মদ পান করে তখন সে মু’মিন থাকেনা। মুসনাদ আহমাদে আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : ‘যে ব্যক্তি মদ পান করে, আল্লাহ তার উপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত অসম্ভষ্ট

থাকেন। ঐ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তাহলে সে কাফির হয়ে মারা যাবে। আর যদি সে তাওবাহ করে তাহলে আল্লাহ সেই তাওবাহ কবুল করবেন। কিন্তু যদি সে পুনরায় এতে ফিরে যায় (অর্থাৎ পুনরায় পান করতে শুরু করে) তাহলে তাকে طِيْنَةُ الْخَبَالِ পান করানোর অধিকার আল্লাহর আছে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! طِيْنَةُ الْخَبَالِ কি? তিনি উত্তরে বললেন : 'তা হচ্ছে জাহান্নামীদের পুঁজ।'

৯৪। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে কতক শিকারের দ্বারা পরীক্ষা করবেন, যে শিকার পর্যন্ত তোমাদের হাত ও তোমাদের বল্লম পৌছতে পারবে, এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে তাঁকে না দেখে ভয় করে। সুতরাং যে ব্যক্তি এরপরও সীমা লংঘন করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

۹۴. يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

৯৫। হে মু'মিনগণ! তোমরা ইহ্রামের অবস্থায় নিষিদ্ধ এলাকায় বণ্য শিকারকে হত্যা করনা; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্বক শিকার বধ করবে তার উপর তখন বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা (মূল্যের দিক দিয়ে) সেই জানোয়ারের সমতুল্য হয় যাকে সে হত্যা করেছে, যার

۹۵. يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِن

(আনুমানিক মূল্যের) মীমাংসা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি করে দিবে। (অতঃপর নিরূপিত মূল্য দ্বারা) সেই বিনিময় গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু নেয়ায় স্বরূপ কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিবে, না হয় কাফফারা স্বরূপ (নিরূপিত মূল্যের খাদ্যদ্রব্য) মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দিবে, অথবা এর সম পরিমাণ সিয়াম পালন করবে, যেন নিজের কৃতকর্মের পরিণামের স্বাদ গ্রহণ করে; অতীত (ত্রুটি) আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন; আর পুনরায় যে ব্যক্তি এরূপ কাজই করবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তি হতে (এর) প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন; আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।

الْغَنَمِ تَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ
مِّنْكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ
كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ
عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ
وَبَالَ أَمْرِهِ ۚ عَفَا اللَّهُ عَمَّا
سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ
مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

ইহরাম অবস্থায় এবং হারাম এলাকায় শিকার করা নিষেধ

এ লَيْبُلُوْكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, শিকার দুর্বল হোক বা ছোট হোক, তোমরা ইহরামের অবস্থায় শিকার করা থেকে বিরত থাকছ কিনা। এমনকি যদি লোকেরা চায় তাহলে সেই শিকারকে হাতে ধরে নিতে পারে, তাই তাদেরকে তার নিকটবর্তী হতেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিষেধ করলেন। (তাবারী ১০/৫৮৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ দ্বারা ছোট ও বাচ্চা শিকারকে বুঝানো হয়েছে। وَرَمَاهُمْ দ্বারা বুঝানো হয়েছে

বড় শিকার। (তাবারী ১০/৫৮৩) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, মুসলিমরা যখন উমরাহ পালনের উদ্দেশে হুদাইবিয়ায় অবস্থান করছিলেন। সেখানে বন্য চতুষ্পদ জন্তু, পাখী এবং অন্যান্য শিকার তাদের অবস্থান স্থলে জমা হয়ে গিয়েছিল। এরূপ দৃশ্য তারা ইতোপূর্বে দেখেননি। সেই সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (দুররুল মানসুর ৩/১৮৫) সুতরাং ইহরাম অবস্থায় তাদেরকে শিকার করতে নিষেধ করা হয় যাতে আল্লাহ তা'আলা জানতে পারেন যে, কে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করছে এবং কে করছেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

নিশ্চয়ই যারা তাদের রাব্বকে না দেখেই ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। (সূরা মূলক, ৬৭ : ১২) এখন আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এরপরে যারা নাফরমানী করবে তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। কেননা সে মহান আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ এ নিষেধাজ্ঞা অর্থের দিক দিয়ে ধরা হলে হালাল জন্তু, ওর বাচ্চা এবং হারাম প্রাণীগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে প্রাণীগুলোকে সর্বাবস্থায় হত্যা করার বৈধতা সাব্যস্ত আছে সেই হাদীসটি নিম্নরূপ :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'পাঁচটি (প্রাণী) হালাল ও হারাম সর্বাবস্থায় হত্যা করা যায়। ঐ পাঁচটি হচ্ছে কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর এবং কামড়ে দেয় এমন কুকুর।' (বুখারী ৩৩১৪, মুসলিম ১১৯৮) ইমাম মালিক (রহঃ) নাফে' (রাঃ) ও ইব্ন উমরের (রাঃ) মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'পাঁচটি বিচরণকারীকে হত্যা করা মুহরিমের জন্য কোন অপরাধমূলক কাজ নয়। সেগুলো হচ্ছে কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর এবং কামড়ে দেয় এ ধরনের কুকুর।' (মুআত্তা ১/৩৫৬, ফাতহুল বারী ৪/৪২, মুসলিম ২/৮৫৮, নাসাই ৫/১৯০) আইউব (রহঃ) বলেন, আমি নাফে'কে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলাম, সাপের হুকুম কি? তিনি উত্তরে বললেন : 'সাপকে হত্যা করার ব্যাপারে তো কোন সন্দেহই নেই। (ফাতহুল বারী ৬/৪৪) ইমাম মালিক (রহঃ), ইমাম আহমাদ (রহঃ) প্রমুখ আলেমগণ কামড়ে দেয় এরূপ কুকুরের সাথে নেকড়ে বাঘ, সিংহ, চিতা বাঘ, বাঘ এবং এ ধরনের অন্যান্য হিংস্র প্রাণীকেও সামিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। আবু

সাদ্দিদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, মুহরিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ প্রাণী হত্যা করতে পারবে। উত্তরে তিনি বলেন যে, তা হল : সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, কাক, পাগলা কুকুর, চিল এবং বন্য হিংস্র পশু। (আবু দাউদ ২/৪২৪, তিরমিযী ৩/৫৭৬, ইব্ন মাজাহ ২/১০৩২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি সহীহ বলেছেন।

ইহরাম অবস্থায় অথবা হারাম এলাকায় শিকার করার কাফফারা

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ বিজ্ঞজনদের উক্তি
এই যে, কাফফারা আদায় করার ব্যাপারে ইচ্ছাপূর্বক ও ভুলবশতঃ হত্যাকারী উভয়েই সমান। ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন যে, কুরআন কারীম দ্বারা শুধু ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর উপর কাফফারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয় বটে, কিন্তু হাদীস দ্বারা ভুলবশতঃ হত্যাকারীর উপরও কাফফারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়। (তাবারী ১১/৮) ভাবার্থ হল এই যে, কুরআন কারীম দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর উপর যেমন কাফফারা ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হল, তেমনিভাবে তার পাপী হওয়াও সাব্যস্ত হল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ
তার পাপের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করে, তবে যা অতীত হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, আর যে ব্যক্তি পুনরায় সেই কাজ করবে, আল্লাহ তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।’ আহকামে নববী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আহকামে আসহাব দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, ভুলবশতঃ হত্যা করার অবস্থায়ও কাফফারা দিতে হবে, যেমন ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করলে কুরআনুল হাকীমের নির্দেশ অনুযায়ী কাফফারা দিতে হয়। (তাবারী ১১/১১) কেননা যদি শিকারকে হত্যা করা হয় তাহলে তাকে নষ্ট করা হল। আর যখন ইচ্ছাপূর্বক নষ্ট করবে তখন তাকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হয়, তদ্রূপ ভুলবশতঃ নষ্ট করলেও এটাই হুকুম। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, ইচ্ছাপূর্বক শিকারকারী কাফফারার সাথে পাপীও হয়, কিন্তু ভুলবশতঃ শিকারকারী পাপী হয়না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

مُحْرِمًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
অনুরূপ আর একটি প্রাণীকে তার কুরবানী করতে হবে। সাহাবীগণ এই অভিমত

ব্যক্ত করেছেন যে, একটি জেব্রার জন্য একটি উট, একটি বন্য গরুর জন্য একটি পালিত গরু এবং একটি হরিনের জন্য একটি ছাগল নির্ধারিত হবে। ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে, শিকারকৃত প্রাণীর সম পরিমান কোন কিছু পাওয়া যাচ্ছেনা তাহলে ঐ শিকারের মূল্য নির্ধারণ করে তা সাদাকাহ হিসাবে মাঙ্কায় ব্যয় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

دُوَا عَدْلٌ مِّنْكُمْ يُحْكُمُ بِهِ (দু'জন সৎকর্ম পরায়নশীল ব্যক্তি শিকার করা

প্রাণীর সমান মূল্যমানের প্রাণী অথবা মূল্য নির্ধারণ করবেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবু জারীর আল বাজালী (রহঃ) বলেছেন : ইহরাম অবস্থায় আমি একটি হরিণ শিকার করি এবং ব্যাপারটি উমারকে (রাঃ) অবগত করি। তিনি বললেন : তোমার দুই ভাইকে নিয়ে এসো, তারা তোমার ব্যাপারে ফাইসালা করুক। সুতরাং আমি সাদ (রাঃ) এবং আবদুর রাহমানের (রাঃ) কাছে গেলাম এবং তারা একটি ভেড়া কুরবানী করার জন্য আমাকে বললেন। (তাবারী ১১/২৭) ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তারিক (রাঃ) বলেছেন : আরবাদ (রাঃ) ইহরাম অবস্থায় একটি হরিন শিকার করেন, অতঃপর উমারের (রাঃ) নিকট গিয়ে এর ফাইসালা জিজ্ঞেস করেন। তখন উমার (রাঃ) বলেন : এসো আমরা এ বিষয়ে উভয়ে সিদ্ধান্ত নেই। অতঃপর তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আরবাদকে (রাঃ) একটি ছাগল কুরবানী দিতে হবে। (তাবারী ১১/২৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فِدْيَا بِالْكَعْبَةِ (ফিদইয়ার পশুটি হারাম এলাকায় নিয়ে আসতে হবে এবং

কুরবানী করার পর গরীব লোকদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে। এ বিষয়ে সকলের ঐক্যমত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا (মুহরিম ব্যক্তি যদি

ফিদইয়া আদায় করতে সক্ষম না হন অথবা শিকারকৃত পশুর সাথে সাযুজ্য কোন প্রাণী না থাকে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের বিশ্লেষণে বলেছেন : মুহরিম অবস্থায় শিকার করলে তার ফাইসালা হচ্ছে শিকারের অনুরূপ পশু কুরবানী করা। যদি সে হরিণ শিকার করে তাহলে সে হারাম এলাকায় একটি মেঘ কুরবানী করবে। যদি সে তা করতে সক্ষম না হয় তাহলে ছয়জন গরীব লোককে খাদ্য প্রদান করবে অথবা তিন দিন সিয়াম পালন করবে। যদি সে বন্য প্রাণী শিকার করে তাহলে একটি গরু কুরবানী করবে। সে

তাতে সক্ষম না হলে ২০ জন গরীব লোককে খাদ্য প্রদান করবে, অথবা ২০ দিন সিয়াম পালন করবে। যদি সে একটি জেব্রা শিকার করে তাহলে তাকে একটি উট কুরবানী করতে হবে অথবা ৩০ জন গরীব লোককে খাদ্য প্রদান করতে হবে অথবা ৩০ দিন সিয়াম পালন করতে হবে। ইব্ন আবী হাতীম (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেছেন যে, প্রত্যেককে এক মুদ করে খাদ্য প্রদান করতে হবে যা একজন গরীবের জন্য যথেষ্ট। (তারাবী ১১/৩১)

لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِه যেন সে তার দুষ্কর্মের শাস্তি গ্রহণ করে। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : আমি তার উপর কাফ্ফারা এ জন্যই ওয়াজিব করেছি যে, সে যেন আমার হুকুমের বিরোধিতার শাস্তি ভোগ করে। কিন্তু অজ্ঞতার যুগে তার দ্বারা যা কিছু সাধিত হয়েছিল তা আমি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখব। কেননা সে ইসলাম গ্রহণের পর ভাল কাজ করেছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ইসলাম গ্রহণের পর এর নিষিদ্ধতা সত্ত্বেও যে আল্লাহর নাফরমানী করে ওটা করে বসবে, আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তিনি বিরুদ্ধাচারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তবে অজ্ঞতার যুগে যা কিছু হয়েছে তা তিনি ক্ষমা করবেন। আবার এ প্রশ্নের উত্তর না বাচক হবে যে, ইসলামের ইমাম/শাসক কি এর কোন শাস্তি দিতে পারেন? অর্থাৎ ইমামের/শাসকের শাস্তি প্রদানের কোন অধিকার নেই। এ পাপ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যকার ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, ইমামের/শাসকের তাকে শাস্তি দেয়ার অধিকার না থাকা সত্ত্বেও ফিদইয়া তাকে অবশ্যই আদায় করতে হবে। (তাবারী ১১/৪৮) এটা ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা কাফ্ফারার মাধ্যমেই প্রতিশোধ নিয়ে নিবেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের রূপ এটাই হবে।

সান্দ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), 'আতা (রহঃ) এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিজ্ঞজনবৃন্দ এর উপর একমত যে, মুহরিম যখন শিকারকে হত্যা করে ফেললো তখন তার উপর ফিদইয়া ওয়াজিব হয়ে গেল। (তাবারী ১১/৫০) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভুলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, ভুল যতবারই হোক না কেন ততবারই ফিদইয়া দিতে হবে। ভুলবশতঃ কাজ এবং ইচ্ছাপূর্বক কাজ হুকুমের দিক দিয়ে সব সমান।

وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্যে প্রবল পরাক্রান্ত, মহা বিজয়ী।
 কেহ তাঁকে তাঁর কাজে বাধা দিতে পারেনা। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাইলে
 কে এমন আছে যে, তাঁর এ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে? (তাবারী
 ১১/৫৭) সারা জগত তাঁরই সৃষ্ট। সুতরাং এখানে হুকুম শুধু তাঁরই চলবে।
 বিরুদ্ধাচারীদেরকে তিনি শাস্তি অবশ্যই দিবেন।

৯৬। তোমাদের জন্য সামুদ্রিক
 শিকার ধরা ও খাওয়া হালাল
 করা হয়েছে তোমাদের ও
 মুসাফিরদের উপকারের জন্য,
 আর স্থলচর শিকার ধরা
 তোমাদের জন্য হারাম করা
 হয়েছে যতক্ষণ তোমরা
 ইহরাম অবস্থায় থাক; আর
 আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর
 সমীপে তোমাদেরকে একত্রিত
 করা হবে।

৯৬. أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ
 وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
 وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا
 دُمْتُمْ حُرُمًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

৯৭। সম্মানিত গৃহ কা'বাকে
 আল্লাহ মানুষের স্থিতিশীলতার
 কারণ রূপে তৈরী করেছেন
 এবং সম্মানিত মাসসমূহকে,
 হারামে কুরবানীর জঙ্ককে এবং
 সেই পশুকেও যার গলায়
 বিশেষ ধরনের বেড়ী পড়ানো
 হয়েছে। এটা এ জন্য যেন
 তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে,
 নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশসমূহ
 ও যমীনস্থিত সব বস্তুই খবর
 রাখেন, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ

৯৭. جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ
 الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ
 الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلْتِدَ
 ذَلِكَ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
 فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।	
৯৮। তোমরা জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা এবং নিশ্চয়ই অতি ক্ষমাশীল।	<p>৭৮. اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ</p>
৯৯। রাসূলের দায়িত্ব শুধু পৌছে দেয়া মাত্র; আর তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর এবং যা কিছু গোপন কর তা সবকিছুই আল্লাহ জানেন।	<p>৭৯. مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَّغُ^ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ</p>

মুহরিমের মাছ শিকার করা বৈধ

أَحْلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ আল্লাহ তা'আলার এ উক্তির ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রহঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমাদের জন্য সমুদ্রের তাজা বা সজীব শিকার হালাল। আর وَطَعَامُهُ এর ভাবার্থ হচ্ছে যে মাছ শুকিয়ে পাথেয় তৈরী করা হয় সেটাও তোমাদের জন্য হালাল। (তাবারী ১১/৫৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে আর একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা এই যে, صَيْدُ الْبَحْرِ দ্বারা ঐ শিকারকে বুঝানো হয়েছে যা সমুদ্র হতে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আর طَعَامٌ দ্বারা সমুদ্রের ঐ মৃত শিকারকে বুঝানো হয়েছে যা মৃত অবস্থায় সমুদ্রের তীরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। একই বর্ণনা পাওয়া যায় আবু বাকর (রাঃ), যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ), আবু আইউব আনসারী (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবু সালামাহ ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) হতে।

وَاللَّسِّيَّارَةَ এখানে سَيَّارَةٌ শব্দটি سَيَّارٌ শব্দের বহু বচন। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, সমুদ্রের তীরবর্তী লোকেরা তো সামুদ্রিক টাটকা প্রাণী শিকার করে থাকে। আর যা মরে যায় তা শুকিয়ে জমা করে রাখে। কিংবা

তারা শিকার করে লবণ মেখে রেখে দেয় এবং ওটা মুসাফির ও সমুদ্রের দূরবর্তী লোকদের জন্য পাথের কাজ দেয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদী (রহঃ) ও অন্যান্যরা মৃত মাছ হালাল হওয়ার দলীল হিসাবে এ আয়াতটিকে গ্রহণ করেছেন। (তাবারী ১১/৭২, ৭৩) ইমাম মালিক (রহঃ) যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ব সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং আবু উবাইদাহ ইব্ন জাররাহকে (রাঃ) ঐ বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয়। তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ’ এবং আমিও তাদের একজন ছিলাম। আমরা পথ চলতে চলতে এমন এক জায়গায় উপস্থিত হই যেখানে আমাদের পাথের নিঃশেষ হয়ে আসে। তখন আবু উবাইদাহ (রাঃ) সকলের পাথের একত্রিত করার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশক্রমে সমস্ত পাথের দু’টি খেজুরের ব্যাগে জমা করা হয়। আবু উবাইদাহ (রাঃ) প্রতিদিন তা থেকে আমাদেরকে অল্প অল্প করে বরাদ্দ করেন এবং অবশেষে ওগুলিও শেষ হয়ে আসে এবং রসদ হিসাবে আমরা শুধুমাত্র একটি করে খেজুর পেতে থাকি। আমি (বর্ণনাকারীদের একজন) বললাম : একটি খেজুর দ্বারা কিভাবে আপনাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হত? যাবির (রাঃ) বললেন : একটি খেজুরেরও যে কি মূল্য তা বুঝতে পারলাম যখন আমাদের কাছে থাকা সব খাদ্য ফুরিয়ে গেল।

অবশেষে আমরা মৃত প্রায় অবস্থায় সমুদ্র তীরে উপনীত হই এবং দেখি যে, পাহাড় সমান একটি বিরাট মাছ পড়ে রয়েছে। সেনাবাহিনীর সমস্ত লোক আঠার দিন পর্যন্ত ওটা আহার করে। আবু উবাইদাহ (রাঃ) ওর পাঁজরের হাড় দু’টিকে মাটিতে গেঁথে দেয়ার নির্দেশ দেন। অতঃপর ওর নীচ দিয়ে একজন উষ্ট্রারোহীকে গমন করার আদেশ দিলে তিনি ওর নীচ দিয়ে চলে যান, কিন্তু তার মাথা গেঁথে দেয়া পাঁজরের উপরের অংশ স্পর্শ করলনা। (মুআত্তা ২/৯৩০, ফাতহুল বারী ৫/১৫২, মুসলিম ৩/১৫৩৫)

ইমাম মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা সমুদ্রে সফর করে থাকি এবং অল্প পানি সঙ্গে রাখতে পারি। যদি আমরা ঐ পানিতে উষ্ম করি তাহলে পিপাসার্ত থেকে যাই। সুতরাং আমরা সমুদ্রের পানিতে উষ্ম করতে পারি কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন : ‘সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং মৃত (মাছও) হালাল।’ (মুয়াত্তা ১/২২)

ইমাম শাফিঈ (রহঃ) এবং ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বলসহ (রহঃ) সুনানের চার গ্রন্থ প্রণেতাগণ এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ) এবং ইব্ন হিব্বান (রহঃ) একে সহীহ বলেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক সাহাবীও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (মুসনাদ আশ-শাফিঈ ২৫, আহমাদ ২/২৩৮, আবু দাউদ ৮৩, তিরমিযী ৬৯, নাসাঈ ১/৫০, ইব্ন মাজাহ ৩৮৬, ইব্ন হিব্বান ১১৯, ইব্ন খুজাইমাহ ১১১)

ইহরাম অবস্থায় স্থলচর প্রাণীও শিকার করা নিষেধ

বলা হয়েছে : **وَحُرْمَ عَلَیْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا** ইহরামের অবস্থায় তোমাদের জন্য স্থলচর শিকার ধরা হারাম। যদি তোমরা ইচ্ছাপূর্বক এ কাজ কর তাহলে তোমরা পাপীও হবে এবং তোমাদেরকে ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। আর যদি ভুলবশতঃ কর তাহলে ক্ষতিপূরণ দেয়ার পর তোমরা পাপ থেকে মুক্তি পাবে বটে, কিন্তু ঐ শিকার খাওয়া সকলের জন্য হারাম হবে তা সে ইহরাম অবস্থায় থাকুক অথবা না থাকুক। কেননা ওটা মৃতেরই অনুরূপ। যদি কেহ ইহরাম বিহীন অবস্থায় হারাম এলাকায় শিকার করে এবং সেই খাদ্য যদি কোন মুহরিমকে খেতে দেয়া হয় তাহলে মুহরিমের জন্য ঐ খাদ্য খাওয়া জাযিয় হবেনা, যদি ঐ শিকার মুহরিমের খাওয়ার উদ্দেশেই হয়ে থাকে। সাহাবী ইব্ন যাসসামা (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি বন্য গাধা হাদিয়া দেন, কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দেন। অতঃপর তিনি তাঁর চেহারা অসম্ভবির ভাব লক্ষ্য করে বলেন : ‘আমি ওটা ফিরিয়ে দিয়েছি একমাত্র এ কারণে যে, আমি ইহরামের অবস্থায় রয়েছি।’ (বুখারী ১৮২৫, ২৫৭৩; মুসলিম ২/৮৫০) এর কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধারণায় ঐ শিকার তাঁর উদ্দেশে ছিল। সেই জন্যই তিনি তা ফেরত দিয়েছিলেন। সুতরাং যদি কোন শিকার মুহরিমের উদ্দেশে করা না হয় তাহলে মুহরিমের জন্য ওটা খাওয়া জাযিয় হবে। কেননা আবু কাতাদাহর (রাঃ) হাদীসে রয়েছে যে, তিনি একটি বন্য গাধা শিকার করেছিলেন। সেই সময় তিনি মুহরিম ছিলেননা। কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা মুহরিম ছিলেন। তাই তারা ওটা আহার করা থেকে বিরত থাকলেন। ঐ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : ‘তোমাদের কেহ কি শিকারীকে শিকার দেখিয়ে দিয়েছিল বা শিকারকে হত্যা করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছিল?’ সাহাবীগণ উত্তরে বললেন : ‘না।’ তখন তিনি বললেন : ‘তাহলে তোমরা খাও।’ আর স্বয়ং

তিনিও খেলেন। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও বহু শব্দে বর্ণিত আছে। (ফাতহুল বারী ৯/৫২৮, মুসলিম ২/৩৬২)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর অসীম ক্ষমতার কথা ভুলে যেওনা। তিনি তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যা মেনে চলতে আদেশ করেন তা মেনে চলবে এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলেন তা থেকে বিরত থাকবে। এ আয়াতের মাধ্যমে 'খামর', 'জুয়া', 'আনসাব' এবং 'আযলাম' নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও নিষেধ করা হয়েছে ইহরাম অবস্থায় স্থলপ্রাণী শিকার করা অথবা হত্যা করা। তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং ওটাই সর্বশেষ গন্তব্য স্থল। তখন তিনি তোমাদের উত্তম কাজের জন্য পুরস্কৃত করবেন এবং অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দিবেন। অতঃপর আল্লাহ বলেন :

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কা'বাগৃহকে নিরাপদ স্থান হিসাবে ঘোষণা করেছেন তাদের জন্য, অত্যাচারিত হওয়ার পর যাদের সাহায্য করার মত কোন অভিভাবক নেই, অসৎ ব্যক্তির কবল থেকে সৎ আমলকারীকে রক্ষার জন্য এবং মায়লুম ব্যক্তিকে যালিম থেকে হিফাযাত করার জন্য।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি এই মাসকে মানুষের জন্য করেছেন নিরাপত্তার প্রতীক, যেমন তিনি নিরাপত্তা দান করেছেন কা'বাগৃহে আশ্রয় গ্রহণকারীদের জন্য। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন জেনে নিতে পারেন যে, কে তাঁর আদেশ মান্য করছে এবং কে অমান্য করছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কা'বা ঘর, এই পবিত্র মাস (যিলহাজ্জ), যে পশুকে মালা পড়িয়ে কুরবানীর জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ওখানের লোকদেরকে আরাববাসী হতে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন, যারা এ বিষয়সমূহকে নিরাপত্তার প্রতীক হিসাবে মেনে চলত। এ নিরাপত্তার উদাহরণ এভাবে দেয়া যেতে পারে যে, কোন গোত্রপ্রধানকে তার লোকেরা মেনে চলে এবং এর পরিবর্তে তিনি তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান করেন। কা'বা ঘরের পবিত্রতার ব্যাপারে এর চতুর্দিকে একটি সীমারেখা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা একে 'হারাম' বলে অভিহিত করেছেন। এই সীমারেখার মধ্যে কোন প্রাণী শিকার করা, এর গাছপালা-ঘাস উপড়ে ফেলা সম্পূর্ণ নিষেধ। অনুরূপভাবে কা'বা ঘর, পবিত্র মাস এবং কুরবানীর পশুর ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। জাহিলিয়াত যামানায়ও এগুলি পবিত্র বলে মনে করা হত এবং লোকেরাও তা মেনে চলতে তৎপর ছিল। ইসলামের পুনর্জাগরণের

পরেও হাজ্জ এবং সালাতের জন্য তা মুসলিমদের ইবাদাতের 'প্রতীক' হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

ذَٰلِكَ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ হে লোকসকল! আমি তোমাদের জন্য এ সমস্ত প্রতীকী চিহ্ন এ জন্য নির্দিষ্ট করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, যিনি তোমাদের নিরাপত্তা ও নি'আমাত দান করেছেন তিনি অবশ্যই জানেন যে, আকাশ ও পৃথিবীতে তোমাদের জন্য আরও আশু ও পরবর্তী কি কি নি'আমাতসমূহ রেখে দিয়েছেন। তোমরা জেনে রেখ যে, সবকিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্তে রয়েছে, তোমাদের কাজ ও পরিকল্পনা তাঁর অজানা নয় এবং তাঁকে কোন কিছু এড়িয়েও যেতে পারেনা। সবকিছুই তাঁর জ্ঞানে রয়েছে যাতে তিনি উত্তম আমলকারীকে পুরস্কৃত করতে পারেন এবং খারাপ আমলকারীকে শাস্তি দিতে পারেন। অতঃপর তিনি আরও বলেন : তোমাদের রাব্ব! যাঁর কাছে রয়েছে ভূমন্ডল এবং নভোমন্ডলের জ্ঞান, আর তোমরা যা কর, তা গোপনীয় হোক অথবা প্রকাশ্য হোক তা তাঁর কাছে অজানা নয়। তাঁকে অমান্য ও অস্বীকারকারীকে দিবেন কঠিনতম শাস্তি। অন্য দিকে যারা তাদের পাপের কারণে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন। কারণ পাপের কারণে ক্ষমা প্রার্থীকে শাস্তির পরিবর্তে ক্ষমা করার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত দয়াবান। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

দায়িত্ব হচ্ছে শুধু পৌঁছে দেয়া মাত্র; আর তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর এবং যা কিছু গোপন কর তা সবকিছুই আল্লাহ জানেন। এ আয়াতটি আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর বান্দাদের প্রতি একটি সাবধান বাণী। এখানে তিনি তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলছেন : হে নাবী! আমি তোমার কাছে যে বাণী প্রেরণ করেছি, তোমার কর্তব্য হল তা মানুষের কাছে প্রচার করা এবং এর ফলে যে মেনে চলল তার পুরস্কার এবং যে অস্বীকার করল তার শাস্তি নির্ধারণের মালিক আমিই। যে আমার বাণী মেনে চলল সে যেমন আমার জ্ঞানের অগোচরে নয় তেমনি যে আমার বাণীকে অস্বীকার করল অথবা অগ্রাহ্য করল সেও আমার জ্ঞানের বাইরে নয়। আমি ভাল করেই জানি যে, তোমরা কে কি কর, কি ধরনের দা'ওয়াত দাও এবং তোমাদের জিহ্বা দ্বারা কে কি উচ্চারণ কর। আমি আরও জানি যে, তোমাদের অন্তরে তোমরা কে কি লুকিয়ে রাখ, কে কতখানি ঈমান রাখ অথবা মনের ভিতর নিফাক পোষণ কর। অতএব এসব বিষয়গুলি যাঁর জ্ঞানায়ত্তে রয়েছে

তাঁর কাছ থেকে অন্তরে গোপন রাখতে পারে এমন কেহ আকাশ ও পৃথিবীতে নেই। একমাত্র তাঁরই হাতে রয়েছে পুরস্কার অথবা শাস্তি, অতএব তাঁকেই ভয় কর, তাঁকেই মেনে চল এবং কখনো তাঁর অবাধ্য হয়োনা।

১০০। তুমি বলে দাও : পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। অতএব হে জ্ঞানীগণ! আল্লাহকে ভয় করতে থাক যেন তোমরা (পূর্ণ) সফলকাম হতে পার।

۱۰۰. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَأْتِ بِأُولَىٰ أَلَلْبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

১০১। হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন সব বিষয় জিজ্ঞেস করনা, যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেয়া হয় তাহলে তোমাদের খারাপ লাগবে, আর যদি তোমরা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর তাহলে তোমাদের জন্য প্রকাশ করে দেয়া হবে, অতীতের জিজ্ঞাসাবাদ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, অতিশয় সহিষ্ণু।

۱۰۱. يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبَدَ لَكُمْ ۚ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

১০২। এরূপ বিষয় তোমাদের পূর্বে অন্যান্য লোকেরাও জিজ্ঞেস করেছিল,

۱۰۲. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ

অতঃপর ঐ সব বিষয়ের হক
তারা আদায় করেনি।

قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا
كَفِرِينَ

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : ‘হে মুহাম্মাদ! তুমি মানুষকে বলে দাও : হে মানবমণ্ডলী! অপবিত্র বস্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল মনে হলেও পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু সমান নয়। তোমরা জেনে রেখ যে, উপকারী পবিত্র জিনিস অল্প হলেও তা অধিক হারাম বস্তু হতে উত্তম যা তোমাদের ক্ষতি সাধন করে থাকে। যেমন হাদীসে রয়েছে : ‘অল্প ও প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট জিনিস সেই অধিক জিনিস হতে উত্তম যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ হতে গাফেল ও উদাসীন রাখে।’

অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা উচিত

মহান আল্লাহ এরপর বলেন : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ كُمْ تَسْأَلُونَ হে মু‘মিনগণ! তোমরা এমন সব বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করনা যে, যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হয় তাহলে তোমাদের বিরক্তির কারণ হবে। এটা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে তাঁর মু‘মিন বান্দাদেরকে ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে অপকারী ও ক্ষতিকর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কেননা যদি ঐ বিষয়গুলি প্রকাশ করা হয় তাহলে তারা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। যেমন সহীহ বুখারীতে আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা এমন এক খুতবা দেন যা আমি ওর পূর্বে কখনও শুনিনি। ঐ খুতবায় তিনি বলেন :

‘আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে তোমরা হাসতে খুব কম এবং কাঁদতে খুব বেশী।’ এ কথা শুনে সাহাবীগণ মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করেন। একটি লোক জিজ্ঞেস করে : ‘আমার পিতা কে ছিলেন?’ তিনি উত্তরে বলেন : অমুক। তখন لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী

৮/১৩০, ১১/৩২৬; মুসলিম ৪/১৮৩২, আহমাদ ৩/১৮০, তিরমিযী ৮/৪২১)

কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ**

মুম্পর্কে আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেছেন যে, একদা লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একের পর এক প্রশ্ন করতেই থাকেন যা তাঁকে বিরক্ত করে তোলে, ফলে তিনি মিসরে আরোহন করেন এবং বলেন : তোমরা আমাকে আজ আর কোন প্রশ্ন করবেনা, যদি দরকার হয় তাহলে আমি তোমাদেরকে যা বলার তা বলব। এতে সাহাবীগণ খুব ভীত হয়ে পড়েন এবং তারা ভাবতে লাগলেন, নিশ্চয়ই কোন বিশেষ খবর জানানোর মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। আমি আমার ডানে-বামে তাকালাম এবং দেখতে পেলাম যে, সবাই মুখ-মন্ডল ঢেকে কাঁদছেন। এক তর্কপ্রিয় ব্যক্তি যে তার পিতার পরিচয় জানতনা সে জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতা কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমার বাবা হচ্ছে হুজাফাহ। উমার (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ-মন্ডলে রাগান্বিত ভাব দেখতে পেলেন এবং দাঁড়িয়ে বললেন : আমরা এতেই খুশি যে, আল্লাহ আমাদের রাব্ব, ইসলাম আমাদের ধর্ম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের রাসূল। আমরা আল্লাহর কাছে সকল ধরণের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

‘এর পূর্বে আমি উত্তম এবং অধমকে একই সঙ্গে দেখিনি যা আজ অবলোকন করলাম। আমাকে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়েছে এবং আমি তা দেয়ালের ওপাশে দেখতে পেলাম।’ (তাবারী ১১/১০০) এ হাদীসটি সাঈদের (রহঃ) বরাতে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৭, মুসলিম ৪/১৮৩৪)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : কিছু লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাস্য-কৌতুক করে মাঝে মাঝে অহেতুক প্রশ্ন করত। যেমন একজন জিজ্ঞেস করল : আমার পিতা কে? অন্য একজন প্রশ্ন করল : আমার উটটি কোথায় রয়েছে, যে উটটি হারিয়ে গেছে? তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৩০)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী (রাঃ) বলেছেন : যখন নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয় :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

‘এবং আল্লাহর উদ্দেশে এই গৃহের হাজ্জ করা সেই সব মানুষের কর্তব্য যারা সফর করার আর্থিক সামর্থ্য রাখে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯৭) তখন লোকেরা জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ইহা কি প্রতি বছরের জন্য নির্ধারিত? কিন্তু তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেননা। তখন তারা আবার প্রশ্ন করল : ইহা কি প্রতি বছরের জন্য প্রযোজ্য? এবারও তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেননা। সুতরাং তারা আবার প্রশ্ন করল : ইহা কি প্রতি বছরের জন্য প্রযোজ্য? এবার তিনি বললেন : না, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম তাহলে ইহা তোমাদের জন্য ফার্য হয়ে যেত এবং ইহা যদি ফার্য হত তাহলে তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হতেনা। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইব্ন মাজাহ (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ১/১১৩, তিরমিযী ৩০৫৫, ইব্ন মাজাহ ২৮৮৪) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ এর ভাবার্থ হচ্ছে আমাদেরকে ঐ সব বিষয়ে প্রশ্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে যা আমরা জানিনা। কেননা আমরা যদি তা জানতে পারি তাহলে প্রশ্ন করার জন্য আমাদেরকে আফসোস করতে হবে। সুতরাং অহেতুক প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় যদি তোমরা এমন কিছু জিজ্ঞেস কর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আল্লাহ ওটা তোমাদের জন্য বর্ণনা করে দিবেন, তখন তোমরা কি করবে? আর ওটা আল্লাহর নিকট খুবই সহজ। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন عَفَا اللَّهُ عَنْهَا পূর্বে তোমাদের দ্বারা যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তা তিনি ক্ষমা করে দিবেন। কেননা আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু। কাজেই তোমরা নতুনভাবে কোন কিছু প্রশ্ন করনা। নতুবা ঐ প্রশ্নের উত্তরে তোমাদের উপর কাঠিন্য ও সংকীর্ণতা নেমে আসবে। আবার ওটা হবে নিজের হাতে বিপদ ডেকে আনা। হাদীসে এসেছে যে, মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার প্রশ্ন করার ফলে একটা হালাল জিনিস হারাম হয়ে গেছে। (বুখারী ৭২৮৯, মুসলিম ২৩৫৮) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘আমি যা বর্ণনা করিনি তা অবর্ণিত অবস্থায়ই থাকতে দাও। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতেরা অধিক প্রশ্ন করা ও তাদের নাবীগণের হুকুমের

ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।’ (মুসলিম ৪/১৮৩১) সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ যেগুলি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলি অতিক্রম করনা, কতগুলো জিনিস তিনি হারাম করেছেন, সেগুলো হালাল মনে করনা এবং তোমাদের উপর দয়াপরবশ হয়ে কতগুলো বিষয়ে ইচ্ছাপূর্বক তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন, সুতরাং সেসব বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন উত্থাপন করনা।’ (বুখারী ৪৬২৩, মুসলিম ২৮৫৬) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكَ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ নিষেধকৃত মাসআলাগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, তখন তাদেরকে জবাব দেয়া হলে তারা ওগুলির উপর ঈমান আনেনি, বরং প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে তারা কাফির হয়ে যায়। কারণ তারা হিদায়াত লাভের উদ্দেশে প্রশ্ন করেনি, বরং বিদ্রূপ ও হঠকারিতা করেই প্রশ্ন করেছিল। ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের মধ্যে ঘোষণা করেন : ‘হে আমার কাওম! তোমাদের উপর হাজ্জ ফার্য করা হয়েছে।’ তখন বানী আসাদ গোত্রের একটি লোক দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রত্যেক বছরেই কি (হাজ্জ করা ফার্য করা হয়েছে)। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীষণ রাগান্বিত হন এবং বলেন : ‘যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আমি যদি হ্যাঁ বলি তাহলে অবশ্যই তা (প্রতি বছরেই) ফার্য হয়ে যাবে। আর তা যদি (প্রত্যেক বছরের জন্যই) ওয়াজিব হয়ে যায় তাহলে তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হবেনা এবং কুফরী করবে। সুতরাং আমি তোমাদের জন্য যা বর্ণনা করা ছেড়ে দেই তা তোমরা ছেড়ে দাও। যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু করার আদেশ করি তোমরা তা পালন কর এবং যা করতে নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাক।’

১০৩। আল্লাহ না বাহীরাহর প্রচলন করেছেন, না সায়েবাহর; না ওয়াসীলার আর না হামীর; কিন্তু যারা কাফির তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ

১০৩. مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ نَّحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ

<p>করে, আর অধিকাংশই (ধর্ম) জ্ঞান রাখেনা।</p>	<p>وَلَيْكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ</p>
<p>১০৪। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানসমূহের দিকে এসো এবং রাসুলের দিকে’ তখন তারা বলে : আমাদের জন্য ওটাই যথেষ্ট যার উপর আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি; যদিও তাদের পূর্ব-পুরুষরা না কোন জ্ঞান রাখত, আর না হিদায়াত প্রাপ্ত ছিল। তবুও কি তারা তাই করবে?</p>	<p>۱۰۴. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ۖ أُولَٰئِكَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ</p>

‘বাহিরাহ’ ‘সায়েবাহ’ ‘ওয়াসিলাহ’ এবং ‘হামী’ কী

ইমাম বুখারী (রহঃ) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িবের (রহঃ) মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, ‘বাহীরা’ ঐ উষ্ট্রীকে বলা হত যার দুধ মানুষ দোহন করতনা এবং বলত যে, এটা প্রতিমার/মূর্তির নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। ওর দুধ কেহ পানও করতনা। ‘সায়েবাহ’ ঐ উষ্ট্রীকে বলা হত যাকে মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়া হত। না ওর উপর কোন বোঝা চাপানো হত, আর না ওকে সাওয়ারী রূপে ব্যবহার করা হত। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমি আমার ইব্ন আমীর আল খুযাআকে দেখেছি যে, তাকে পেটের ভরে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। সে’ই সর্বপ্রথম উষ্ট্রীকে ‘সায়েবাহ’ মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়ার প্রথা চালু করেছিল।’ (বাইহাকী ১০/১২) ‘ওয়াসিলাহ’ ঐ উষ্ট্রীকে বলা হত যা প্রথম এবং দ্বিতীয়বার দু’টো মাদী বাচ্চা প্রসব করত। ঐ ধরনের উষ্ট্রীকে মূর্তি/প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হত। আর ‘হামী’ ঐ উটকে বলা

হত যার গর্ভে নির্দিষ্ট কয়েকটা বাচ্চা জন্মালাভ করার পর ওর দ্বারা বোঝা বহনের কাজ করা হতনা এবং ওকে সাওয়ারী হিসাবেও ব্যবহার করা হতনা, বরং মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়া হত। আর ওর নাম তারা ‘হামী’ রাখত। (ফাতহুল বারী ৮/১৩৩, মুসলিম ৪/২১৯২, নাসাঈ ৬/৩৩৮)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম সায়েবাহর প্রথা চালু করেছিল এবং মূর্তি/প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হয়েছিল সে হচ্ছে আবু খুযাআ আমার ইব্ন আমীর। আমি তাকে পেটের ভরে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে দেখেছি।’ (আহমাদ ১/৪৪৬) হাদীসে বর্ণিত আমার ছিল লুহাই ইব্ন কামা’হর ছেলে। লুহাই ছিল খুযাআ’হ গোত্রের প্রধান, যাদের কাছে যুরহাম গোত্রের পর এবং কুরাইশ গোত্রের পূর্বে কা’বা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। সে ছিল হিজায় এলাকায় ইবরাহীমের (আঃ) ধর্মে (ইসলাম) প্রথম মূর্তি পূজার প্রবর্তনকারী। সে অজ্ঞ লোকদেরকে মূর্তি পূজার আহ্বান করত এবং মূর্তির নামে কুরবানী করার প্রচলন করে। আল্লাহ তা’আলা সূরা আন’আমে বলেন :

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا

আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে থাকে। (সূরা আন’আম, ৬ : ১৩৬)

‘বাহীরাহ’ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা ঐ উষ্ট্রী যে পাঁচবার বাচ্চা প্রসব করেছে। পঞ্চমবার সে নর বাচ্চা প্রসব করলে তারা তাকে যবাহ করত। অতঃপর পুরুষ লোকেরা ওর গোশ্‌ত আহার করত, কিন্তু স্ত্রীলোকদেরকে ওর গোশ্‌ত খেতে দেয়া হতনা। আর ওটা মাদী বাচ্চা প্রসব করলে তারা ওর কান কেটে নিত এবং বলত, ‘এটা হচ্ছে বাহীরাহ।’ (কেহ এর দুধ পান করতে পারবেনা) (তাবারী ১১/১২৯) সুদী (রহঃ) এবং অন্যান্যগণ প্রায় এরূপই বর্ণনা করেছেন। ‘সায়েবাহ’ সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ওটা ঐ প্রকারের ভেড়া যে প্রকারের সংজ্ঞা ‘বাহীরাহ’ সম্পর্কে দেয়া হয়েছে। পার্থক্য শুধু এই যে, যখন ওটা ছ’বার বাচ্চা প্রসব করত তখন পর্যন্ত ওর অবস্থা একই রূপ থাকত। অতঃপর ওটা যখন একটি নর ও একটি মাদী অথবা দু’টি নর বাচ্চা প্রসব করত তখন তারা ওকে যবাহ করত এবং পুরুষ লোকেরাই শুধু ওর গোশ্‌ত আহার করত, স্ত্রীলোকদেরকে উহা থেকে আহার করতে দেয়া হতনা। (তাবারী ১১/১২৮)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, ‘সায়েবাহ’ ঐ উষ্ট্রীকে বলা হত যে, যখন সে পর্যায়ক্রমে দশটি মাদী বাচ্চা প্রসব করত এবং এর মাঝে যদি কোন নর বাচ্চা প্রসব না করত তাহলে তাকে মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়া হত। তাকে সাওয়ারী রূপে ব্যবহার করা হতনা, তার লোম কাটা হতনা এবং তার দুধও দোহন করা হতনা। কিন্তু অতিথি এলে তাকে ঐ উষ্ট্রীর দুগ্ধ পান করানো যেত। ‘সায়েবাহ’ ঐ উষ্ট্রী বা ছাগল ইত্যাদিকে বলা হত যে, মানুষ যখন কোন কাজে বের হত এবং ঐ কাজ সমাধা হয়ে যেত তখন ঐ উষ্ট্রী কিংবা পশুকে ‘সায়েবাহ’ বানানো হত এবং মূর্তির নামে উৎসর্গ করা হত, ওর বাচ্চাগুলোকেও মূর্তির নামে উৎসর্গীকৃত মনে করা হত। সুদী (রহঃ) বলেন যে, কোন লোক যখন কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বের হত, কিংবা রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করত, অথবা তার সম্পদ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেত তখন সে নিজের কিছু সম্পদ মূর্তি/প্রতিমার নামে উৎসর্গ করত। এই সম্পদ বা পশু কেহ হস্তগত করতে চাইলে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হত।

‘ওয়াসীলাহ’ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা ছিল ঐ ভেড়ী, যে সাতবার বাচ্চা প্রসব করত এবং সপ্তমবারে সে মৃত নর কিংবা মাদী বাচ্চা প্রসব করলে ঐ বকরীর গোশত শুধু পুরুষেরাই খেতে পারত, স্ত্রীলোকেরা তা খেতে পারতনা। কিন্তু সপ্তমবারে ঐ ভেড়ীটি মাদী অথবা একটি নর ও একটি মাদী বাচ্চা প্রসব করলে ওদেরকে জীবিতাবস্থায় ছেড়ে দেয়া হত এবং তারা বলত : মাদীটি নরটিকেও ওয়াসীলাহ বানিয়ে দিয়েছে। এখন এটাও আমাদের জন্য হারাম। (ইব্ন আবী হাতিম ৪/১২২২) আবদুর রায্যাক (রহঃ) মা’মার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যুহরী (রহঃ) বলেছেন, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ) বলেছেন যে, ‘ওয়াসীলাহ’ হল ঐ উষ্ট্রী যে পর পর দু’টি মাদী বাচ্চা প্রসব করে। তারা ঐ ওয়াসীলাহ উষ্ট্রীর কান কেটে দিত এবং স্বাধীনভাবে চলাফিরা করার জন্য দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দিত। (আবদুর রায্যাক ১/১৯৬) ইমাম মালিক ইব্ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, যে ভেড়ী প্রতি বছর (পর পর পাঁচ বছর) দু’টি করে মোট দশটি ভেড়ী বাচ্চা প্রসব করে ঐ ভেড়ীকেও ওয়াসীলাহ বলা হত। ঐ ভেড়ীকেও স্বাধীনভাবে চলাফিরা করার জন্য দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেয়া হত। এর পর থেকে ঐ ভেড়ী যতগুলি নর অথবা মাদী বাচ্চা প্রসব করত তা পুরুষ লোকদেরকে দেয়া হত, মহিলাদেরকে দেয়া হতনা। কিন্তু উহা যদি মৃত বাচ্চা প্রসব করত তাহলে পুরুষ ও মহিলা উভয়েই তা থেকে আহার করত।

আল আওফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : যদি কারও উটের প্রজননের মাধ্যমে দশটি বাচ্চা ভূমিষ্ট হত তাহলে ঐ উটকে ‘হামী’ বলা হত। ওকে স্বাধীনভাবে চলাফিরা করার জন্য ছেড়ে দেয়া হত। (তাবারী ১১/১২৯) আবু রাওক (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : ‘হামী’ হল ঐ নর উট যার ঔরষজাত বাচ্চা ঐ উট অথবা ওর ঔরষজাত বাচ্চার মাধ্যমে গর্ভবতী হবে। কাফিরেরা বলত, ঐ উট ওর বংশধারা (হাম) অক্ষুন্ন রেখেছে। তারা এ ধরনের উটকে কোন বোঝা বহন করতে দিতনা, শরীরের পশম কাটতনা, যে কোন ভূমি থেকে সে খাবার খেতে পারত এবং যে কোন জলাশয় থেকে পানি পান করতে পারত, যদিও ঐ জলাশয়টি উটের মালিকের না’ও হত। (ইব্ন আবী হাতিম ৪/১২২৫) ইব্ন ওয়াহাব (রহঃ) বলেন, আমি মালিককে (রহঃ) বলতে শুনেছি : ‘হামী’ হল ঐ উট যাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রজননের জন্য বাছাই করা হত। যখন তা পূরণ করা হয়ে যায় তখন ঐ উটটিকে ময়ূরের পালক দ্বারা সাজিয়ে স্বাধীনভাবে চলাফিরা করার জন্য ছেড়ে দেয়া হত। এ আয়াত সম্পর্কে বিভিন্ন জনের আরও বিভিন্ন মন্তব্য রয়েছে।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবু ইসহাক আস সুবাই (রহঃ) হতে, তিনি আল আহওয়াস আল জাসামি (রহঃ) থেকে, তিনি তার পিতা মালিক ইব্ন নাদলাহ (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হই, তখন আমি পুরাতন কাপড় পরিধান করা অবস্থায় ছিলাম। তাই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কি কোন সম্পদ আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কি ধরনের? উত্তরে আমি বললাম : সব ধরনের যেমন উট, ঘোড়া, ভেড়া এবং দাস-দাসী। তিনি বললেন : আল্লাহ যদি তোমাকে সম্পদ দান করেন তাহলে তা তুমি নিজের উপর প্রকাশ কর। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার উটনী যে বাচ্চা প্রসব করে তার কি সম্পূর্ণ কান রয়েছে? আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি ঐ সব বাচ্চাদের কোন কোনটির কান এই বলে কেটে ফেল যে, এটিই হল ‘বাহিরাহ’, আবার কোন কোনটির কান ছিড়ে ফেল এবং বল এটি হল পূর্ণ প্রাপ্ত।’ আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : এরূপ করনা, কারণ আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দান করেছেন তা শুধু তোমারই ব্যবহারের জন্য (কারও নামে উৎসর্গ করার জন্য নয়)। অতঃপর তিনি আরও বললেন : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ‘বাহিরাহ’ ‘সায়েবাহ’ ‘ওয়াসিলাহ’, ‘হাম’ ইত্যাদি নামে কোন কিছু নির্দিষ্ট করার জন্য বলেননি।

‘বাহিরাহ’ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ঐ পশুর পশম, চুল কিংবা দুধ ওর মালিকের স্ত্রী, কন্যা অথবা গৃহের অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবেনা। কিন্তু ওর মৃত্যুর পর ওর থেকে তারা অংশ নিতে পারবে। ‘সায়েবাহ’ এর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, ঐ পশু তাদের দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেয়া হত এবং নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত দেব-দেবীর বেদীর সামনে ঘোষণা করা হত। যাদেরকে ‘ওয়াসিলাহ’ বলা হত অর্থাৎ যে সমস্ত ভেড়া ছয়বার বাচ্চা প্রসব করত, অতঃপর সপ্তম বার বাচ্চা প্রসব করার পর ওদের কান এবং শিং কেটে ফেলা হত এই বলে যে, এগুলি ‘ওয়াসিলাত’ পূর্ণ করেছে। ওগুলিকে তারা যবাহ করতনা, প্রহার করতনা, অথবা কারও জলাশয়ে গিয়ে পানি পান করলেও বাঁধা দিতনা। (ইব্ন আবী হাতিম ৪/১২২০) অন্য এক বর্ণনায় আবু ইসহাক (রহঃ) আবুল আহওয়াস (রহঃ) হতে বলেন যে, আউফ ইব্ন মালিক (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার সময় নিজের মত করে বর্ণনা করেন (অর্থাৎ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হুবহু শব্দ ব্যবহার না করে) এবং ঐ বর্ণনাটিও নির্ভুল। ইমাম আহমাদও (রহঃ) এ হাদীসটি সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা (রহঃ) হতে, তিনি আবুজ জারা আমর ইব্ন আমর (রহঃ) হতে, তিনি তার চাচা আবুল আহওয়াস আউফ ইব্ন মালিক ইব্ন নাদলাহ (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা মালিক ইব্ন নাদলাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৪/১৩৬) ঐ বর্ণনায় ‘বাহিরাহ, হাম’ ইত্যাদি বিষয়ে উপরোল্লিখিত হাদীসের মত বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা‘আলা এসব বিষয়ে ভাল জানেন। এ আয়াতের তাফসীরে এগুলো ছাড়া অন্য কিছুও বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহর **وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ** এ কথার ভাবার্থ এই যে, কাফিরেরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে থাকে। আল্লাহ এগুলোকে শারীয়াতের কাজ রূপে নির্ধারণ করেননি এবং এগুলো তাঁর নৈকট্য লাভের উপায়ও নয়। বরং মূর্তি পূজক কাফিরেরাই ওকে পুণ্যের কাজ এবং ইবাদাতের পদ্ধতি হিসাবে আবিষ্কার করে নিয়েছে যা তারা আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভের উপায় হিসাবে মনে করেছে। কিন্তু ওরা কখনই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়নি এবং হবেওনা। বরং এই বিদ‘আতী আমল তাদের আযাবের কারণ হবে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহর অহীর দিকে ও

তাঁর রাসূলের দিকে এসো এবং আল্লাহ যা নিষেধ করছেন তা থেকে বিরত থাক তখন তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতি নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছি, এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا তারা কি এটা বুঝেনা যে, তাদের পূর্বপুরুষরাও বাতিল ও মিথ্যা রীতিনীতির উপর থাকতে পারে? তারাও হক ও সত্য থেকে দূরে ও হিদায়াত থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে? সুতরাং কিরূপে তোমরা তাদের অনুসরণ করতে পার? সত্য ব্যাপার এটাই যে, একমাত্র ভ্রান্ত ও মূর্খ লোকেরাই এরূপ মন্তব্য করতে পারে।

১০৫। হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের (সংশোধন করার) জন্য চিন্তা কর, যখন তোমরা দীনের পথে চলছ তখন কেহ পথভ্রষ্ট হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই; তোমরা সবাই আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তিত হবে, অতঃপর তোমরা যা কিছু করছিলে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

۱۰۵. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسُكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

নিজ স্বার্থে বান্দার নিজেকেই চেষ্টা করতে হবে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন নিজেদেরকে সংশোধন করে এবং সংকাজ সম্পাদনে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। আর তিনি তাদেরকে এ সংবাদও দিচ্ছেন যে, যারা নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তাদের আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যরা ঝগড়া ফাসাদে লিপ্ত হলেও তাদের কোনই ক্ষতি হবেনা। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, কায়স (রহঃ) বললেন : আবু বাকর (রাঃ) একদা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন : তোমরা এ আয়াতটি পাঠ করছ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا

عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلٍّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ অথচ তোমরা এর ভুল অর্থ করছ। আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি :

‘মানুষ যখন কোন পাপের কাজ সংঘটিত হতে দেখে, অথচ ওটি পরিবর্তন করার চেষ্টা করেনা তখন মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ তা‘আলা সবাইকে সেই কারণে শাস্তি দিবেন।’ আমি (কায়স রহঃ) আবু বাকরকে (রাঃ) বলতে শুনেছি : হে লোক সকল! মিথ্যা কখন থেকে সাবধান! কারণ মিথ্যা বলা হল ঈমানের বিপরীত। (আহমাদ ১/৫)

১০৬। হে মু‘মিনগণ! যখন তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু আসন্ন হয় তখন অসীয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু’জন লোক সাক্ষী থাকা সঙ্গত। এই দু’ব্যক্তি হবে দীনদার এবং তোমাদের মধ্য হতে; অথবা ভিন্ন সম্প্রদায় হতে দু’জন হবে, যদি তোমরা সফরে থাক এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যু তোমাদের উপর উপস্থিত হয়; যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে ওসীদ্বয়কে সালাতের (জামা‘আতের) পর রুখে নাও, অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমরা এই শপথের বিনিময়ে কোন স্বার্থ ভোগ করবনা যদি আত্মীয়ও হয়; আর আল্লাহর সাক্ষ্যকে প্রমাণকে আমরা গোপন

۱۰۶. يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
شَهِدَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ
أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
اَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ
ءَاخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتُمْ
مُصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا
مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسِمَانِ
بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ
ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا

করবনা, (যদি এরূপ করি তাহলে) এমতাবস্থায় আমরা ভীষণ পাপী হব।

نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ
الْأَثِمِينَ

১০৭। অতঃপর যদি জানা যায় যে, ওসীদ্বয় কোন পাপে জড়িত হয়ে পড়েছিল তাদের মধ্য হতে (মৃতের) সর্বাপেক্ষা নিকটতম অপর দু'ব্যক্তি তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে, অতঃপর উভয়ে (এরূপে) আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে : নিশ্চয়ই আমাদের এই শপথ তাদের শপথ অপেক্ষা অধিক সত্য এবং আমরা বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করিনি, (যদি করি তাহলে) এমতাবস্থায় যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব।

১০৭. فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَثَمَهُمَا
أَسْتَحَقَّ إِنَّمَا فَعَاخِرَانِ
يُقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ
أَسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَايَيْنِ
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهِدْتُنَا
أَحَقُّ مِنْ شَهِدَتِيهِمَا وَمَا
أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

১০৮। এটাই এ বিষয়ে অতীব সহজ পস্থা যে, তারা ঘটনা যথাযথভাবে প্রকাশ করে দিবে, অথবা এই ভয় করবে যে, তাদের শপথ গ্রহণ করার পর (পুনঃ) শপথ করানো হবে; আল্লাহকে ভয় কর এবং (বিধানসমূহ) শ্রবণ কর, আর আল্লাহ ফাসিকদেরকে

১০৮. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا
بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ
يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ
أَيْمَانِهِمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۚ

পথ দেখাবেননা ।

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

অসীয়াতের জন্য দু'জন ন্যায় পরায়ণ সাক্ষী থাকতে হবে

আলোচ্য আয়াতটিতে আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আদেশ করেন। তিনি বলেন **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ** অর্থাৎ এ বিষয়ে দু'জন সাক্ষী রাখতে হবে, যারা হবে ন্যায় পরায়ণ ও মুসলিম। **أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ** এর ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) অর্থ করেছেন, তারা হল আহলে কিতাবধারী অমুসলিম। (ইব্ন আবী হাতিম ১২/১২২৯)

ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ এর ভাবার্থ হচ্ছে, যখন তোমরা সফরে থাকবে এবং ঐ অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যাবে তখন তোমরা মুসলিমদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখবে। আর মুসলিম পাওয়া না গেলে অমুসলিম হলেও চলবে। এখানে এ কথা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, সফরে অসীয়াতের সময় মুসলিম বিদ্যমান না থাকলে যিম্মীদেরকে সাক্ষী বানানো যেতে পারে। শারিহ্ (রহঃ) বলেন যে, সফর ও অসীয়াতের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় ইয়াহুদী ও নাসারাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবেনা। সেই ক্ষেত্রেও অসীয়াতের বর্ণনা দেয়ার সময় সাক্ষী হিসাবে সে থাকতে পারে। (তাবারী ১১/১৬৩, ১৬৪) অতঃপর বলা হয়েছে :

تَخْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ তোমরা ঐ দু'জনকে সালাতের পর থামতে বল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আসর সালাত বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১১/১৭২) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীনও (রহঃ) অনুরূপ বিবরণ পেশ করেছেন। ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে জামা'আতে সালাত আদায় করার পর দু'জন মুসলিমকে থামাতে হবে। (তাবারী ১১/১৭৪) ভাবার্থ এই যে, এ দু'জন সাক্ষী জামা'আতের সালাতের পর একত্রিত হবে যাতে বেশি লোকের সমাবেশে এ সাক্ষ্যদান কার্য সম্পন্ন হতে পারে। সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্যদানের সময় আল্লাহর নামে শপথ করবে। যদি তোমাদের সন্দেহ হয় যে, সাক্ষীদ্বয় ভুল বর্ণনা দিবে বা খিয়ানাত করবে তাহলে ঐ সাক্ষীদ্বয়কে সেই সময় আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে হবে : আমরা মিথ্যা শপথের বিনিময়ে এই নশ্বর জগতের সামান্য অর্থ

উপার্জন করবনা, যদিও আমাদের এ শপথের কারণে আমাদের নিকট আত্মীয়েরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। **وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ** অর্থাৎ আমরা আল্লাহর (আদিষ্ট) সাক্ষ্যকে গোপন করবনা। সাক্ষ্যদান কাজের গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই সাক্ষ্যের সম্বন্ধ আল্লাহর সঙ্গে লাগানো হয়েছে।

বলা হয়েছে : **إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الْآثِمِينَ** যদি আমরা সাক্ষ্য কোন প্রকার পরিবর্তন করি অথবা সম্পূর্ণরূপে তা গোপন করি তাহলে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

এরপর বলা হয়েছে : **فَإِنْ عَشَرَ عَلَىٰ أَتَّهَمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا** যদি ঐ দু'জন সাক্ষী ও ওসীর ব্যাপারে এটা প্রমাণিত হয় যে, তারা খিয়ানাত করেছে এবং মৃত ব্যক্তির সম্পদ উত্তরাধিকারীদের নিকট পৌঁছাতে গিয়ে কিছু আত্মসাৎ করেছে তাহলে যাদের প্রাপ্য নষ্ট হয়েছে তাদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী পূর্ববর্তী স্বাক্ষীদ্বয়ের স্থানে দাঁড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ যখন সঠিক সংবাদ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, পূর্ববর্তী দু'জন সাক্ষী খিয়ানাত করেছে, তাহলে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্য হতে দু'জন অতি নিকটবর্তী উত্তরাধিকারী আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে : 'আমাদের সাক্ষ্য তাদের (পূর্ববর্তী সাক্ষীদ্বয়ের) সাক্ষ্যের তুলনায় বিশুদ্ধতর। তারা দু'জন বাস্তবিকই খিয়ানাত করেছে এবং এ দোষারোপ করায় আমরা মোটেই বাড়াবাড়ি করছি। যদি আমরা মিথ্যা অপবাদ দেই তাহলে অবশ্যই আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।' এটা যেন উত্তরাধিকারীদের পক্ষ হতে শপথ। যেমন হত্যাকারীদের পক্ষ হতে বেঈমানী সাব্যস্ত হলে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা শপথ করে থাকে। এটা আহকামের বাবুল কাসামাতে স্থিরীকৃত হয়েছে। বলা হয়েছে :

ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا এটা এমন এক পছন্দ যে, এতে ২ জিম্মী ঘটনা অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং তাদের এ ভয় থাকবে যে, যদি তারা ঘটনা অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদান না করে তাহলে মুসলিমদের সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের শপথকে বাতিল করে দেয়া হবে

أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ এতে বিশ্বাসের কিছুই নেই যে, তারা আল্লাহর শপথের সম্মানার্থে এবং অপদস্ত হওয়ার ভয়ে (যে মৃতের ওয়ারিসরা তাদের কসমের মাধ্যমে তাদের শপথকে রদ করে দিবে এবং তাদেরকে শাস্তিও প্রদান করা হবে) তারা সত্য কথাই বলবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَاتَّقُوا اللَّهَ** তোমরা তোমাদের সমস্ত কাজে আল্লাহকে ভয় কর এবং **وَاسْمَعُوا** তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে চল ।

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ যারা আল্লাহর আনুগত্য ও শারীয়াতের অনুসরণ হতে বেরিয়ে যায় তিনি তাদেরকে সুপথ লাভের তাওফীক দেননা ।

১০৯। যে দিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলদেরকে সমবেত করবেন, অতঃপর বলবেন : তোমরা (উম্মাতদের নিকট থেকে) কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে : (তাদের অন্তরের কথা) আমাদের কিছুই জানা নেই; নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত গোপনীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাত ।

১০৯. **يَوْمَ تَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ**
فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ^ط **قَالُوا**
لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ
الْغُيُوبِ

নাবী-রাসূলগণ তাঁদের উম্মাতদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন

নাবী রাসূলদেরকে যেসব কাওমের নিকট পাঠানো হয়েছিল তারা তাঁদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিল কি দেয়নি সে সম্পর্কে আল্লাহ তাদেরকে কিয়ামাতের দিন কিভাবে সম্বোধন করবেন তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে । যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেছেন :

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ

অতঃপর আমি (কিয়ামাত দিবসে) যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলদেরকেও অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব । (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৬) অন্যত্র তিনি বলেন :

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

সুতরাং তোমার রবের শপথ! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই, সেই বিষয়ে, যা তারা করে । (সূরা হিজর, ১৫ : ৯২-৯৩) রাসূলগণ উত্তরে বলবেন :

لَا عِلْمَ لَنَا ‘আমাদের কিছুই জানা নেই।’ মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, সেদিনের ভয়াবহ অবস্থা দেখেই তাঁদের এ উত্তর হবে। (তাবারী ১১/২১০) তাঁরা সেদিন ভীত-সম্ব্রস্ত হবেন বলেই তাঁদের মুখ দিয়ে কোন উত্তর বের হবেনা। বরং বলে ফেলবেন, ‘আমাদের কিছুই জানা নেই।’ অতঃপর যখন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন, তখন নিজের কাওম সম্পর্কে সঠিক সাক্ষ্য প্রদান করবেন। কিন্তু তাদের প্রথম উক্তি এরূপই হবে : ‘হে আল্লাহ! আমরা তো এ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবনা। আপনি তো আলিমুল গায়িব। আপনার মুকাবিলায় আমাদের কি জ্ঞান থাকতে পারে?’ এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, সম্মানিত জনের নিকট এটা অতি উত্তম জবাবই বটে— ‘আপনার ব্যাপক জ্ঞানের কাছে আমাদের জ্ঞান অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে শুধুমাত্র বাহ্যিকের উপর। পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞান আভ্যন্তরীণ সংবাদও রাখে। কেননা আপনি হচ্ছেন **عَلَامُ الْغُيُوبِ** বা অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। সুতরাং আমাদের উম্মাতবর্গ কি জবাব দিয়েছিল তা আপনি ভাল জানেন। কে যে কপটতামূলক আমল করেছে এবং কে বিশ্বাসমূলক কাজ করেছে এই জ্ঞান তো আমাদের নেই, বরং আপনারই আছে।’

১১০। যখন আল্লাহ বলবেন :
হে ঈসা ইবনে মারইয়াম!
আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর যা
তোমার উপর ও তোমার
মাতার উপর (প্রদত্ত) হয়েছে।
যখন আমি তোমাকে রুহুল
কুদুস দ্বারা সাহায্য করেছি,
(এবং) তুমি মানুষের সাথে
কথা বলেছ (মাতার) কোলে
এবং পৌঁচ বয়সেও; আর যখন
আমি তোমাকে কিতাবসমূহ,
প্রগাঢ় জ্ঞান এবং তাওরাত ও
ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন

১১০. إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ
مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ
وَعَلَىٰ وَاٰلِكَ اِذْ اٰتٰتُكَ
بِرُوحِ الْقُدُسِ تَكْلِمُ النَّاسِ
فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَاِذْ
عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

তুমি আমার আদেশে মাটি দ্বারা
পাখীর আকৃতি সদৃশ এক
আকৃতি প্রস্তুত করেছিলে,
অতঃপর তুমি ওতে ফুৎকার
দিলে, যার ফলে ওটা আমার
আদেশে পাখী হয়ে যেত, আর
তুমি আমার আদেশে জন্মান্ন ও
কুষ্ঠ রোগী নিরাময় করে দিতে
আর যখন তুমি আমার
আদেশে মৃতদেরকে বের করে
দাঁড় করাতে, আর যখন আমি
বানী ইসরাঈলকে (তোমাকে
হত্যা করা হতে) নিবৃত্ত রেখেছি
যখন তুমি তাদের কাছে (স্বীয়
নাবুওয়াতের) প্রমাণাদি নিয়ে
হাজির হয়েছিলে, অতঃপর
তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল
তারা বলেছিল : এটা
(মু'জিসাসমূহ) স্পষ্ট যাদু ছাড়া
আর কিছুই নয়।

وَالْتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ
مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي
فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا
بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ
وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ
الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ
بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ
جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ
مُبِينٌ

১১১। আর যখন আমি
হাওয়ারীদেরকে আদেশ
করলাম : আমার প্রতি এবং
আমার রাসূলের প্রতি ঈমান
আন, তারা বলল : আমরা
ঈমান আনলাম এবং আপনি
সাক্ষী থাকুন যে, আমরা পূর্ণ
অনুগত।

১১১. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى
الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي
وَبِرِسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا وَآشْهَدُ
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

আল্লাহর অনুগ্রহের কথা ঈসাকে (আঃ)

স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে

এখানে আল্লাহ তা‘আলা ঐ সমুদয় মু‘জিযারূপ নি‘আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন, যেগুলি ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ) উপর তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন। তিনি ঈসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেনঃ

اِذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ হে ঈসা! আমি যে নি‘আমাতসমূহ তোমাকে প্রদান করেছি সেগুলি তুমি স্মরণ কর। আমি তোমাকে পিতা ব্যতীতই সৃষ্টি করেছি এবং তোমার সন্তকে আমার ক্ষমতার পরিপূর্ণতার একটা নিদর্শন করেছি। আর তোমার মায়ের উপরও ইহসান করেছি এভাবে যে, তোমাকে তার পবিত্রতার দলীল বানিয়েছি এবং মূর্থ ও অত্যাচারী লোকেরা তার উপর যে নির্লজ্জতার অপবাদ দিয়েছিল তা থেকে তাকে রক্ষা করেছি। তোমাকে আমি রুহুল কুদুস অর্থাৎ জিবরাঈলের (আঃ) মাধ্যমে সাহায্য করেছি। আমি তোমাকে তোমার শৈশবে ও যৌবনে এমনিভাবে নাবী ও আল্লাহর পথে আহ্বানকারী বানিয়েছি যে, تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا তুমি দোলনা থেকেই কথা বলতে শুরু করেছ এবং তোমার মায়ের পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেছ, আর আমার ইবাদাত করে নিজেকে আল্লাহর দাস বলে স্বীকার করে নিয়েছ। শৈশব ও যৌবনেও মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছ। পৌড় বয়সে কথা বলা বিস্ময়কর নয় বটে, কিন্তু দোলনা থেকে কথা বলা কতইনা বিস্ময়কর ব্যাপার। আল্লাহ সুবহানাল্ ওয়া তা‘আলা তোমাকে কিতাবের তা‘লীম দিয়েছেন এবং মূসার উপর অবতারিত তাওরাতের লিখা-পড়া শিক্ষা দিয়েছেন। বলা হয়েছে :

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ يَأْذَنِي অর্থাৎ তুমি আমার আদেশে মাটি দ্বারা পাখীর আকৃতি সদৃশ একটি আকৃতি তৈরী করতে এবং ফুৎকার দিতে। তখন তা আমারই আদেশে জীবিত পাখী হয়ে উড়তে শুরু করত।

সূরা আলে ইমরানে الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ আয়াতের উপর আলোচনা হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। অতঃপর বলা হয়েছে :

وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ يَأْذَنِي তুমি মৃতদেরকে ডাকতে, তখন তারা আল্লাহর হুকুমে জীবিত হয়ে কবর হতে বেরিয়ে আসত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

هَـٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ হে ঈসা! আমার ঐ নি‘আমাতের কথা স্মরণ কর যে, যখন তুমি বানী ইসরাঈলের নিকট নাবুওয়াতের দলীলসহ পৌঁছলে এবং তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, তোমার উপর অপবাদ দিল, তোমাকে যাদুকার বলল এবং তোমাকে হত্যা করার ও শূলে দেয়ার চেষ্টা করল, তখন আমি তোমাকে তাদের থেকে বাঁচিয়ে নিলাম, এরপর তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নিলাম। এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, ঈসার (আঃ) উপর আল্লাহর এ অনুগ্রহ তাঁকে তাঁর নিকট উঠিয়ে নেয়ার পরের ঘটনা, কিংবা এটা কিয়ামাতের দিন সংঘটিত হবে। কিন্তু ভবিষ্যতকালকে অতীত কালের রূপ দ্বারা তা‘বীর করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা‘আলার কাছে অতীত কালের ন্যায় ভবিষ্যত কালও নিশ্চিতরূপে অনুষ্ঠিতব্য। এসব হচ্ছে অদৃশ্যের ঘটনা, যেগুলি সম্পর্কে মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেছেন।

وَإِذْ أُوحِيَ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي এটাও ঈসার (আঃ)

প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার একটা অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর জন্য সঙ্গী-সাথী ও সাহায্যকারী ঠিক করে দিয়েছেন। এখানে অহীর অর্থ হচ্ছে অন্তরের মধ্যে কিছু ভরে দেয়া। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ

আমি মূসার মায়ের অন্তরে ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম : শিশুটিকে তুমি স্তন্য দান করতে থাক (সূরা কাসাস, ২৮ : ৭) এরূপ ইলহামকে সর্বসম্মতভাবে অহী বলা হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا

يَعْرِشُونَ

তোমার রাব্ব মৌমাছির অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন : তুমি গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়, বৃক্ষ এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। (সূরা নাহল, ১৬ : ৬৮) এভাবে হাওয়ারীদের উপর আল্লাহ ইলহাম করেছিলেন, তখন তারা ইলহামকৃত হুকুম মান্য করেছিল। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, মহামহিমাবিত আল্লাহ তাদের উপর ইলহাম করেছিলেন। সুদী (রহঃ) বলেন যে, তিনি তাদের অন্তরে ওটা নিষ্ক্ষেপ করেছিলেন। এর ভাবার্থ এও হতে পারে

ঃ আমি তোমার মাধ্যমে তাদের কাছে অহী করেছিলাম এবং তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছিলাম। তখন তারা তা কবুল করে নিয়েছিল এবং বলেছিল :

آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (হে ঈসা!) আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে গেলাম।

১১২। যখন হাওয়ারীরা বলল : হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আপনার রাক্ব কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্য আকাশ হতে কিছু খাদ্য প্রেরণ করেন? ঈসা বলল : আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

۱۱۲. إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

১১৩। তারা বলল : আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তা থেকে আহ্বার করি এবং আমাদের অন্তর সম্পূর্ণ প্রশান্ত হয়ে যায়, আর আমাদের এই বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয় যে, আপনি আমাদের নিকট সত্য বলেছেন এবং আমরা এর প্রতি সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

۱۱۳. قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْبِخَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ

১১৪। ঈসা ইবনে মারইয়াম দু'আ করল : হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি আকাশ হতে খাদ্য অবতীর্ণ করুন যেন ওটা

۱۱۴. قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اٰللهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً

আমাদের, অগ্র ও পশ্চাতবর্তীদের জন্য একটি আনন্দের বিষয় হয় এবং আপনার পক্ষ হতে এক নিদর্শন হয়ে থাকে। আর আমাদেরকে রিয়ক প্রদান করুন, বস্তুতঃ আপনি তো সর্বোত্তম জীবিকা প্রদানকারী।

مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا
لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ
وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

১১৫। আল্লাহ বললেন : আমি এই খাদ্য তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করব, অনন্তর তোমাদের মধ্য হতে যে এরপর অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দিব যে, বিশ্ববাসীদের মধ্যে ঐ শাস্তি আর কেহকেও দিবনা।

۱۱۵. قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا
عَلَيْكُمْ ۖ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ
مِّنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا
أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ

মায়িদাহ' প্রেরণের বর্ণনা

এখানে 'মায়িদাহ' বা খাবারের খাঞ্চগর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এ জন্যই এ সূরার নাম 'মায়িদাহ' রাখা হয়েছে। এখানেও আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল ঈসার (আঃ) উপর তাঁর ইহসানের কথা প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ তিনি খাবারের খাঞ্চগ অবতরণের জন্য দু'আ করেছিলেন, সেই দু'আ মহান আল্লাহ কবুল করেছিলেন। এটাও ছিল ঈসার (আঃ) একটা মু'জিযা এবং তাঁর নাবুওয়াতের অকাটি প্রমাণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি :

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ
عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ যখন ঈসার (আঃ) অনুসারী হাওয়ারীরা বলেছিল, 'হে
ঈসা (আঃ)! আপনার প্রভু কি আমাদের উপর আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চগ
অবতীর্ণ করতে পারেন?' খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চগকে বলা হয়। কেহ কেহ বলেছেন
যে, ঈসার (আঃ) সঙ্গীরা তাদের অভাব ও দারিদ্র্যের তাড়নায় এ কথা বলেছিল
যে, আল্লাহ তা'আলা যেন প্রত্যহ তাদের উপর আকাশ থেকে খানাত্তি খাঞ্চগ

অবতীর্ণ করেন, যা খেয়ে তারা ইবাদাতের শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। তখন ঈসা (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন :

قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ তোমরা যদি প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাক

তাহলে আল্লাহকে ভয় কর এবং এরূপ প্রার্থনা করা থেকে বিরত হও। আহায চাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর ভরসা কর। হতে পারে যে, এ জিনিসই তোমাদের জন্য ফিতনা ফাসাদের কারণ হয়ে যাবে। তাঁর এ কথা শুনে হাওয়ারীরা বলেছিল, 'আমরা মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছি। আমাদের খাওয়ার প্রয়োজন। আর আমরা যখন আকাশ হতে অবতারণিত খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা দেখতে পাব তখন আমাদের মনে পূর্ণ প্রশান্তি নেমে আসবে। ফলে আপনার প্রতি আমাদের ঈমান দৃঢ় হবে এবং আপনি যে আল্লাহর রাসূল এ ব্যাপারে আমাদের আর কোন সন্দেহই থাকবেনা। আর আমরা নিজেরাই সাক্ষী হয়ে যাব যে, এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে একটি বড় নিদর্শন এবং আপনার নাবুওয়াত ও সত্যতার স্পষ্ট দলীল।' তখন ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানালেন :

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا

'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আকাশ হতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন! যেন ওটা আমাদের জন্য অর্থাৎ যারা বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে এবং যারা পরে আসবে, সকলের জন্যই আনন্দের বিষয় হয়।' সুদী (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'যেদিন ওটা অবতীর্ণ হবে সে দিনকে আমরা খুশির দিন হিসাবে মর্যাদা দিব এবং আমাদের পরবর্তী লোকেরাও ঐ দিনকে সম্মানিত দিন মনে করবে।' (তাবারী ১১/২২৫) সুফইয়ান শাওরী (রহঃ) বলেন যে, تَكُونُ لَنَا عِيدًا এর

ভাবার্থ হচ্ছে, 'আমরা ঐ দিন সালাত আদায় করব।' (তাবারী ১১/২২৫) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'আমাদের পরবর্তীদের জন্য এ দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন যে, এ কথা দ্বারা ঈসা (আঃ) বুঝাতে চেয়েছিলেন, 'যেন ওটা আমাদের সবারই জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে যায় এবং রিসালাতের সত্যতার জন্য সুস্পষ্ট দলীল হতে পারে। আর হে আল্লাহ! যেন ওটা আপনার পূর্ণ ক্ষমতার এবং আমার প্রার্থনা কবূল হওয়ার দলীল হিসাবে প্রকাশ পায়, যাতে জনগণ আমার রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করে নিতে পারে।' (তাবারী ১১/২২৫)

وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ হতে আমাদের নিকট আমাদের কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়াই উত্তম খাদ্য প্রেরণ করুন, যেহেতু আপনি হচ্ছেন সর্বোত্তম আহাৰ্য প্রদানকারী। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ

ঠিক আছে, আমি তোমাদের কাছে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চ প্রেরণ করছি। কিন্তু সাবধান! এর পরও যদি তোমার কাওম কুফরী করে এবং অবাধ্যই থেকে যায় তাহলে আমি তাদেরকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তির স্বাদ বিশ্ববাসীর কেহই কখনও গ্রহণ করেনি বা করবেওনা। মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

এবং যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে : ফির'আউন সম্প্রদায়কে নিষ্ক্ষেপ কর কঠিনতম শাস্তিতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৪৬) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

إِنَّ الْأَتِّفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে। (সূরা নিসা, ৪ : ১৪৫) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেছেন, 'কিয়ামাতের দিন তিন প্রকারের লোককে কঠিনতম শাস্তি প্রদান করা হবে। (১) মুনাফিক, (২) খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চ অবতীর্ণ হওয়ার পরও যারা কুফরী করেছিল এবং (৩) ফির'আউনের দলবল।' (তাবারী ১১/২৩৩)

হাওয়ারীদের উপর খাঞ্চ অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলি উল্লেখ করা হল :

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : তারা মারইয়াম পুত্র ঈসাকে (আঃ) বলল : আপনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন তিনি যেন আকাশ হতে আমাদের জন্য খাঞ্চ ভর্তি খাবার প্রেরণ করেন। তিনি তাই করলেন। ফলে মালাকগণ একটি খাঞ্চায় ৭টি মাছ এবং ৭টি রুটি তাদের জন্য নিয়ে আসেন। ঐ খাদ্য থেকে সর্বশেষ দলটিও এমন পরিপূর্ণভাবে আহাৰ্য করল যেমনভাবে প্রথম দলটি আহাৰ্য করেছিল। (তাবারী ৫/১৩২, ইব্ন আবী হাতিম ৪/১২৪৬)

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন যে, খাশ্বা ভর্তি যে খাদ্য মারইয়াম তনয় ঈসাকে (আঃ) পাঠানো হয়েছিল তাতে ছিল ৭টি রুটি ও ৭টি মাছ। তা থেকে তারা যার যতটুকু খাওয়ার ইচ্ছা ছিল তা খেয়েছিল। কিন্তু যখন ঐ খাদ্য থেকে কেহ কিছু চুরি করে নেয় এই মনে করে, 'এ খাদ্য হয়ত আগামী কাল পাওয়া যাবেনা' তখন খাশ্বাটি উপরে উঠিয়ে নেয়া হয়। (তাবারী ৫/১৩৪)

১১৬। আর যখন আল্লাহ বললেন : হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে : তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে মা'বুদ নির্ধারণ করে নাও? ঈসা নিবেদন করবে : আপনি পবিত্র আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; আপনি তো আমার অন্তরে যা আছে জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানিনা; সমস্ত গাইবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত।

۱۱۶. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيۡ أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِيۡ بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۖ تَعْلَمُ مَا فِيۡ نَفْسِيۡ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِيۡ نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّٰمُ الْغُيُوبِ

১১৭। আমি তাদেরকে উহা ব্যতীত কিছুই বলিনি যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, যিনি আমার রাক্ব এবং

۱۱۷. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِيۡ بِهِۦٓ أَنۢ أَعْبُدُوا۟ اللَّهَ رَبِّيۡ

<p>তোমাদেরও রাব্ব; আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, অতঃপর আপনি যখন আমাকে তুলে নিলেন তখন তো আপনিই ছিলেন তাদের রক্ষক, বস্তুতঃ আপনিই সর্ব বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন।</p>	<p>وَرَبِّكُمْ ؕ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ؕ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ؕ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ</p>
<p>১১৮। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে ওরা তো আপনার বান্দা; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলে তো আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।</p>	<p>১১৮. إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ؕ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ</p>

ঈসা (আঃ) শিরুক বর্জনকারী এবং তাওহীদ পন্থী ছিলেন

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলা ঈসাকে (আঃ) এই কথাগুলি এসব লোকের সামনে সম্বোধন করে বলবেন যারা তাঁকে ও তাঁর মাকে মা’বুদ বানিয়ে নিয়েছিল।

يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ

‘হে ঈসা ইব্ন মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে : তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাকে মা’বুদ নির্ধারণ করে নাও?’ এ কথাগুলির মাধ্যমে মহান আল্লাহ খৃষ্টানদেরকে তিরস্কার করেছেন ও ভয় প্রদর্শন করেছেন। কাতাদাহ (রহঃ) ও অন্যান্যগণ এরূপই বলেছেন। কাতাদাহ (রহঃ) এর উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার

هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ (এটা ঐ দিন যেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদীতার পুরস্কার দেয়া হবে) (৫ : ১১৯) এ উক্তিটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ এর জবাবে ঈসাকে (আঃ) উত্তম ভদ্রতার কতইনা তাওফীক দান করা হবে এবং তাঁর অন্তরে কতইনা

সুন্দর দলীল ভরে দেয়া হবে! তিনি বলবেন, হে আল্লাহ! যে কথা বলার আমার কোন অধিকার নেই সে কথা আমি কিরূপে বলতে পারি? (ইব্ন আবী হাতিম ৪/১২৫৩) যদি আমি এ কথা বলেও থাকি তাহলে অবশ্যই সেটা আপনি ভাল রূপেই জানেন। কেননা আপনার কাছে তো কোন কিছুই গোপন থাকেনা। আপনি আমার অন্তরের কথা অবগত আছেন, কিন্তু আমি আপনার ইচ্ছা সম্পর্কে মোটেই অবগত নই। আপনি আমাকে যা নির্দেশ দিয়েছিলেন আমি তার একটি অক্ষরও বেশি করিনি। আমি তো শুধু এ কথাই বলেছিলাম **أَنْ عِبْدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ** তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত করবে যিনি আমারও রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন তাদের কার্যাবলী তদারক করেছি। অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন থেকে আপনিই তাদের কার্যাবলী তদারক করেছেন। আর আপনি প্রত্যেক কাজ সম্বন্ধেই পূর্ণ অবগত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে খুৎবা দিতে গিয়ে বলেন :

‘হে লোকসকল! কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে খালি মাথা, নগ্ন দেহ, খালি পা এবং খতনাবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে, যেমন তোমরা তোমাদের জন্মের দিন ছিলে। সর্বপ্রথম ইবরাহীমকে (আঃ) পোশাক পরানো হবে। এরপর আমার উম্মাতের মধ্য হতে কতক লোককে আনয়ন করা হবে যাদেরকে জাহান্নামের বাম দিকে রাখা হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমারই উম্মাত। সেই সময় বলা হবে, তুমি জাননা যে, এরা তোমার (ইন্তেকালের) পর তোমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করেছিল এবং দীনের ভিতর নতুনত্ব চালু করেছিল। অতঃপর বলা হবে, তুমি তাদের ত্যাগ করার পর তারা তাদের পূর্ব কার্যাবলীতে ফিরে গিয়েছিল। (মুসনাদ তায়ালেসী ৩৪৩, ফাতহুল বারী ৮/১৩৫) সুতরাং তখন আমি একজন সৎ বান্দার মত ঐ কথাই বলব যে কথা ঈসা (আঃ) বলেছিলেন। তা হল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার **إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ**

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে ওরাতো আপনার বান্দা; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলেতো আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ১১৮ আয়াত) এই কালাম। তিনি যা চাবেন তাই করবেন। তিনি সবারই কৈফিয়ত তলব করতে পারেন, কিন্তু তাঁর কাছে খৃষ্টানরা কিংবা অন্য কেহই কোন কৈফিয়ত তলব করতে পারেনা। তা ছাড়া এই কালাম খৃষ্টানদের উপর তাঁর অসম্ভুষ্টি প্রকাশকারী, যারা ঈসাকে (আঃ) তাঁর

শরীক ও পুত্র এবং মারইয়ামকে (আঃ) তাঁর স্ত্রী (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক) সাব্যস্ত করেছিল। এ আয়াতের বড়ই মাহাত্ম্য রয়েছে।

<p>১১৯। আল্লাহ বলবেন : এটি সেই দিন যেদিন সত্যবাদীদের সত্যবাদীতা কাজে আসবে, তারা উদ্যান প্রাপ্ত হবে, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট; এটাই হচ্ছে মহাসফলতা।</p>	<p>১১৯. قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ</p>
<p>১২০। আল্লাহরই জন্য আধিপত্য রয়েছে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল এবং ঐ সমস্ত কিছুর যা এতদুভয়ের মাঝে বিদ্যমান; আর তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।</p>	<p>১২০. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ</p>

কিয়ামাতের দিন শুধু সত্যেরই জয় হবে

ঈসা (আঃ) যে বিপথগামী ও মিথ্যাবাদী খৃষ্টানদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন সে কথারই জবাব দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন :

هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ আজকের দিনে একাত্মবাদীদের একাত্মবাদ এবং সত্যবাদীদের সত্যবাদীতা উপকার দিবে। যাহ্‌হাক (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মন্তব্য করেছেন : ইহা হল ঐ দিন যেদিন তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ লাভবান হবেন।

لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا তারা প্রবাহিত নাহর বিশিষ্ট জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে। সেখান থেকে না তাদেরকে বের করা হবে, আর না তারা মুহূর্তের জন্য জান্নাত পরিত্যাগ করবে। رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ আলাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারাও আলাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। আলাহ তা'আলা বলেন :

وَرَضُونَ مِنْ رَبِّ اللَّهِ أَكْبَرُ

আর আলাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নি'আমাত। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৭২) এ আয়াতের সঙ্গে যে হাদীস সম্পর্কযুক্ত রয়েছে তা সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আলাহ অন্য জায়গায় বলেন :

لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ

এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিৎ সাধনা করা। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৬১) আলাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

আর থাকে যদি কারও কোন আকাংখা বা কামনা, তাহলে তারা এরই কামনা করুক। (সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ : ২৬)

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। সব কিছুরই উপর তাঁর পূর্ণ আধিপত্য রয়েছে। তাঁর সাথে কেহই তুলনীয় নয় এবং তাঁর কোন সাহায্যকারীরও প্রয়োজন নেই। তাঁর পিতাও নেই, পুত্রও নেই এবং স্ত্রীও নেই। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। ইব্ন অহাব (রহঃ) বলেন যে, হুয়াই ইব্ন আবদুল্লাহ বলেছেন, আবু আবদুর রাহমান ইবনুল হাবলি (রহঃ) বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেছেন : সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা হচ্ছে সূরা তুল মায়িদাহ। (তিরমিযী ৩০৬৩)

সূরা মায়িদাহর তাফসীর সমাপ্ত।